আ. স. পুশকিন

ক্যাপ্টেনের মেয়ে

আ. স. পুশকিন • ক্যাপ্টেনের মেয়ে

আ. স. পুশকিন

ক্যাপ্টেনের মেয়ে

'পুশ্কিন সেই সমস্ত বিস্ময়কর অমর ব্যক্তির অন্যতম, যাঁহাদের জীবনীশক্তি অফুরন্ত, যাঁহারা অন্তিমকালে তাঁহাদের যে অবস্থা তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, পরন্তু চিরকাল ধরিয়া সমাজ মানসে বাড়িতে থাকেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রত্যেক যুগ তাহার মত প্রকাশ করে। কিন্তু বিগত যুগের মত যতই যথার্থ হউক না কেন, আগামী যুগের বলিবার মতো কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকেই, যাহা নূতন ও অধিকতর যথার্থ।'

ভিসারিওন বেলিন্স্কি

চিরায়ত রুশ সাহিত্য

А. С. ПУШКИН

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
МОСКВА

আ. স. পুশকিন

ক্যাপ্টেনের মেয়ে
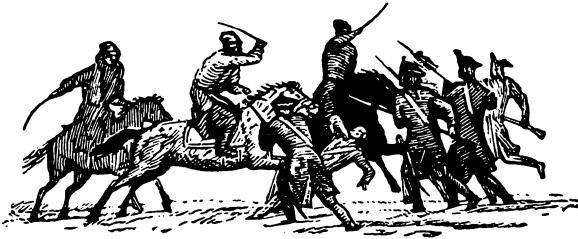
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: অমল দাশগুপ্ত

ছবি এঁকেছেন ন. ফাভোর্স্কি

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভ. ফাভোর্স্কি

সূচী

ক্যাপ্টেনের মেয়ে

বয়েস থাকতেই মান বাঁচাও

প্রবাদ

প্রথম অধ্যায়
রক্ষিবাহিনীর সার্জেণ্ট

'রক্ষিবাহিনীতে ও অল্প সময়ের মধ্যেই
ক্যাপ্টেন হতে পারত।'
'তার দরকার নেই, সৈনিক হয়ে থাকুক।'
'ঠিক বলেছ, কষ্ট করে আসুক ...'
'হ্যাঁ, কার ছেলে ও?' [১]

ক্নিয়াজনিন

আমার বাবা আন্দ্রেই পেত্রোভিচ গ্রিনেভ যৌবনে কাউণ্ট মিনিখের বাহিনীতে ছিলেন। ১৭ ... সালে উচ্চতর পদাধিকার প্রাপ্ত লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করে তিনি বাস করতে আসেন তাঁর সিম্‌বিস্কর্ তালুকে। বিয়ে করেন স্থানীয় এক গরীব জমিদারের কন্যা আভ্‌দোতিয়া ভাসিলিয়েভনা য়ু... কে। মায়ের পেটের আমরা ন' ভাইবোন। আমার ভাইবোনেরা সকলে শৈশবেই মারা গেছে।

মায়ের পেটে থাকতেই আমার নাম সেমেনভ্‌ বাহিনীতে সার্জেণ্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল; ব্যাপারটা সম্ভব হয় রক্ষিবাহিনীর মেজর প্রিন্স ব...এর বদান্যতায়; তিনি আমাদের নিকট আত্মীয়।

সে সময়ে যদি আমার মা'র ছেলে না হয়ে মেয়ে হত তাহলে যথাস্থানে অনুপস্থিত সেই সার্জেণ্টের মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়ে দিতেন আমার বাবা এবং ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত। লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন ছুটিতে আছি, এই ধরে নেওয়া হয়েছিল। সে-যুগে লেখাপড়া শেখাটা আজকালকার মতো ছিল না। পাঁচবছর বয়সে আমার ভার ছেড়ে দেওয়া হল সাভেলিচ নামে এক সহিসের হাতে; মিতাচারী স্বভাবের জন্যে আমার খুড়োর পর্যায়ে তোলা হয়েছিল

সাভেলিচকে। তার শিক্ষাধীনে থেকে বারো বছর বয়সে মাতৃভাষায় লিখতে-পড়তে শিখলাম আমি এবং শিকারী কুকুরের ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ বিচারক হয়ে উঠলাম। তারপর আমার বাবা আমার জন্যে মসিয়ে বোপ্রে নামে একজন ফরাসী শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। মস্কো থেকে তিনি চলে আসেন পুরো বছরের মদ আর অলিভ অয়েলের যোগান নিয়ে। তাঁর আসায় খুবই অসন্তুষ্ট হল সাভেলিচ; গজগজ করতে লাগল, 'ভগবানের দয়ায়, ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে গড়েপিটে এতদিন মানুষ করা হল। এখন আর পয়সা খরচ করে এক মুসিয়ে না রাখলেই নয়? কেন, আমাদের নিজেদের দেশে কি এতই লোকের অভাব?'

নিজেদের দেশে থাকতে বোপ্রে ছিল নাপিত। তারপরে প্রুসিয়ান বাহিনীর সৈনিক, শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় আগমন pour être outchitel*, — যে শব্দটির অর্থ তাহার নিকট খুব পরিষ্কার ছিল না। মানুষটি দিলদরিয়া গোছের, কিন্তু খামখেয়ালী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা — মেয়েদের সম্পর্কে তীব্র একটা কামনা। এ বিষয়ে অতি উৎসাহের ফলে প্রায়ই তাঁর কপালে মারপিট জুটত আর তখন বেশ কয়েকদিন কাৎরাতে হত তাঁকে। তা ছাড়া, (তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে) তাঁর সঙ্গে বোতলের কোন শত্রুতা নেই, অর্থাৎ দু-এক ঢোঁক বেশি গিল্‌বার দিকেই তাঁর ঝোঁক। এবং যেহেতু আমাদের বাড়িতে মদ পরিবেশন করা হয় শুধু আহারের সময়ে এবং প্রত্যেককে মাত্র একগ্লাস করে, আবার তাও শিক্ষকমশাইকে সাধারণত বাদ দিয়ে, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই রুশদেশীয় পানীয়তে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি এবং কিছুদিন না যেতেই তাঁর নিজের দেশের মদের চেয়েও বেশি পছন্দ করতে থাকেন এটাকে; তাঁর মতে হজমের পক্ষে এটা নাকি অনেক বেশি উপকারী। তাঁর সঙ্গে আমার চমৎকার মিলমিশ হয়েছিল; আর যদিও তিনি এসেছিলেন আমাকে ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য সব বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে কিন্তু কাজের বেলায় তিনি দেখলেন যে তার চেয়ে আমার কাছ থেকে রুশ ভাষায় খানিকটা বক্‌বকানি শোনা ঢের সহজ কাজ। এইভাবে আমরা যে যার নিজের ব্যাপার নিয়েই মশ্‌গুল হয়ে রইলাম। ভারি চমৎকার

---

* শিক্ষক (রুশ উচ্চারণ থেকে ফরাসী বানানে লেখা) হবার জন্যে।

দিন কাটতে লাগল আমাদের। কোনো শিক্ষকের জন্য মোটেই আমার কোনো বাসনা ছিল না। কিন্তু কপাল দোষে শীগ্গিরই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ব্যাপারটা এই।

মুখে বসন্তের দাগওলা মুট্কি ধোবানী পালাশা, আর কানা গয়লানী আকুল্কা — দুজনে একদিন করে কি, আগে থেকে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিয়ে আমার মা'র পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ে নিজেদের দুর্বল মুহূর্তের পাপের কথা স্বীকার করে বসে। দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে নালিশ জানায় যে মুসিয়ে তাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে। ব্যাপারটাকে আমার মা মোটেই হেসে উড়িয়ে দিলেন না এবং তিনি গিয়ে নালিশ জানালেন আমার বাবার কাছে। আমার বাবার বিচার ছিল সংক্ষিপ্ত, তিনি তৎক্ষণাৎ ফরাসী বদমায়েশটিকে ডেকে পাঠালেন। খবর এল যে তিনি আমাকে পড়াচ্ছেন। তখন বাবা উঠে এলেন আমার ঘরে। সেখানে দেখলেন যে মুসিয়ে বোপ্রে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে ঘুম দিচ্ছিলেন আর আমি নিজের কাজ করছিলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমার সুবিধার জন্যে মস্কো থেকে অর্ডার দিয়ে মস্ত একটা মানচিত্র আনানো হয়েছিল। জিনিসটা দেওয়ালে ঝোলানো ছিল, কোনো কাজে লাগছিল না। মানচিত্রটা যে কাগজের উপরে ছাপানো হয়েছে তা যেমনি চওড়া চমৎকার; কাগজটার ওপরে বহুদিন থেকেই আমার লোভ ছিল। মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে কাগজটা দিয়ে একটা ঘুড়ি বানিয়ে নেব এবং বোপ্রের নিদ্রার সুযোগ নিয়ে এই মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তারপর ঠিক যে সময়ে আমি উত্তমাশা অন্তরীপের সঙ্গে গাছের বাকলের একটা টুকরো লাগিয়ে ঘুড়ির লেজ তৈরি করছি, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন আমার বাবা। আমার এই ভৌগোলিক অনুশীলনের পুরস্কার হিসেবে কান মলে দিলেন আমার। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন বিছানার কাছে, বিন্দুমাত্র মায়ামমতা না দেখিয়ে বোপ্রেকে ঘুম থেকে তুলে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। হক্চকিয়ে বোপ্রে চেষ্টা করলেন উঠে বসতে কিন্তু পারলেন না — বেচারা ফরাসী ভদ্রলোকটি মদে একেবারে বেসামাল হয়ে ছিলেন। স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। বাবা তাঁর কোটের কলার ধরে তাঁকে বিছানা থেকে টেনে তোলেন, ঠেল্তে ঠেল্তে নিয়ে যান ঘরের বাইরে এবং সেই দিনই

বার করে দেন বাড়ি থেকে। এ-ব্যাপারে সাভেলিচ এত খুশি হল যে বলবার নয়। আর এইভাবেই আমার পড়াশোনা শেষ হল।

বড়ো হলাম আস্ত একটি অকর্মণ্য হয়ে। মনের আনন্দে দিন কাটতে লাগল পায়রা উড়িয়ে আর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ব্যাঙ-লাফানো খেলে। এইভাবে আমি ষোলয় পা দিলাম। তারপরেই আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসে।

শরৎকালের একটি দিন। আমার মা ড্রয়িংরুমে বসে মধুর জ্যাম তৈরি করছেন আর পাশে দাঁড়িয়ে ফুটন্ত ফেনার দিকে তাকিয়ে আমি ঠোঁট চাটছি। আমার বাবা জানলার পাশে বসে দরকারী বর্ষপঞ্জী পড়ছেন। বছরে একবার করে এটি আসে এবং বইটি হাতে পেলে আমার বাবার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একেবারে বাহ্যজ্ঞান-রহিত হয়ে যান তিনি এবং পড়তে পড়তে তাঁর মেজাজ সপ্তমে ওঠে। আমার বাবার চালচলন ও স্বভাবের সঙ্গে আমার মা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এই আপদ বইখানা হাতে এলেই তিনি এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে দেন যেখানে সহজে কারও নজর যায় না। সুতরাং মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে কয়েক মাস এই বইটার ওপরে বাবার চোখ পড়ে না। তারপর যেদিন চোখে পড়ে যায় সে দিন আর তিনি কিছুতেই বইটাকে হাতছাড়া করেন না, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে বইটা নিয়ে। সেই রকম আজো আমার বাবা বর্ষপঞ্জীটা পড়ছেন, মাঝে মাঝে কাঁধ-ঝাঁকুনি দিচ্ছেন আর চাপাস্বরে বিড়বিড় করছেন, 'লেফ্‌টেনাণ্ট-জেনারেল!.. ও তো সার্জেণ্ট ছিল আমার কোম্পানীতে!.. আর রুশদেশের সেরা দুটি খেতাবই [২] পেয়ে গেছে দেখছি!.. এই তো সেদিন আমরা...।' শেষকালে বর্ষপঞ্জীটিকে সোফার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। লক্ষণটা ভালো নয়।

হঠাৎ তিনি মা'র দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'পেত্রুশার বয়স কত হল, বলো তো?'

মা জবাব দিলেন, 'এই তো সতেরোয় পা দিয়েছে। ধরো গিয়ে যে বছর নাস্তাসিয়া গেরাসিমভনা-মাসীর এক চোখ অন্ধ হয়ে যায় — সেই বছরে ওর জন্ম...'

বাধা দিয়ে বাবা বললেন, 'বেশ ভাল কথা! আর দেরি নয় — এবার ওকে পল্টনে যেতে হবে। মেয়েদের কাছে ঘুর ঘুর করে আর পায়রা উড়িয়ে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে ও।'

আমার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে আমার মা এত বিচলিত হলেন যে তাঁর হাত থেকে চামচটা পড়ে গেল ডেকচির মধ্যে। জল পড়তে লাগল গাল বেয়ে। কিন্তু আমি খুবই উল্লসিত হলাম; আমার সেই উল্লাস ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পল্টনের জীবন বলতে আমার মনে ধারণা আছে এক স্বাধীন জীবনের, পিটার্সবুর্গের খুশিভরা জীবনের। নিজেকে কল্পনা করি রক্ষীবাহিনীর অফিসার হিসেবে; রক্ষীবাহিনীর অফিসার হতে পারাটাই সুখী জীবনের পরাকাষ্ঠা বলে।

আমার বাবা একবার সংকল্প করলে তা বদলাতে ভালোবাসতেন না, তা পূরণ না করে ছাড়তেন না। আমার যাত্রার দিন স্থির হয়ে গেল। যাত্রার পূর্বে আমার বাবা আমাদের বললেন যে আমার ভাবী উচ্চতর অফিসারের কাছে তিনি আমার জন্যে একটি চিঠি লিখে দেবেন। হুকুম দিলেন কালি ও কলম আনতে।

মা বললেন, 'প্রিন্স ব... কে আমার নমস্কার জানিয়ে দিও — ভুল হয় না যেন। আশা করি পেত্রুশার ওপর তাঁর স্নেহ অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

কপাল কুঁচকে বাবা জবাব দিলেন, 'বাজে কথা বন্ধ করো! প্রিন্স ব... কে আমি চিঠি লিখতে যাব কোন সুবাদে?'

'কেন, তুমিই তো বললে যে পেত্রুশার ওপরওয়ালার কাছে তুমি একটা চিঠি লিখে দেবে!'

'বলেছিই তো! লিখব তা কি হয়েছে?'

'তাই তো বলছি। প্রিন্স ব... ই তো ওর ওপরওয়ালা। সেমেনভ্ বাহিনীতে ওর নাম লেখানো হয়েছে — নয় কি?'

'নাম লেখানো হয়েছে! নাম লেখানো হয়েছে, তাতে আমার কি শুনি? পেত্রুশা পিটার্সবুর্গে যাচ্ছে না। পিটার্সবুর্গের পল্টনে থেকে ওর লাভটা কী? শেখার মধ্যে শিখবে শুধু হুল্লোড় আর বাবুগিরি। তার চেয়ে বরং ও আর্মিতে

যাক, পল্টনী ঝোলা কাঁধে নিক, গোলাবারুদ ঘাঁটাঘাঁটি করুক — একটা অকম্মা না হয়ে খাঁটি সৈনিক হয়ে উঠুক। হুঃ, রক্ষীবাহিনীতে নাম লেখানো হয়েছে! কোথায় ওর পাসপোর্ট, দাও ত দেখি!'

আমার পাসপোর্ট আর খ্রীষ্টীয় নামকরণের পোশাক মা তুলে রেখেছিলেন একটা সিন্দুকের মধ্যে। সেখান থেকে পাসপোর্টটাকে খুঁজে বার করে কাঁপা-হাতে এগিয়ে দিলেন বাবার কাছে। কাগজটাকে নিয়ে বাবা ভালো করে পড়লেন তারপর সামনে টেবিলের ওপরে কাগজটা রেখে শুরু করলেন চিঠি লিখতে।

কৌতূহল গ্রাস করল আমাকে। পিটার্সবুর্গে যদি না হয় তাহলে আর কোথায় পাঠানো হতে পারে আমাকে? বাবার হাতের কলম কাগজের ওপরে আস্তে আস্তে সরে সরে যাচ্ছে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম আমি। শেষকালে তাঁর কলম থামল, একটা খামের মধ্যে চিঠি ও পাসপোর্ট পুরে সীলমোহর দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করলেন। তারপর চোখ থেকে চশমা খুলে আমাকে কাছে ডেকে বললেন, 'এই নে চিঠি। লিখেছি আন্দ্রেই কার্লোভিচ র... কে। সে আমার পুরনো সাথী ও বন্ধু। ওরেনবুর্গে গিয়ে তাঁরই অধীনে সৈন্যদলে তোকে থাকতে হবে।'

বর্ণোজ্জ্বল যে ভবিষ্যতের কল্পনা আমি করেছিলাম, এ কথা শুনে তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! কোথায় গেল পিটার্সবুর্গের আনন্দ! তার বদলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে দূর এক সমাজবর্জিত অঞ্চলের নিতান্ত ক্লান্তিকর একঘেয়েমি। এক মুহূর্ত আগেও পল্টনের জীবন সম্পর্কে কত রঙিন স্বপ্নই না ছিল — কিন্তু এখন মনে হতে লাগল সে-জীবনটা যেন কঠোর একটা পরীক্ষা। প্রতিবাদ করেও আর কোনো ফল হবে না। পরদিন সকালে দূর যাত্রার উপযোগী স্লেজগাড়ি এনে দাঁড় করানো হল বাড়ির সামনে অলিন্দের কাছে। আমার ট্রাঙ্ক চুবড়ি ও বোঁচকা বোঝাই করা হল গাড়িতে; চুবড়িটার মধ্যে ছিল চা-তৈরির আনুষঙ্গিক সমস্ত উপকরণ আর বোঁচকার মধ্যে পারিবারিক আদরযত্নের কয়েকটি বিদায় চিহ্ন — টাট্‌কা পিঠে ও মিষ্টি ইত্যাদির পুঁটলি। গুরুজন হিসেবে আমাকে আশীর্বাদ জানালেন আমার বাবা আর মা। বাবা আমাকে বললেন, 'বিদায় পিওতর! যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবি তাঁর অধীনে বিশ্বস্তভাবে কাজ করবি; ওপরওলাকে অমান্য করবি না বা ওপরওলাকে মুরুব্বি পাকড়াতে যাবি

না; যে-কাজ তোকে করতে বলা হয়নি সে-কাজ করতে যাবি না। যে-কাজ করতে বলা হয়েছে সে-কাজ থেকে সরে আসবি না। আর এই প্রবাদবাক্যটি সব সময়ে মনে রাখিস: নতুন থাকতে পোষাক বাঁচবে, বয়েস থাকতে মান বাঁচবে।' আমার মা চোখের জলে আমাকে কাকুতি-মিনতি করলেন আমি যেন শরীরের দিকে নজর দিই; আর সঙ্গে সঙ্গে সাভেলিচকে বারবার বলে দিলেন যেন এই শিশুটির দিকে সে নজর রাখে। আমাকে পরতে হল ট্যান্-করা খরগোশের চামড়ার জামা, তার ওপরে শেয়ালের লোমের কোট। হু-হু করে কাঁদতে কাঁদতে আমি স্লেজগাড়িতে উঠে সাভেলিচের পাশে বসলাম। যাত্রা শুরু হল।

সেই রাত্রি সিম্‌বির্স্ক শহরে আমরা পৌঁছলাম। সাভেলিচের ওপর কেনাকাটার ভার আছে, সেজন্যে পরদিনও এই শহরে থাকার কথা। একটা সরাইখানায় উঠলাম আমরা। পরদিন খুব ভোরে সাভেলিচ বেরিয়ে গেল দোকান-বাজারের দিকে। আর আমি জানলা দিয়ে বাইরের নোংরা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষকালে ক্লান্ত হয়ে উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সরাইখানার অন্য সব ঘরে। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে এসে দেখা হল লম্বা চেহারার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে; বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, মুখে ঝুলে-পড়া কালো গোঁফ, পরনে ড্রেসিং গাউন, হাতে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি, দাঁতে এক পাইপ। মার্কারের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলছেন তিনি। খেলায় মার্কারের জিত হলে একগ্লাস ভদ্‌কা খাচ্ছে সে, হেরে গেলে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে টেবিলের তলায়। আমি দুজনের খেলা দেখতে লাগলাম। খেলা যতো চলে ততো বেশি বার মার্কারকে ঢুকতে হয় টেবিলের তলায়। শেষকালে একবার সেই যে ঢোকে আর বেরোয় না। কয়েকটা বিরূপ মন্তব্য করে, অন্ত্যেষ্টিবাক্য যেন, খেলা চুকিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, তারপর আমাকে ডাকলেন তাঁর সঙ্গে খেলবার জন্যে। বিলিয়ার্ড খেলা আমার জানা নেই, সুতরাং আমি রাজি হলাম না। আমার অজ্ঞতায় তিনি খুব বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হল। কেমন কৃপার দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন আমাকে। তবুও কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল আমাদের দুজনের মধ্যে। শুনলাম, তাঁর নাম ইভান ইভানভিচ জুরিন, এক অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন। সিম্‌বির্স্কে এসেছেন নতুন লোককে সৈন্যদলভুক্ত করতে এবং উঠেছেন এই সরাইখানায়।

জুরিন আমাকে ভোজে ডাকলেন; অবশ্য পল্টনী কায়দার ভোজ; ভোজ্যবস্তু সম্পর্কে আগে থেকে কিছু তোড়জোড় নয়, যা কপালে জোটে তাই। উৎসাহের সঙ্গে আমি রাজি হলাম এবং আমরা বসলাম গিয়ে খাবার টেবিলে। প্রচুর মদ্যপান করলেন জুরিন এবং আমার গ্লাসও খালি থাকতে দিলেন না। গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বারবার বললেন যে পল্টনে থাকতে হলে আমাকে এই অভ্যেসটা অতি অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। পল্টনী জীবনের নানা অদ্ভুত সব গল্প শোনালেন আমাকে। শুনে হাসতে হাসতে আমার তো দম বন্ধ হবার যোগাড়। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব যখন চুকল তখন আমাদের দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তারপর তিনি নিজে থেকেই প্রস্তাব করলেন যে আমাকে বিলিয়ার্ড খেলা শেখাবেন। বললেন, 'আমরা যারা সৈনিক হয়েছি, তাদের পক্ষে এই খেলাটা শিখে রাখা নিতান্তই জরুরি। এই ধরুন না কেন, হয়তো মার্চ করতে করতে এসে পেঁাছলেন একটা গঞ্জে। সেখানে সময় কাটানোটাই একটা সমস্যা। সব সময়েই তো আর ইহুদীগুলোকে ধরে ধরে ঠ্যাঙানো যায় না। কাজেই বাধ্য হয়ে কোনো একটা সরাইখানায় গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলায় মাততে হয় আর এইজন্যে বিলিয়ার্ড খেলা জানা দরকার।' তাঁর এই যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না এবং যতোটা অভিনিবেশ আমার পক্ষে থাকা সম্ভব সবটুকু প্রয়োগ করে খেলাটা শেখবার কাজে লেগে গেলাম। আমাকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহ দিলেন জুরিন; আর আমি যে এত চটপট খেলাটা শিখে নিতে পারছি তা দেখে যেন অবাক হতে লাগলেন। প্রথম কয়েকবার খেলা চলল আমাকে তালিম দেবার জন্যে; তারপর জুরিন প্রস্তাব করলেন যে যৎসামান্য কিছু একটা বাজি রেখে খেলা যাক; লাভের জন্যে বাজি নয়, একেবারে শূন্য হাতে খেলাটা না হয় সেজন্যে — কারণ জুরিনের মতে শূন্য হাতে খেলার মতো খারাপ অভ্যেস নাকি আর কিছু নেই। এ প্রস্তাবেও আমি রাজি হলাম। এ দিকে জুরিন পাঞ্চ* পানীয় আনবার হুকুম দিয়েছেন, আমাকে অনেক বলে কয়ে রাজি করালেন পানীয়টা একটু চেখে দেখতে। এবারেও সেই একই কথা — পল্টনে থাকতে হলে আমাকে অতি অবশ্যই

---

* নানা পানীয়ের মিশ্রণ।

এই অভ্যেসটা আয়ত্ত করতে হবে। পল্টনে এসে যদি পাণ্ড খেতেই না শিখি তবে আর বাঁচা কি নিয়ে? কথাটা আমি মেনে নিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের খেলা চলেছিল। এক এক চুমুক পানীয় আমার পেটে যায় আর আমিও বেপরোয়া হয়ে উঠি। আমার মারের বলগুলো অনবরত ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যায় টেবিল থেকে, মার্কারকে গাল দিই গুণতে অপটু বলে, আর ক্রমেই বাজি বাড়িয়ে চলি। এক কথায় আমার ভাবভঙ্গি হয়ে ওঠে ঠিক ঘর-পালানো ছেলের মতো। কয়েকঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে উড়ে গেল টের পেলাম না। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে জুরিন বিলিয়ার্ড খেলার লাঠিটা রেখে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে আমি তাঁর কাছে একশো রুব্‌ল হেরেছি। শুনে আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমার টাকাকড়ি সবই সাভেলিচের কাছে। টাকা দিতে পারার অক্ষমতার জন্যে জুরিনের কাছে আমি মাপ চাইতে শুরু করতেই তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'তাতে আর কি হয়েছে! এজন্যে কিছুমাত্র চিন্তা করার দরকার নেই! টাকা আমাকে পরে দিলেও চলবে। এখন চল একটু আরিনুশ্‌কার কাছে যাই।'

তারপরে কি করতে হল বলুন দেখি? দিনটি শুরু হয়েছিল যেমন বোকামির মধ্যে, শেষও হল তাই। আরিনুশ্‌কার বাড়ীতে আমরা রাত্রের খাওয়া খেলাম। জুরিন বারবার আমার গ্লাস ভরে দিতে লাগলেন; তাঁর মুখে সেই এক কথা: 'পল্টনে থাকতে হলে এই অভ্যেসটা আপনাকে অতি অবশ্যই আয়ত্ত করে নিতে হবে।' তারপর উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেলাম যে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা আমার প্রায় নেই। মাঝরাত্রে জুরিন আমাকে সরাইখানায় পেঁৗছে দিল।

অলিন্দের কাছে সাভেলিচের সঙ্গে দেখা। পল্টনী অভ্যেস আয়ত্ত করার চেষ্টা যে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তার নির্ভুল চিহ্ন দেখতে পেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে; তারপর আর্তস্বরে বলে উঠল, 'এ কি কাণ্ড, দাদাবাবু, এমন মাতাল হয়ে এলে কোত্থেকে? হা ভগবান! এমন পয়তানিও তো আর দেখিনি!' তোতলাতে তোতলাতে আমি বললাম, 'চুপ, বুড়ো ইঁদুর! মদ গিলেছিস বুঝি? নিশ্চয়ই তাই! যা, যা, শুতে যা... আর আমাকে নিয়ে চল বিছানায়।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। আগের দিনের অস্পষ্ট একটা স্মৃতি রয়েছে শুধু। ঘটনাগুলো তলিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু

সাভেলিচ চা নিয়ে আসাতে বাধা পড়ল। 'বড়ো বেশী তাড়াতাড়ি মদ ধরেছ, দাদাবাবু।' মাথা নাড়তে বলল সে, 'তোমাদের বংশের কেউ এমনটি হয়নি। তোমার বাবা বা ঠাকুর্দাকে কোনো দিন কেউ মাতাল করেছে বলে তো শুনিনি আমি। আর তোমার মা তো ক্‌ভাস* ছাড়া অন্য কিছু ছুঁয়েও দেখেননি কখনো। তোমার এমন হাল কে করেছে জান? সেই বদমায়েশ ফরাসী লোকটা। উঃ, ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে গিন্নী-মাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ত একেবারে। সেই এক কথা: "মাদাম, জ্য ভূ প্রি ভদ্‌কা!"** এবার দেখ তুমি, সেই জ্য ভূ প্রি কেমন ফলে যাচ্ছে! জানোয়ারটা এমনি বিদায় নেয়নি দেখছি, তোমার মাথার মধ্যে দু-একটা বিদ্যেও ঢুকিয়ে গেছে! টাকা খরচ করে তোমার জন্যে এই কুত্তার বাচ্চাকে নিয়ে আসার কী দরকার ছিল জানি না। কর্তার কি চাকর বাকরের কম্‌তি আছে কিছু?'

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, 'তুমি এবার যাও তো, সাভেলিচ। আমাকে চা দিতে হবে না।' কিন্তু সাভেলিচ যদি একবার উপদেশ বর্ষণ করতে শুরু করে তবে তা থেকে আর পরিত্রাণ নেই। সে বলল, 'দাদাবাবু, মদ খাবার ফল হাতে হাতে টের পেলে তো! মাথার যন্ত্রণা হয়, খাওয়ার রুচি নেই। মদ খেলে লোকে নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে...। শোনো, নোনা শসার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাও দেখি একগ্লাস, কিংবা সবচেয়ে ভালো হয়, আধগ্লাস ফলের আরক খেয়ে খোঁয়ারি কাটিয়ে নাও, কী বলো?'

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল একটি ছেলে। আমার কাছে লেখা ই. ই. জুরিনের একটা চিঠি তার হাতে। চিঠিটা আমি খুললাম। তাতে লেখা:

'প্রিয় পিওতর আন্দ্রেইয়েভিচ, গত রাত্রে আপনি আমার কাছে যে একশো রুব্‌ল হেরেছেন তা এই ছেলেটির হাতে দিয়ে দেবেন। টাকাটা আমার জরুরী প্রয়োজন।

ভবদীয়
ইভান জুরিন।'

---

* রুটি থেকে তৈরি এক ধরণের পানীয়।

** মাদাম, দয়া করে আমাকে একটু ভদ্‌কা দিন।

ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার আর কোনো উপায় নেই। আমার টাকাকড়ি পোশাক-আশাক সব কিছুরই রক্ষক [৩] — সাভেলিচ। মুখের ওপর একটা নির্বিকার ভাব এনে সাভেলিচকে বললাম, ছেলেটির হাতে সে যেন একশো রুব্‌ল দিয়ে দেয়। সাভেলিচ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে কী! কিসের জন্যে!' যতোটা সম্ভব নিস্পৃহভাবে আমি জবাব দিলাম, 'ওর কাছে আমার ধার আছে।' 'ধার আছে!' সাভেলিচ কথাটার প্রতিধ্বনি করল, সে আরো বেশী অবাক হয়ে গেছে, 'সে কি? দুটো দিনও যায়নি, এর মধ্যেই তুমি ধারে জড়িয়ে পড়লে কি করে, দাদাবাবু? নিশ্চয়ই একটা কিছু গণ্ডগোল আছে। তুমি যা খুশি বলো দাদাবাবু, এ টাকা আমি দিতে পারব না।'

নিজেকে এই বলে বোঝালাম যে এই সংকট-মুহূর্তে যদি একরোখা বুড়োটাকে দাবড়িয়ে রাখতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতেও লোকটির অভিভাবকত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে। সুতরাং চড়া মেজাজে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি হচ্ছি তোমার মনিব, তুমি আমার চাকর। টাকার মালিক হচ্ছি আমি। আমার খুশি হয়েছে আমি বাজি হেরেছি। পরামর্শ দিতে এসো না, যা বলা হয়েছে তাই করে যাবে।'

আমার কথা শুনে সাভেলিচ অত্যন্ত বিচলিত হল; অসহায়ভাবে হাতদুটো দুলিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। 'অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন!' আমি চোটপাট করে উঠলাম। কাঁদতে কাঁদতে কাঁপা কাঁপা গলায় সাভেলিচ বলল, 'দাদাবাবু, অমন করে আমাকে বোলো না! তাহলে মনের দুঃখে আমি মরে যাব! আমার চোখের মানিক! এই বুড়ো মানুষের একটা কথা শোন! শয়তানটাকে লিখে দাও যে তুমি ঠাট্টা করেছিলে, তোমার কাছে এত টাকা নেই। একেবারে একশোটা রুব্‌ল! চাট্টিখানি কথা নাকি! লিখে দাও যে জুয়ো খেলা সম্পর্কে তোমার বাবা মার কড়া নিষেধ আছে। বাজি রাখলে বড়ো জোর আখরোট বাজি রেখে খেলবে।' কড়া স্বরে আমি বললাম, 'আচ্ছা, তা হবে 'খন! ওর হাতে টাকাটা দিয়ে দাও, নইলে তোমাকে আমি দূর করে দেব!'

গভীর বিষাদভরা দৃষ্টিতে সাভেলিচ আমার দিকে তাকিয়ে টাকা আনতে চলে গেল। বুড়োর অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আমি স্বাধীন হতে

চেয়েছিলাম ও জিদ ধরেছিলাম, যে-করে হোক প্রমাণ করব যে আমি আর ছোট্ট শিশুটি নই। টাকাটা জুরিনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারপর শয়তানের আড্ডা এই সরাইখানা থেকে আমাকে সরিয়ে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে লাগল সাভেলিচ। একেবারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে খবর দিল আমাকে। একটা অস্থির বিবেক ও নীরব অনুতাপ অনুভব নিয়ে সিম্‌বিস্‌র্ক ছেড়ে চললাম। বিলিয়ার্ড খেলার শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হল না। তার সঙ্গে আবার কোনো দিন দেখা হবে, সে আশাও ছিল না আমার।
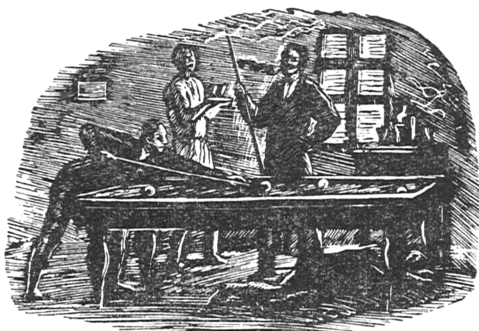
দ্বিতীয় অধ্যায়

পথপ্রদর্শক

হে দূরের দেশ!
হে অপরিচিতা!
তোমাকে খুঁজিনি আমি নিজেই
তোমার কাছে যাব,
এমন বাহন ছিল না আমার!
কিন্তু ছিল সাহস,
ছিল যৌবনের উদ্দামতা,
তীব্র সুরাপানের উন্মত্ততা
আর তাই তো তোমাকে পেলাম।

প্রাচীন গান

রাস্তায় চলতে চলতে আমার মনে যে সব চিন্তা উঠেছিল তা খুব মধুর নয়। সে-সময়ের পক্ষে আমার এই অর্থদণ্ডকে যথেষ্টই বলতে হবে। আর মনে মনে আমি একথাটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছিলাম না যে সিম্‌বির্স্কে আমার আচরণটা বোকার মতো হয়ে গেছে। সাভেলিচের সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করিনি। এ সব চিন্তা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। আমার দিকে পিঠ করে গুম হয়ে বুড়ো বসেছিল কোচোয়ানের আসনে, মাঝে মাঝে দু-একটা বিরক্তিসূচক শব্দ ছাড়া মুখে একটিও কথা নেই। আমি স্থির করলাম, যে-করে হোক্‌ ওর সঙ্গে মিটমাট করে নেব; কিন্তু কি ভাবে যে তা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। শেষকালে আমি বলে উঠলাম, ‘সাভেলিচ, শোন আমি কি বলি। অমন মুখ ভার করে থেকো না। এই আমি ঘাট মানছি — আমারই দোষ। আমি একটা আস্ত বোকা বনেছি। তাছাড়া তোমাকে অমন কড়া

কড়া কথা বলা উচিত হয়নি। আমি কথা দিচ্ছি, এবার থেকে ভালো হয়ে চলব। কোনো দিন তোমার কথার অবাধ্য হব না। এবার আর রাগ করে থেকো না। মুখ তুলে একবার তাকাও!'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জবাব দিল, 'তোমাকে আর কি বলব, দাদাবাবু! আমার রাগ হচ্ছে নিজের ওপরে — সবই আমার দোষ। সরাইখানায় তোমাকে একা ফেলে যাওয়াটা কক্ষণো উচিত হয়নি! তাছাড়া আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না — কি যে এক ঝোঁক চাপল, গেলাম পুরনো আলাপীর সঙ্গে দেখা করতে, গির্জার এক কর্মীর সঙ্গে। তারপরেই যা হয় আর কি, স্যাঙাতের সঙ্গে মোলাকাত, হাজতবাসের রাস্তা সাফ। কী ভয়ানক কান্ড, বাবা গো! এবার কর্তা-গিন্নীর কাছে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে? ওনারা যখন শুনবেন যে ওনাদের ছেলে মদ খায় আর জুয়ো খেলে তখন যে বাক্যি সরবে না মুখে!'

বেচারী সাভেলিচকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে ভবিষ্যতে ওর সম্মতি ছাড়া আমি আর একটি কোপেকও খরচ করব না। আস্তে আস্তে ওর মনটা শান্ত হয়ে এল; যদিও থেকে থেকে নিজের মনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'একশোটা রুব্‌ল! ইস! তামাসার কথা নয়!'

গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে গেছি। চারদিকে বিষণ্ণ প্রান্তর। বৈচিত্র্য বলতে মাঝে মাঝে টিলা আর খাদ। সমস্ত বরফে ঢাকা। পশ্চিমে অস্তায়মান সূর্য। সরু একটা রাস্তা ধরে, বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে, চাষীদের স্লেজগাড়ি যাবার দাগ ধরে চলেছে আমাদের গাড়ি। হঠাৎ কোচোয়ান বারবার তাকাতে লাগল পাশের দিকে, শেষকালে মাথা থেকে টুপিটা খুলে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি বলো হুজুর, ফিরে যাওয়াই ভালো!'

'কেন, কি হয়েছে?'

'বাতাসের গতিক সুবিধের নয়, হুজুর! ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে। আর দেখছেন তো, সদ্য-ঝরা বরফের গুঁড়োকে নিয়ে হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে কি-রকম।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'দেখুন, দেখুন, ওদিকে তাকিয়ে দেখুন।' (চালক তার চাবুকটা পূর্বদিকে বাড়িয়ে দেখাল।)

'আমি তো শুধু দেখছি বরফ-ঢাকা মাঠ আর পরিষ্কার আকাশ।'

'ওই যে — মেঘ দেখতে পাচ্ছেন না!'

আসলে একেবারে দিগন্ত রেখার ওপরে একটুকরো সাদা মেঘ। প্রথমে দেখে মনে হয় যেন দূরের টিলা। চালক আমাকে বুঝিয়ে বলল যে ওই মেঘটা হচ্ছে ঝড়ের পূর্বাভাস।

এসব অঞ্চলের তুষার-ঝড়ের কথা আমি শুনেছি। এমন ঘটনাও জানি যে স্লেজগাড়ি সমেত গোটা একটা দল বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। কোচোয়ানের কথামতো ফিরে যাওয়া সাভেলিচের ইচ্ছে এবং আমাকেও সেই পরামর্শ দিল। আমার কিন্তু মনে হয়নি যে বাতাসের খুব একটা জোর আছে এবং আশা করছিলাম যে সময় থাকতেই আমরা পরবর্তী ডেরায় পৌঁছে যেতে পারব। সুতরাং কোচোয়ানকে আরো জোরে ঘোড়া ছোটাতে বললাম।

জোরেই ঘোড়া ছোটাল সে কিন্তু বারবার তাকাতে লাগল পূর্বদিকে। ঘোড়াগুলোও যেন মরিয়া হয়ে ছুটছে। বাতাসের জোর বাড়ছে ক্রমশ। মেঘের টুকরোটা ফুলে ফেঁপে প্রকাণ্ড হয়ে একটু একটু করে সারা আকাশকেই গ্রাস করে ফেলল। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়তে শুরু করেছে এবং হঠাৎ বাতাস ভরে গেল বরফের বড় বড় চিল্‌কায়। গর্জন করে উঠল বাতাস। আমরা পড়ে গেলাম একেবারে তুষার-ঝড়ের মধ্যে। দেখতে দেখতে একাকার হয়ে গেল অন্ধকার আকাশ আর বরফের সমুদ্র। অবলুপ্ত হয়ে গেল সবকিছু। 'হুজুর! সর্বনাশ — তুষার-ঝড়!' চেঁচিয়ে উঠল কোচোয়ান।

গাড়ির আচ্ছাদনের তলা থেকে আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম। অন্ধকার আর পাক-খাওয়া ঘূর্ণি — আর কিছু নেই। বাতাসের গোঙানির মধ্যে এমন একটা সরব হিংস্রতা যে বাতাসকে জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাভেলিচ আর আমি বরফে ঢাকা পড়ে গেলাম। পায়ে পায়ে কয়েক কদম এগিয়ে ঘোড়াগুলো থেমে গেল।

অধৈর্য হয়ে আমি কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে, গাড়ি চলছে না কেন?' চালকের আসন থেকে নামতে নামতে সে জবাব দিল, 'কি হবে গাড়ি চালিয়ে? রাস্তাই মালুম হচ্ছে না, আলকাতরার মতো অন্ধকার — কোথায় এসে পড়েছি তার কোনো হদিশই পাচ্ছি না!' আমি লোকটিকে ধমকাতে শুরু করলাম, কিন্তু সাভেলিচ তার পক্ষ নিয়ে রাগের সঙ্গেই বলল, 'তখন তো তুমি ওর কথা শোনোনি! আমাদের উচিত ছিল সরাইখানায় ফিরে যাওয়া। সেখানে গরম চা খেয়ে নিয়ে রাত্রিটা কাটানো যেতে পারত, তারপর ঝড় থামলে আবার বেরিয়ে পড়তে পারতাম। এত তাড়াহুড়ো করার দরকারটা কি শুনি! আমরা তো আর কোনো বিয়ে-বাড়িতে যাচ্ছি না!' সাভেলিচ ঠিক কথাই বলেছে। আমাদের কাহিল অবস্থা। ক্রমেই আরো বেশি বেশি বরফ পড়ছে, বরফের বিরাট এক স্তূপ জমে গেছে স্লেজগাড়িটার চারপাশে। ঘোড়াগুলোর মাথা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, শিউরে উঠছে মাঝে মাঝে। কোচোয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু একটা করবার জন্যে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে লাগামগুলো। আপন মনে বিড়বিড় করছে সাভেলিচ। আমি চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কোথাও বাড়ির বা রাস্তার ক্ষীণ আভাসটুকুও চোখে পড়ে কিনা। চারদিকে শুধু তুষার-ঝড় পাক খেয়ে খেয়ে আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে — আর কিছু নেই। তারপর হঠাৎ এক সময়ে কালো একটা জিনিসের ওপর আমার চোখ পড়ল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওহে কোচোয়ান, দেখ, দেখ! কালো মতো কি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে না?' তাকিয়ে দেখতে লাগল কোচোয়ান, তারপর আবার চালকের আসনে উঠে বসে বলল, 'ভগবান জানেন, হুজুর, ওটা কি! স্লেজগাড়ি বা গাছের মতো ওটাকে দেখাচ্ছে না, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মনে হয়। হয় নেকড়ে নয় মানুষ।'

জিনিসটা যাই হোক না কেন, আমাদের দিকেই আসছে। আমিও সে দিকেই গাড়ি চালাতে বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনিসটার কাছে হাজির হয়ে আমরা দেখলাম, সেটি হচ্ছে মানুষ। কোচোয়ান চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে ভালো মানুষের ছেলে, বলতে পার রাস্তা কোন্ দিকে?'

পথচারী জবাব দিল, 'এই তো রাস্তা। শক্ত জমির ওপরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু রাস্তার খবর নিয়ে এখন আর লাভ কি?'

আমি বলাম, 'আচ্ছা, বাপু, বলো তো দেখি, এসব অঞ্চল তোমার জানা কিনা? রাতটা কাটানো যেতে পারে এমন একটা জায়গা বাত্‌লে দিতে পার?'

পথচারী জবাব দিল, 'তা এলাকাটা আমার জানা, ভগবানের দয়ায় অনেক ঢু়ঁড়ে বেড়িয়েছি। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো ঘোড়ায় চেপে। কিন্তু আজকের এই আবহাওয়াটা দেখছেন তো? পথঘাট গুলিয়ে যায় একেবারে। তার চেয়ে বরং ঠায় এখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ভালো। ঝড় একসময়ে থামবেই আর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে — তখন তারার আলোয় পথ খুঁজে নেওয়া যাবে।'

লোকটির অবিচলিত ভাব দেখে আমার মধ্যে নতুন করে আশা সঞ্চারিত হল। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে এই প্রান্তরের মধ্যেই রাতটা কাটিয়ে দেব। হঠাৎ দেখা গেল, পথচারী লোকটি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোচোয়ানের আসনে উঠে বসেছে, আর কোচোয়ানকে বলছে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কাছাকাছি নিশ্চয়ই একটা বাড়ি আছে। ডাইনে ঘুরে সোজা চালাও তো দেখি।' বিরক্তিভরা স্বরে কোচোয়ান জিজ্ঞেস করল, 'কেন শুনি? ডানদিকে ঘুরতে যাব কেন শুনি? আমি তো কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। চালাও! বলা তো খুবই সহজ! তোমার আর কি, ঘোড়াও নিজের নয়, গাড়িও নিজের নয়, বেমক্কা যেদিকে খুশি গাড়ি চালাও আর কি — তোমার তো আর পয়সা খরচ হচ্ছে না!' আমার মনে হল, কোচোয়ান ঠিক কথাই বলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাছাকাছি বাড়ি আছে — একথা বলছ কেন?' মুসাফির জবাব দিল, 'বলছি, কেননা বাতাস ওদিক থেকে আসছে আর বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। তার মানে, কাছাকাছি নিশ্চয়ই একটা গাঁ আছে।' লোকটির উদ্ভাবনী মেধা ও তীক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তি দেখে আমি অবাক হলাম। নির্দিষ্ট দিকে গাড়ি চালাতে বললাম কোচোয়ানকে। পুরু বরফের মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল ঘোড়াগুলো। অতি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল স্লেজগাড়ি। বরফের চাঁই ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে, খাদের মধ্যে পড়ে যাবার মতো অবস্থা, আশঙ্কাজনকভাবে এধার-ওধার কাৎ হয়ে যাচ্ছে — ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জাহাজের মতো। সাভেলিচ বারবার এসে ঠোক্কর খাচ্ছে আমার গায়ে আর বিড়বিড়

করে মনের বিরক্তি প্রকাশ করছে। খসখসের পর্দাটা টেনে নামিয়ে দিলাম, ফারের কোটটা জড়িয়ে নিলাম আরো ভালো করে। তারপর ঝড়ের গোঙানি আর গাড়ির দোলানিতে ঘুম নিয়ে এল আমার চোখে — বসে বসে আমি ঢুলতে লাগলাম।

তারপর আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সারা জীবনেও আমি সেই স্বপ্ন ভুলতে পারিনি। আমার জীবনে যে সব অদ্ভুত ঘটনাবলী ঘটেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এখনো আমার মনে হয়, স্বপ্নটা প্রায় ফলে গেছে। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ এ-অভিজ্ঞতা হয়তো পাঠকেরও আছে যে মানুষ যতোই কুসংস্কারকে ঘৃণা করুক না কেন, অত্যন্ত সহজেই সে এই কুসংস্কারের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

শরীরের ও মনের এমন একটা অবস্থায় আমি ছিলাম, যে অবস্থায় বাস্তব ধরা দেয় স্বপ্নের কাছে। বাস্তব আর মায়া মিলেমিশে তৈরি হয় আবছায়া সব মূর্তি — আর এই মূর্তিগুলি ঘুমের প্রথম তন্দ্রার মধ্যে ভর করে। আমার মনে হচ্ছিল, ঝড়ের ফোঁসফোঁসানি তখনো থামেনি আর বরফঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে আমরা তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি...। হঠাৎ দেখি, আমার সামনেই একটা তোরণ; উঠোন পেরিয়ে আমাদের কাছারি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল। আমার প্রথম চিন্তা ছিল এই: যদিও বাধ্য হয়ে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে কিন্তু আমার বাবা মনে করতে পারেন যে আমি ইচ্ছে করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছি। তাই আমার ওপরে তিনি রাগ করতে পারেন। উত্তেজনায় লাফিয়ে নেমে এলাম স্লেজগাড়ি থেকে। দেখলাম আমার মা প্রগাঢ় শোকের চিহ্ন মুখে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে তিনি বললেন, 'চুপ! শব্দ করিসনে! তোর বাবার ভয়ানক অসুখ করেছে — বাঁচবার আশা নেই! তোকে শেষ দেখা দেখতে চাইছেন!' আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে আমি মা'র পিছনে পিছনে গিয়ে শোবার ঘরে পৌঁছলাম। ঘরটিতে অস্পষ্ট আলো, বিছানার কাছে শোকাচ্ছন্ন মুখে সবাই দাঁড়িয়ে। পা টিপে টিপে আমি বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম। মশারির একটা কোণ তুলে আমার মা বললেন, 'আন্দ্রেই পেত্রোভিচ, এই দেখ পেত্রুশা এসেছে। তোমার অসুখের খবর শুনেই ফিরে এসেছে। ওকে আশীর্বাদ করো।'

হাঁটু মুড়ে বসে আমি রুগীর দিকে তাকালাম। কিন্তু এ কি দেখছি আমি? আমার বাবা নয়, বিছানায় শুয়ে আছে একজন চাষী। মুখে কালো দাড়ি, প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হতভম্ব হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এর মানে কি! আমার বাবা তো নয়। একজন চাষীর কাছে কেন আমি আশীর্বাদ চাইতে যাব?' আমার মা জবাব দিলেন, 'পেত্রুশা, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। তোর বিয়ের সময় তোর বাবার হয়ে এই লোকটি তোকে আশীর্বাদ করবে। ওর হাতে চুমু দাও, ও তোকে আশীর্বাদ করুক...' আমি এতে রাজি নই। তখন সেই চাষীটি লাফিয়ে নেমে এল বিছানা থেকে। পিছন দিকে কোথায় একটা টাঙ্গি ছিল যেন, টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে মারমুখী হয়ে চারদিকে ঘোরাতে শুরু করে দিল। আমি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম... কিন্তু পারলাম না। মৃতদেহে ঘরটা ভরে যায়, মৃতদেহগুলির ওপরে আমি হোঁচট খেলাম, রক্তের পুকুরে আমার পা হড়কে গেল...। তখন সেই ভয়ঙ্করদর্শন চাষীটি আমার দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে ডাক দিল, 'ভয় পেও না। আমার কাছে এগিয়ে এস, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব...।' আতঙ্ক ও বিহ্বলতা গ্রাস করল আমাকে...। ঠিক এই মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল আমার। ঘোড়াগুলো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সাভেলিচ আমার জামার আস্তিন ধরে টানছে আর বলছে, 'দাদাবাবু বেরিয়ে এস, আমরা পেঁৗছে গেছি।'

'পেঁৗছে গেছি? কোথায় পেঁৗছে গেছি?' চোখ কচলাতে কচলাতে আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'সরাইখানায়। ভগবানের দয়া বলতে হবে, একেবারে সরাইখানার বেড়ার গায়ে এসে আমাদের গাড়ি ধাক্কা খেয়েছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস দাদাবাবু। ভিতরে গিয়ে শরীরটাকে গরম করবে চলো।'

আমি স্লেজগাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। ঝড় তখনো ফুঁশছে কিন্তু ঝড়ের বেগ আগের চেয়েও স্তিমিত। চারদিকে আলকাতরার মতো অন্ধকার। আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে সরাইখানার মালিক একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এসেছে; কোটের ঝুল-অংশ দিয়ে লণ্ঠনটা আড়াল করা। ছোট একটা ঘরে মালিক নিয়ে গেল আমাকে। ঘরটা অপরিসর কিন্তু বেশ পরিষ্কার। শলাকাঠির আলো জ্বলছে। দেওয়ালে ঝুলছে একটা রাইফেল ও একটা উঁচু-চূড়ো কসাক টুপি।

সরাইখানার মালিকটি হচ্ছে ইয়াইক কসাক, বছর ষাটেক বয়স কিন্তু চেহারার দিক দিয়ে বুড়ো নয়, চটপটে চলাফেরা। একটু পরেই চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হল সাভেলিচ এবং যাতে চা তৈরি করার কাজে লেগে যেতে পারে সেজন্যে হাঁক দিল আগুন দিয়ে যেতে। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতিপূর্বে আর কোনোদিন আমি এভাবে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করিনি। সরাইখানার মালিক গেল সাভেলিচের কথামতো বন্দোবস্ত করতে।

সাভেলিচকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের পথপ্রদর্শক কোথায়?'

'এই যে হুজুর, এখানে।' মাথার ওপর থেকে কথা ভেসে এল। দেওয়ালের গায়ে অনেক উঁচুতে একটা তাক রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আমার চোখে পড়ল কালো দাড়ি ও একজোড়া চকচকে চোখ। জিজ্ঞেস করলাম, 'শীত করছে না কি, ভাই?' সে জবাব দিল, 'কি আর করি বলুন, এই পাতলা আর ছেঁড়া জামা গায়ে দিলে শীত আটকাবে কী করে? অবশ্য একটা ভেড়ার চামড়ার কোট আমার ছিল কিন্তু গতরাত্রে পানশালায় সেটা বাঁধা দিয়েছি। আমি ভাবিনি শীতের এত জোর।' ঠিক সেই সময়ে একটা ফুটন্ত সামোভার নিয়ে ঘরে ঢুকল সরাইখানার মালিক। পথপ্রদর্শক লোকটিকে আমি চা খাবার জন্যে ডাক দিলাম, সে নেমে এল তাক থেকে। লোকটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, চেহারা তার অসাধারণ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, মাঝারি লম্বা, পাতলা শরীর ও চওড়া কাঁধ। মুখের কালো দাড়িতে দু-একটা সাদা দাগ পড়েছে, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা সদাচঞ্চল মস্ত দুটি চোখ। মুখের ভাবে একই সঙ্গে মাধুর্য আর শয়তানি। কসাক-ধরণে চুলের ছাঁট, পরনে একটা ছেঁড়া কোট ও তাতার পায়জামা। আমি তার হাতে এক পেয়ালা চা দিলাম। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে মুখটা বিকৃত করে সে বলল, 'হুজুর, এতই যখন করেছেন, আর একটা অনুগ্রহ করুন। একগ্লাস ভদ্‌কা দিতে বলুন আমাকে। চা কসাকদের পানীয় নয়।' বিনা বাক্যব্যয়ে আমি তার অনুরোধ রক্ষা করলাম। সরাইখানার মালিক আলমারি থেকে একটা বোতল ও গ্লাস বার করে লোকটির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে তাকাল তার মুখের দিকে। তারপর বলল, 'আরে! তুমি! তাহলে আবার এ সব জায়গায় ঘোরাঘুরি হচ্ছে! এবারে তোমার মতলবটা কি?' পথপ্রদর্শকটি

অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে হেঁয়ালির ভাষায় জবাব দিল, 'সব্জি ক্ষেতের এদিক-ওদিক উড়ে বেড়াই আর শণের বীজ ঠোক্‌রাই, সেই দেখে ঠানদি ইট ছুঁড়ে মারে। কিন্তু আমার গায়ে লাগে না। তারপর, তোমাদের লোকজনের খবর কি?'

'আমাদের লোকজন?' কথাটার পুনরাবৃত্তি করে সরাইখানার মালিকও তেমনি হেঁয়ালির ভাষায় বলল, 'সাঁঝের উপাসনার ঘণ্টা বাজার সময় হল, কিন্তু পাদ্‌রির বৌ আমাদের বাধা দেয়: পাদ্‌রি চলে গেছে দূরে, শয়তানেরা বেড়াচ্ছে ঘুরে।' আমার ভবঘুরে সঙ্গীটি বলল, 'বাস্‌। আর কথা নয়। যদি বৃষ্টি হয় তো ব্যাঙের ছাতা গজাবেই। আর যদি ব্যাঙের ছাতা গজায় তো তুলে নেবার ঝুড়িও জুটবে। আর শুনে রাখ' (সে আবার চোখ টিপল) 'যে বনরক্ষক নিকটে, এবার কুড়ুল সামলাও। হুজুরের স্বাস্থ্য কামনায়!' এই বলে সে গ্লাসটা তুলে ধরে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, আর এক ঢোঁকে গিলে ফেলল গ্লাসের পানীয়টুকু। তারপর আমার দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে উঠে গেল তার বিশ্রামের জায়গায়।

সে-সময়ে এই চোরা আলাপ থেকে আমি কোনো অর্থই বার করতে পারিনি। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পেরেছি, তারা কথা বলছিল ইয়াইক বাহিনীর হালচাল নিয়ে। ইয়াইক বাহিনী ১৭৭২ সালে বিদ্রোহ করে এবং সম্প্রতি সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। দুজনের কথাবার্তা শুনে সাভেলিচ যে আন্তরিক অসন্তুষ্ট হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছিল তার মুখের ভাব দেখে। একবার সরাইখানার মালিক, আর একবার পথপ্রদর্শক লোকটির মুখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল সে। এই সরাইখানা, বা স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে উমিওৎ, বড় রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে। চারদিকে শুধু জনবসতিহীন শূন্য প্রান্তর। এই সরাইখানা ডাকাতের আড্ডা হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের উপায়ান্তর নেই। এই অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার চিন্তাও করা চলে না। সাভেলিচের অস্বস্তিতে আমি বড় আমোদ পেলাম। স্থির করলাম যে আমি যেখানে আছি সেখানেই রাত কাটিয়ে দেব। তাই ভেবে একটা বেঞ্চির ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। সাভেলিচ শুতে গেল চুল্লির তাকের ওপরে। সরাইখানার মালিক শুয়ে রইল মেঝের ওপরে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে লাগল সকলের। মড়ার মতো ঘুমোলাম আমি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল একটু দেরি করেই। দেখলাম ঝড় থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে, বরফের চাদর-ঢাকা সীমাহীন প্রান্তর ঝল্‌সে উঠেছে সেই রোদে, আর যাত্রার জন্যে ঘোড়ার গাড়ি তৈরি। সরাইখানার মালিকের প্রাপ্য চুকিয়ে দিলাম। দেখা গেল, টাকার জন্যে সরাইখানার মালিকের দাবী এতই ন্যায্য যে সাভেলিচ পর্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ অভ্যেসের বলে প্রতিবাদ বা দরাদরি করল না। তার মন থেকে গত রাত্রের সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমি আমাদের পথপ্রদর্শককে ডেকে তার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাকে পঞ্চাশ কোপেক ভদ্‌কার জন্যে দিতে বললাম সাভেলিচকে। ভুরু কুঁচকে সাভেলিচ বলল, 'ভদ্‌কা গিলবার জন্যে পঞ্চাশ কোপেক! কেন শুনি? তুমি দয়া করে তাকে স্লেজগাড়িতে এই সরাইখানায় নিয়ে এসেছ সে জন্যে? দাদাবাবু, তুমি যা চাও তা হোক, কিন্তু আমাদের বাড়তি পঞ্চাশ কোপেক নেই, এভাবে যদি তুমি প্রত্যেককে ভদ্‌কার জন্যে টাকা দিতে শুরু করো তাহলে শীগ্‌গিরই এমন দিন আসবে যে দিন তোমার নিজেরই না খেয়ে দিন কাটাতে হবে।' সাভেলিচের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। টাকা পয়সা সবই ওর হেপাজতে, এবং এই ব্যবস্থায় রাজি হয়ে আমি নিজেই কথা দিয়েছি। কিন্তু আমার খারাপ লাগছিল এই কথা ভেবে যে, আমাকে যে বাঁচিয়েছে — বাঁচিয়েছে দুর্বিপাক থেকে না হোক, অত্যন্ত প্রতিকূল একটা অবস্থা থেকে — তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারছি না। শান্ত স্বরে আমি বললাম, 'আচ্ছা বেশ, ওকে পঞ্চাশ কোপেক দিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে ওকে আমার একটা পোশাক দিতে চাই। ওর জামাকাপড়ের বড় দুরবস্থা দেখছি, ওকে আমার খরগোশের চামড়ার কোটটা দিয়ে দাও।'

সাভেলিচ বলল, 'সে কি কথা দাদাবাবু! ওই কোট নিয়ে কি করবে কুকুরটা? প্রথম যে পানশালায় গিয়ে হাজির হবে সেখানেই বিক্রি করে দেবে মদ গিলবার জন্যে।'

আমার ভবঘুরেটি বলল, আমি মদ খাই না খাই, তাতে তোমার মাথাব্যথা কিসের, বুড়ো? হুজুর তাঁর গায়ের কোট আমাকে দিতে চাইছেন, সেটা হুজুরের মর্জি। তুমি হচ্ছ হুজুরের নোকর, হুজুর যা বলেন মুখটি বুজে শুনে যাও।'

সাভেলিচ ফুঁশে উঠল, 'ভগবানের ভয় নেই ওরে ডাকাত! ভেবেছ, এই বাচ্চা ছেলেটা তো কিছু বোঝে না, বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই — কাজেই খুশিমতো লুটপাট করে নেওয়া যাবে। কি হবে তোমার ভদ্দরলোকের জামা দিয়ে? তোমার ওই হতকুচ্ছিত কাঁধজোড়াকে হাজার চেষ্টা করেও এই কোটের মধ্যে ঢোকানো যাবে ভেবেছ!'

আমার অভিভাবক খুড়োটিকে বললাম, 'থাক, আর কথা বাড়াতে হবে না। আমার কোটটা এনে দাও।'

সাভেলিচ আর্তনাদ করে উঠল, 'হায়, হায়, ভগবান! খরগোশের চামড়ার কোটটা এখনো যে প্রায় নতুন রয়েছে গো! শেষকালে কিনা এক হতচ্ছাড়া মাতালকে সেটা দান।'

তবুও খরগোশের চামড়ার কোটটা নিয়ে আসা হল। কালবিলম্ব না করে ভবঘুরেটি পরখ করবার জন্যে গায়ে চাপাল সেটা। কোটটা আমার নিজেরই গায়ে একটু ছোট ছোট হয় — লোকটির গায়ের মাপে কোটটা ভয়ানক খাটো। টেনেটুনে গায়ে চাপাতে গিয়ে যখন সেলাইয়ের কাছে খানিকটা ছিঁড়ে গেল, তখনই পরতে পারা গেল সেটাকে। পট্‌পট্‌ শব্দে সেলাই ছিঁড়ে যেতে শুনে সাভেলিচের তো গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দেবার মতো অবস্থা। ভবঘুরেটি কিন্তু আমার এই উপহার পেয়ে মহাখুশি। স্লেজগাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'হুজুরের অশেষ দয়া! ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। আপনার এই দয়া আমি জীবনে ভুলব না।' লোকটি তার নিজের পথ ধরল, আমি আমার গন্তব্য পথে চললাম। সাভেলিচ আপশোষ করতে থাকল। আমি গায়ে মাখলাম না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গতকালের তুষার-ঝড়, আমার পথপ্রদর্শক ও খরগোশের চামড়ার কোটের কথা ভুলে গেলাম।

ওরেনবুর্গে পৌঁছে আমি সোজা গিয়ে হাজির হলাম জেনারেলের কাছে। দেখলাম জেনারেলটি মস্ত লম্বা এক মানুষ, কিন্তু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। লম্বা লম্বা চুলগুলো একেবারে সাদা। পরনে বিবর্ণ পুরনো ইউনিফরম, সেই ইউনিফরমে তাঁকে দেখাচ্ছিল আন্না ইওআনভনার সময়কালের একজন যোদ্ধার মতো। উচ্চারণে জার্মানদেশীয় টান বড়ো বেশি। বাবার চিঠিটা তাঁর হাতে

দিলাম। আমার বাবার নাম শুনে তিনি চকিতে তাকিয়ে দেখলেন আমার মুখের দিকে বললেন, 'মাইন্ গট্! আমার তো মনে হচ্ছে এই গতকাল আন্দ্রেই পেত্রোভিচকে তোমার মতো ছোকরা দেখেছি। আর সে জায়গায় তুমিই কিনা এত বড়োটি হয়ে গেছ! কি ভাবেই না সময় কেটে যায়।' তারপর তিনি খামটা ছিঁড়ে চাপা স্বরে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন আর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চিঠির বিষয়বস্তুর উপরে ধারাবাহিক মন্তব্য করে যেতে লাগলেন: '"প্রিয় আন্দ্রেই কার্লোভিচ, আশা করি মান্যবর"... হুঃ, কিসের জন্যে এসব বাইরের আড়ম্বর! ইস্, এ ভাবে চিঠি লিখতে লজ্জা হওয়া উচিত ছিল! নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হবে বৈকি, সত্যি কথা — কিন্তু পুরনো একজন কামেরাড'এর কাছে এই ভাষায় চিঠি লেখাটা ঠিক নয়!.. "মান্যবর ভুলে যাননি"... তাই বটে... "সেই যখন স্বর্গত ফিল্ড্-মার্শাল মিন ... অভিযান... আর কারোলিন্কা!"... আহ্ বুড়ার! পুরনো ঠাট্টা-তামাসাগুলো দেখছি এখনো মনে আছে... "এবার কাজের কথায় আসি... আমার সর্বকনিষ্ঠ দুর্বৃত্তটিকে আপনার নিকট পাঠালাম"... হুঃ... "কাঁটাদস্তানা দিয়ে টিট্ করে রাখবেন।"' আমার দিকে মুখ তুলে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কাঁটাদস্তানা কি? নিশ্চয় রুশ দেশের কোনো একটা প্রবাদ?'

নিরীহের মতো মুখ করে আমি বললাম, 'এর অর্থ, আপনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করবেন, আমার সম্পর্কে খুব বেশি কড়াকড়ি করবেন না, আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবেন, অর্থাৎ কাঁটাদস্তানা দিয়ে আমাকে টিট্ করে রাখবেন।'

'ও, তাই বুঝি... "উহাকে অত্যধিক স্বাধীনতা দিবেন না"... এই তো... স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কাঁটাদস্তানা দিয়ে টিট্ করার অর্থটা তুমি যা আমাকে বললে তা ঠিক নয়... "উহার পাসপোর্ট এই সঙ্গে পাঠাইলাম"... কোথায়? ও, এই যে! "সেমেনোভ রেজিমেণ্টকে জানাইবেন যে"... ভালো, ভালো, তাই করা হবে... "আপনি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, তবু এখন পুরনো কমরেড ও বন্ধু হিসেবে আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি"... যাক্, শেষ পর্যন্ত মনে পড়েছে... আচ্ছা দেখি... ইত্যাদি, ইত্যাদি...।' চিঠিটা পড়া শেষ হলে পাসপোর্টটা সরিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'তাই করা হবে। অমুক রেজিমেণ্টে

অফিসার তালিকাভুক্ত হবে তুমি, আর যাতে সময় নষ্ট না হয় সেজন্যে কালই রওনা হবে বেলোগর্স্ক কেল্লায়। সেখানে ক্যাপ্টেন মিরোনভ আছেন; অত্যন্ত খাঁটি ও সৎ লোক — তাঁরই অধীনে থাকতে হবে তোমাকে। সত্যিকারের সৈন্যজীবন কাকে বলে সেটা জানতে পারবে ওখানে শৃঙ্খলা শিখতে পারবে। ওরেনবুর্গে থেকে তোমার কিছু করার নেই; তরুণদের পক্ষে কুঁড়েমিটাই খারাপ। হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যের সময় আমার এখানে খেতে এলে খুশি হব।'

যত সময় যায় ততই দেখি অবস্থা কঠিন। মনে মনে ভাবলাম: মা'য়ের পেটে থাকতেই রক্ষীবাহিনীর সার্জেণ্ট হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত করে কী ফল হল? শেষকালে কিনা আসতে হল কিরগিজ-কাইসা স্তেপ অঞ্চলের সীমানায় বহুদূরের এক কেল্লা বাহিনীতে!.. সন্ধ্যেবেলা আন্দ্রেই কার্লোভিচের সঙ্গে খেলাম। মোট তিনজন ছিলাম আমরা — তিনি, তাঁর পুরনো এডিকং এবং আমি। দেখা গেল, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাঁর জার্মানসুলভ কঠোর মিতব্যয়িতা। এবং আমাকে যে তিনি এত তাড়াতাড়ি ছাউনিতে পাঠিয়ে দিলেন তার পিছনে তাঁর এই ভয় ছিল কিনা যে আবার হয়তো তাঁর স্ত্রীবিহীন ডিনার টেবিলে ভাগ বসাবার জন্যে অন্য কাউকে আমন্ত্রণ করতে হতে পারে — এ বিষয়ে আমি হলফ করে কিছু বলতে পারি না। পরদিন জেনারেলের কাছে বিদায় নিয়ে আমি গন্তব্য স্থান অভিমুখে রওনা হলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

কেল্লা
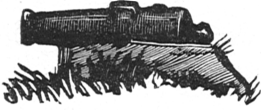
আমাদের কেল্লা ভাই আমাদের কেল্লা
নেই কোনো আস্তর নেই কোনো জেল্লা।
রুটি আর জল ভাই আমাদের খাদ্য
শত্রুর তরে আছে পৃথক বরাদ্দ।
প্রমোদের সন্ধানে আসে তারা যবে
ভূরিভোজে সমাদর করি মোরা সবে।
বারুদ বুলেট আর শেল গোলাগুলি
তাদের তরেই ভরা আছে ঝোলাঝুলি।

সৈনিকদের গান

'পুরনো কালের মানুষ, হুজুর!'

বয়স্ক নাবালক

ওরেনবুর্গ থেকে চল্লিশ ভার্স্ট দূরে বেলোগর্স্ক কেল্লা। ইয়াইক নদীর খাড়া পাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তাটা গেছে। নদীটা তখনো বরফে জমে যায়নি, ধূ ধূ বরফঢাকা দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভারী জলের স্রোতকে কালো আর বিষণ্ণ দেখায়। দু-দিকে প্রসারিত কিরগিজ স্তেপ অঞ্চল। আমি গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলাম; চিন্তার বেশির ভাগই ছিল বিষণ্ণ। কেল্লার জীবনের ওপর আমার কোনো টান ছিল না। আমি মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম, আমার

ভাবী উচ্চতর অফিসার ক্যাপ্টেন মিরোনভ মানুষটি কেমন হবেন। কল্পনায় একটা ছবি ভেসে উঠল: বদমেজাজী এবং বুড়ো, সমস্ত ব্যাপারে ভয়ানক কড়াকড়ি, জগৎসংসার বলতে বোঝেন শুধু নিজের পেশা, তুচ্ছতম অপরাধেই আমাকে তিনি গ্রেপ্তার করে দিনের পর দিন শুকনো রুটি আর জল খাইয়ে রাখবেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের গাড়ি বেশ জোরেই চলছিল। কোচোয়ানকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেল্লা কি আরও অনেকদূর?' সে জবাব দিল, 'খুব বেশি দূরে নয়। ওই তো এবার দেখা যাচ্ছে।' আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। ভেবেছিলাম দেখতে পাব মস্ত উঁচু উঁচু বুরুজ ও খিলান উঠেছে, মস্ত র‍্যাম্পার্ট; কিন্তু বেড়া দিয়ে ঘেরা কয়েকটা এলোমেলো কাঠের বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। রাস্তার এক ধারে তিন চারটে খড়ের গাদা, অনেকটাই বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। অন্য ধারে একটা হুমড়ি-খেয়ে-পড়া হাওয়াকল, গাছের ছাল দিয়ে তৈরি পালগুলো অলসভাবে ঝুলে আছে। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেল্লা কোথায়?' সেই মুহূর্তে আমরা যে একটা ছোট গ্রামের মধ্যে ঢুকছিলাম, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে কোচোয়ান বলল, 'ওই তো।' দেখলাম ফটকের একপাশে রয়েছে একটা প্রাচীন যুগের লোহার কামান, রাস্তাগুলো সরু সরু আর আঁকাবাঁকা বাড়িগুলো নিচু নিচু, আর অধিকাংশ বাড়িতেই খড়ের চাল। অধিনায়কের আপিসের দিকে গাড়ি চালাতে হুকুম দিলাম কোচোয়ানকে। একটু পরেই স্লেজগাড়ি যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা হচ্ছে উঁচু জমির ওপরে ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি আর বাড়িটার পাশেই একটা কাঠের গির্জা।

আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ বাইরে এল না। অলিন্দে ঢুকে আমি প্রবেশপথের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। বাইরের ঘরে একটা টেবিলের ওপরে বসে আছে একজন বুড়ো বিকলাঙ্গ সৈনিক; একটা সবুজ পোশাকের আস্তিনে নীল কাপড়ের তালি লাগাচ্ছে। আমার আসার খবর ঘোষণা করতে বললাম তাকে। সে জবাব দিল, 'বাপু, আপনি ভিতরে চলে যান, তাঁরা বাড়িতেই আছেন।' আমি ভিতরে ঢুকলাম। একটা ছোট পরিষ্কার ঘর, পুরনো ধরণের আসবাবে সাজানো। এক কোণে একটা আলমারির মধ্যে আছে পেয়ালা, ডিশ,

ইত্যাদি, দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রেম ও কাচ দিয়ে বাঁধানো অফিসারের পরিচয়পত্র। তার পাশেই কয়েকটি শস্তা ছাপা ছবি — 'কিস্ত্রিন ও ওচাকভ জয়', 'কনে বাছাই', 'বেড়ালের সমাধি'। একজন বৃদ্ধা বসে আছেন জানলার কাছে, পরনে তুলোভরা জ্যাকেট, মাথায় রুমাল। বসে বসে তিনি উল জড়াচ্ছেন। দু-হাত সামনে বাড়িয়ে উলটা উঁচু করে তুলে ধরে আছেন অফিসারের সাজপোশাক-পরা একজন একচোখওলা বুড়ো লোক। হাতের কাজ না থামিয়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাপু, বলুন আপনার অভিপ্রায় কি?' আমি জবাব দিলাম যে আমি এসেছি সৈন্যদলে কাজ করবার জন্যে এবং ক্যাপ্টেনের কাছে আমার উপস্থিতির সংবাদ জানানো কর্তব্য বলে মনে করেছি। এই বলে সেই একচক্ষু বৃদ্ধটির দিকে ফিরে দাঁড়ালাম, আমার ধারণা হয়েছিল যে তিনিই হচ্ছেন অধিনায়ক। আমি কি বলব তা আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম কিন্তু গৃহস্বামিনী বাধা দিয়ে বললেন, 'ইভান কুজমিচ বাড়িতে নেই, ফাদার গেরাসিমের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তবে সে জন্যে ভাববেন না, আমি তার স্ত্রী। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বসুন।' তারপর তিনি ঝিকে ডাক দিলেন এবং সার্জেণ্টকে ডেকে আনবার জন্যে পাঠালেন তাকে। সেই বৃদ্ধ তাঁর একচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'জানতে পারি কি, আপনি কোন্ রেজিমেণ্টে ছিলেন?' আমি তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করলাম। তিনি প্রশ্ন করে চললেন, 'জানতে পারি কি, কেন আপনি রক্ষীবাহিনী ছেড়ে কেল্লায় আসছেন?' আমি জানালাম যে এই হচ্ছে আমার ওপরওয়ালাদের ইচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নকর্তা নাছোড়বান্দা; তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন: 'শুনে মনে হচ্ছে, আপনি হয়তো এমন কিছু আচরণ করেছিলেন যা রক্ষীবাহিনীর অফিসারের অনুপযুক্ত কোনো কাজের জন্য, বোধ করি?' ক্যাপ্টেন-গিন্নি বললেন, 'হয়েছে, বক্‌বকানি থামাও তো! দেখতে পাচ্ছ না, যুবকটি পথশ্রমে ক্লান্ত — একটু রেহাই দাও ওকে! (ঠিকমতো হাত তুলে ধরো! ঠিকমতো!) আর আপনাকে বলছি বাপু, শুনুন,' তারপর আমার উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'এই অজ জায়গায় আপনাকে পাঠানো হয়েছে বলে দুঃখ করবেন না। আপনিই প্রথম

নন, আগেও অনেকে এসেছে, পরেও অনেকে আসবে। কিছুদিন পরেই অভ্যেস হয়ে যায়। তখন আর খারাপ লাগে না। এই তো আলেক্সেই ইভানভিচ শ্ভাব্রিন চার বছর হল এখানে এসেছে। মানুষ-খুনের দায়ে আসতে হয়েছিল ওকে, ভগবান জানেন কেন ওর মাথায় এই দুর্বুদ্ধি চাপে। শুনুন আপনাকে বলি, একজন লেফ্‌টেনাণ্ট আর ও একদিন তলোয়ার নিয়ে শহরের বাইরে চলে যায়, তারপর তলোয়ার নিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করে, আলেক্সেই ইভানভিচ তলোয়ার দিয়ে লেফ্‌টেনাণ্টের শরীর ফুঁড়ে দেয় একেবারে দু-জন সাক্ষীর সামনে, কী রকম বলুন। বিপদের তো ছাড় নেই।'

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল সার্জেণ্ট, লম্বা-চওড়া চেহারার একজন তরুণ কসাক। বৃদ্ধা বললেন, 'মাক্‌সিমিচ, এই অফিসারটির জন্যে বেশ ভালোমতো একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে দাও।' সার্জেণ্ট জবাব দিল, 'বেশ তাই হবে, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা। মান্যবরের থাকবার জায়গা কি ইভান পলেজায়েভের ওখানে করব?' ক্যাপ্টেন-গিন্নি জবাব দিলেন, 'না, না, মাক্‌সিমিচ, ওখানে এমনিতেই বড়ো বেশি হট্টগোল। তাছাড়া পলেজায়েভ আমার বন্ধু আর একথা বোঝে যে আমরা তার উপরওলা। বরং অফিসারটিকে... মশাই, আপনার নাম কি? পিওতর আন্দ্রেইচ?.. বেশ, পিওতর আন্দ্রেইচকে নিয়ে যাও সেমেন কুজোভের ওখানে। শয়তানটা আমার সব্‌জির বাগানে ওর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর মাক্‌সিমিচ, সবকিছু ভালো তো?'

কসাকটি জবাব দিল, 'ভগবানের দয়ায় সব শান্ত আছে। একবার শুধু কর্পোরাল প্রখোরভ ও উস্‌তিনিয়া নেগুলিনা স্নানঘরে গিয়ে এক বালতি গরম জল নিয়ে ঝগড়া করেছিল।'

'ইভান ইগ্‌নাতিচ!' ক্যাপ্টেন-গিন্নি এবার সেই একচক্ষু বৃদ্ধকে বলতে লাগলেন, 'প্রখোরভ ও উস্‌তিনিয়ার সঙ্গে কথা বলে দেখো। দোষটা কার জানতে হবে, তবে যারই দোষ হোক না কেন শাস্তি দেবে দুজনকেই। ঠিক আছে মাক্‌সিমিচ, এবার তুমি যেতে পার! পিওতর আন্দ্রেইচ, মাক্‌সিমিচ আপনাকে থাকবার জায়গা দেখিয়ে দেবে।'

নমস্কার জানিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। সার্জেণ্ট আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল নদীর উঁচু পাড়ের দিকে, কেল্লার অন্তর্ভুক্ত এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে। বাড়ির অর্ধেকটায় থাকে সেমেন কুজোভ ও তার পরিবার, বাকি অর্ধেকটা দেওয়া হল আমাকে। একটিমাত্র ঘর, মাঝখানে আড়াল দিয়ে ভাগ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাভেলিচ বাঁধাছাঁদা খুলবার কাজে লেগে গেল আর আমি সরু জানলাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যতদূর চোখ যায়, বিষণ্ন স্তেপ অঞ্চল। প্রায় উল্টোদিকেই কয়েকটা কুঁড়েঘর, কয়েকটা মুরগী রাস্তার এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। হাতে গামলা নিয়ে এক বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দরজার সামনে, শুয়োরগুলোকে ডাকছে, সেই ডাক শুনে শুয়োরগুলোও সানন্দে সাড়া দিচ্ছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। এমনই নির্মম ভাগ্য আমার যে এই জায়গাতেই আমার যৌবনকাল কাটাতে হবে! ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। জানলা থেকে সরে এসে আমি কিছু না খেয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সাভেলিচ অনেক সাধ্যসাধনা করল আর সখেদে বারবার বলতে লাগল, 'হায় ভগবান! না খেয়েই শুয়ে পড়ল! এখন যদি একটা অসুখ-বিসুখ করে তাহলে গিন্নীর কাছে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে!'

পরদিন সকালে উঠে আমি পোশাক পরতে শুরু করেছি, ঠিক সেই সময়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল একজন তরুণ অফিসার। লম্বা নয়, মুখখানা গাড় রঙের, আর যাই হোক সুপুরুষ বলা চলে না, তবে মুখের হাবভাব খুবই জীবন্ত। ফরাসী ভাষায় সে আমাকে বলল, 'কোনো একটা উপলক্ষের জন্যে অপেক্ষা না করেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি বলে ক্ষমা করবেন। গতকাল আপনার আসার খবর শুনেছি। শুনে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না; কতকাল পরে একটি মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে! থাকুন এখানে কিছুদিন তখন আমার কথার মর্ম আপনি বুঝবেন।' আমি অনুমান করে নিলাম যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়ার জন্যে এই অফিসারটিকেই রক্ষীবাহিনী থেকে এখানে বদলি করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। শ্‌ভাব্রিনকে দেখে খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। তাছাড়া,

বাক্‌পটু এবং সদালাপী। অধিনায়ক ও তার পরিবার সম্পর্কে, আমার ভাগ্য যেখানে আমাকে টেনে এনেছে সেই জায়গার সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে উদ্দীপ্ত বর্ণনা দিল সে। মশগুল হয়ে আমি হাসছিলাম, এমন সময় ঘরে ঢুকল সেই সৈন্যটি যাকে আমি আগের দিন অধিনায়কের বাড়ির সদর ঘরে বসে পোশাকে তালি দিতে দেখেছি। ঘরে ঢুকে সে আমাকে জানাল যে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা আমাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্‌ভাব্রিন নিজের থেকেই বলল যে আমাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অধিনায়কের বাড়ির কাছাকাছি এসে আমরা দেখলাম যে মাঠের মাঝখানে জনকুড়ি বৃদ্ধ রুগ্‌ণ লোককে এ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে দাঁড় করানো হয়েছে। লম্বা বিনুনি করে সকলের চুল বাঁধা, মাথায় তিনকোণা টুপি। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অধিনায়ক। বুড়োর লম্বা চেহারা, ক্ষিপ্র চালচলন, পরনে রাতটুপি ও ড্রেসিং গাউন। শ্‌ভাব্রিন ও আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি আমাদের কাছে এসে আমায় বললেন গোটাকতক সস্নেহ কথা। তারপর আবার ড্রিল করাতে লাগলেন সেই লোকগুলোকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল আমাদের। কিন্তু ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার কাছে যেতে বললেন তিনি আমাদের এবং কথা দিলেন যে তিনি নিজেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছেন। 'এখানে তোমরা আর কি দেখবে — কিছু দেখবার নেই।' বললেন কথার শেষে।

সহজ সম্প্রীতির সঙ্গে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা ঘরে নিয়ে বসালেন আমাদের। আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বললেন যেন আমি তাঁর অনেকদিনের পরিচিত। পরিচারিকাটি টেবিল সাজাচ্ছিল, তাকে সাহায্য করছিল সেই বিকলাঙ্গ সৈনিকটি। অধিনায়ক-পত্নী বললেন, 'ইভান কুজমিচ আজ বড়ো বেশি সময় ধরে ড্রিল করাচ্ছে। পালাশা, যাও, কর্তাকে ডেকে নিয়ে এস। আর মাশা কোথায় গেল?' এই সময় ঘরে ঢুকল একটি বছর আঠারোর মেয়ে। গোলগাল মুখ, গোলাপী রং, ফ্যাকাশে চুল কানের পিছন টেনে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে আমার তেমন ভালো লাগেনি। শ্‌ভাব্রিন আমাকে বলেছে যে ক্যাপ্টেনের মেয়ে মাশা অনেকটা হাবা ধরণের। তাই

কুসংস্কারমুক্ত চোখ নিয়ে আমি ওর দিকে তাকাতে পারিনি। মেয়েটি এক কোণে বসে সেলাই করতে লাগল। ইতিমধ্যে কপির ঝোল আনা হয়েছে। স্বামীকে দেখতে না পেয়ে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা আবার পালাশাকে পাঠালেন স্বামীর খোঁজে। বললেন, 'কর্তাকে গিয়ে বলো যে অতিথিরা অপেক্ষা করছে, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ড্রিল করানো তো পরেও চলতে পারে — ভগবানের ইচ্ছেয় লোকজনের ওপর হম্বিতম্বি করার সময় তো যথেষ্টই পড়ে আছে।' একটু পরেই ক্যাপ্টেন এসে হাজির। সঙ্গে সেই একচক্ষু বৃদ্ধ লোকটি। 'তোমার কি কাণ্ড গো! সেই কখন খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমার আর আসার ফুরসৎ হয় না।' ইভান কুজমিচ জবাব দিলেন, 'ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা, সৈন্যদের ড্রিল করাচ্ছিলাম একটু।'

ক্যাপ্টেন-গিন্নি বললেন, 'দূর, দূর! ওই লোকগুলোকে ড্রিল করিয়ে লাভ কি? ওরা কক্ষণো এসব শিখতে পারবে না। আর তোমার নিজেরও জিনিসটা খুব ভালো জানা নেই। বরং তোমার পক্ষে বাড়িতে থেকে ভগবানের নাম করাই ভালো। কই গো অতিথিরা, খেতে বসো।'

আমরা খেতে বসলাম। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা এক মুহূর্তের জন্যেও কথা বন্ধ করলেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করে চললেন আমার ওপরে। আমার বাবা-মা কে? তাঁরা এখনো বেঁচে আছেন কিনা? কোথায় জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা? অবস্থা কী রকম? আমার বাবার তিনশো ভূমিদাস আছে শুনে অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখ দিকি কাণ্ড! এমন লোকও আছে যাদের অঢেল টাকা! কিন্তু আমাদের যথাসর্বস্ব এই একটি ঝি — পালাশা। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের দিন যে খুব খারাপ যাচ্ছে তা নয়। একমাত্র মনস্তাপ মাশাকে নিয়ে। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে — কিন্তু যৌতুকের ব্যবস্থা কই? যৌতুক বলতে একটা কাঁকুই, একটা ঝাড়ু চিরুণী আর একটা রুপোর টাকা (অলুক্ষণে কথার দোষ নিওনা ভগবান!)। সৎ মানুষ যদি কেউ ওকে বিয়ে করতে চায় — ভালো, নইলে সারাজীবন কুমারী থাকতে হবে ওকে।' মারিয়া ইভানভনার দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। মুখটা টক্‌টকে লাল হয়ে

উঠেছে। আর সত্যি সত্যিই চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে প্লেটের ওপরে। ওর জন্যে দুঃখ হল আমার। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে অনেকটা অসংলগ্নভাবেই আমি বললাম, 'আমি শুনেছি বাশ্কিররা নাকি আপনাদের কেল্লা আক্রমণ করবার মতলব আঁটছে?' 'মশাই, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, আপনি একথা কোত্থেকে শুনেছেন?' ইভান কুজমিচ প্রশ্ন করলেন। আমি জবাব দিলাম, 'ওরেনবুর্গে শুনেছি।' অধিনায়ক বললেন, 'বাজে কথা। বহুকাল ধরে এখানকার অবস্থা শান্ত। বাশ্কিরদের মধ্যে আতঙ্ক এসেছে, কিরগিজরাও শিক্ষা পেয়েছে। এই অবস্থায় আমার মনে হয় না ওরা আর কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে? আর যদি করে তো এমন উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব যে দশ বছর আর টুঁ শব্দটি করবে না।' ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার দিকে ফিরে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই কেল্লার ওপরে তো যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে, এখানে থাকতে আপনার ভয় করে না?' ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা জবাব দিলেন, 'আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, বাপু। কুড়ি বছর আগে যখন আমরা রেজিমেণ্ট থেকে বদলি হয়ে এখানে আসি, তখন ওই বিধর্মী লোকগুলোর কথা ভেবে কী আতঙ্কই না হয়েছিল! বনবেড়ালের লোমের তৈরি ওদের মাথার টুপি চোখে পড়লে বা ওদের হুঙ্কার কানে গেলে বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে যেত যেন। কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলছি না। কিন্তু এখন ওদের দেখে দেখে চোখ সওয়া হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ এসে আমাকে বলে যে শয়তানগুলো কেল্লার চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলেও আমি এক-পা নড়ব না।'

অর্থপূর্ণ স্বরে শ্ভাব্রিন মন্তব্য করল, 'ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা সত্যিকারের বীরাঙ্গনা। ইভান কুজমিচ তার সাক্ষী।'

ইভান কুজমিচ বললেন, 'তা বটে। অল্পেতেই মূর্ছা যায় তেমন মেয়েই নয় ও।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর মারিয়া ইভানভনা? তিনিও কি আপনার মতোই সাহসী?'

মাশার মা জবাব দিলেন, 'মাশা সাহসী কিনা জিজ্ঞেস করছ বাপু? না, ভয়ানক ভীতু। এখনো রাইফেলের গুলির আওয়াজ পর্যন্ত সইতে পারে না। শুনলেই একেবারে আঁতকে ওঠে। বছর দুয়েক আগে আমার জন্মদিনে ইভান কুজমিচ কামান দাগবার হুকুম দিয়েছিল। মেয়ে আমার তো ভয়েই মারা পড়বার যোগাড়। তারপর থেকে এই হতভাগা কামানটা আর ব্যবহার করা হয়নি!'

খাওয়া শেষ করে আমরা একসঙ্গে উঠলাম। ক্যাপ্টেন ও ক্যাপ্টেন-গিন্নি একটু ঘুমোবার জন্যে নিজেদের ঘরের দিকে গেলেন। আমি শ্ভাব্রিনের ঘরে গিয়ে সারাটা সন্ধ্যে কাটালাম তার সঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ঠিক্‌সে দাঁড়াও মশায় গো —
করে প্রাণপণ চেষ্টা।
দেখব যাতে মোর তলোয়ার
তোমায় বেঁধে শেষটা। [৪]

ক্‌নিয়াজনিন

কয়েক সপ্তাহ কাটল। ইতিমধ্যে বেলোগর্স্ক কেল্লায় আমার জীবন শুধু যে সহনীয় হয়ে উঠেছে তা নয়, সে জীবনকে সত্যিকারের ভালো লাগতেও শুরু করেছে। অধিনায়কের পরিবারে আমি ঘরের ছেলের মতো হয়ে উঠেছি। ক্যাপ্টেন ও ক্যাপ্টেন-গিন্নি দুজনেই খুব চমৎকার মানুষ। এক সাধারণ সৈনিকের ঘর থেকে এসে ইভান কুজমিচ অফিসার হয়েছেন, লেখাপড়া কিছুই জানেন না, সাদাসিধে মানুষ, কিন্তু অতিমাত্রায় সৎ ও উদার। তাঁকে চালনা করেন তাঁর স্ত্রী। মানুষটির স্বভাবই এমন। ফলে স্ত্রীর এই আধিপত্য তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা এই সৈন্য-ছাউনিকেও দেখেন নিজের ঘর-গৃহস্থালীর একটি অঙ্গ হিসেবে। সুতরাং নিজের সংসারের ওপরে যেমন তিনি আধিপত্য করেন, তেমনি আধিপত্য করেন এই কেল্লার ওপরে। আমার সম্পর্কে মারিয়া ইভানভনার সঙ্কোচ কিছুদিনের মধ্যেই কেটে গেল। পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠলাম আমরা। আমি বুঝতে পারলাম, মেয়েটি যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি অনুভূতিপ্রবণ। নিজের অগোচরেই এই উদার পরিবারের অনুগত হয়ে উঠলাম আমি। এমন কি ছাউনি-লেফ্‌টেনাণ্ট কাণা ইভান ইগ্‌নাতিচকেও ভালো লাগতে লাগল। শ্‌ভাব্রিনের কাছে এই লোকটি সম্পর্কে

একটা বদনামও শ‍ুনেছিলাম; গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে এই লোকটির নাকি অবৈধ সম্পর্ক আছে। এই ধারণার সপক্ষে সামান্যতম য‍ুক্তি আছে বলেও আমার মনে হয়নি। কিন্তু তা নিয়ে শ্‌ভাব্রিনের ভাবনা ছিল না।

যথাসময়ে আমি অফিসার পদভুক্ত হলাম। যে-সব দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হত তা কষ্টসাধ্য নয়। ঈশ্বর রক্ষিত এই কেল্লা, এখানে না আছে নিয়মিত পরিদর্শন, না আছে কুচকাওয়াজ বা পাহারা-ডিউটি। মাঝে মাঝে হঠাৎ একেকবার অধিনায়কের খেয়াল চাপে যে সৈন্যদের একটু কুচকাওয়াজ করাতে হবে। তা সত্ত্বেও তিনি যে সৈন্যদের মধ্যে বাঁ-ডান জ্ঞানটুকু সঞ্চারিত করতে পেরেছেন তা কিন্তু মোটেই নয়। যদিও অনেকেই ভুল করবার ভয়ে প্রত্যেকবার বাঁয়ে বা ডাইনে ফিরবার সময় ক্র‍ুশচিহ্ন আঁকে। শ্‌ভাব্রিনের কাছে কয়েকটি ফরাসী বই ছিল। বইগ‍ুলি আমি পড়তে শ‍ুর‍ু করি এবং ক্রমে আমার মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রেরণা জেগে ওঠে। সকালবেলাটা কাটে বই পড়ে, অন‍ুবাদ করার চেষ্টা করে এবং এমন কি মাঝে মাঝে কবিতা লিখে। প্রায় রোজই আমি খেতে যাই অধিনায়কের বাড়িতে এবং দিনের বাকি অংশটুকু কাটাই সেখানে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে আসেন ফাদার গেরাসিম ও তাঁর স্ত্রী আকুলিনা পাম্‌ফিলভনা। গ‍ুজব রটনায় ইনি সবার সেরা এই জেলায়। বলাই বাহ‍ুল্য, শ্‌ভাব্রিনের সঙ্গে রোজই দেখা হয়। কিন্তু যতোই দিন যাচ্ছে ততোই শ্‌ভাব্রিনের কথাবার্তা বিরক্তিকর হয়ে উঠছে আমার কাছে। ক্যাপ্টেনের বাড়ি নিয়ে তার ঠাট্টা-তামাসা এবং বিশেষ করে মারিয়া ইভানভনা সম্পর্কে তার ব্যঙ্গোক্তি শ‍ুনে খ‍ুব খারাপ লাগত। এই কেল্লায় মেলামেশার জায়গা এই একটি আছে। কিন্তু আমি এতেই খ‍ুশি, আর বেশি কিছ‍ু আমি চাই না।

নানা ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও দেখা যায় যে বাশ্‌কিরদের মধ্যে কোনো রকম চাঞ্চল্যের চিহ্ন নেই। কেল্লার আশেপাশের অঞ্চলে পরিপ‍ূর্ণ শান্তি বজায় আছে। কিন্তু শান্তি ক্ষ‍ুণ্ণ হল আমাদের নিজেদের মধ্যে আচমকা একটা রেষারেষির ফলে।

আগেই বলেছি যে এই সময়ে আমি লিখতে শ‍ুর‍ু করেছি। সমসাময়িক বিচারে আমার লেখাগ‍ুলোকে ভালই বলা চলে। কয়েক বছর পরে আলেক্সান্দার

পেত্রোভিচ সুমারকভ[৫] খুবই প্রশংসা করেছিলেন লেখাগুলোর। একবার গান রচনা করে বেশ খুশি হলাম। সকলেই জানেন যে লেখকেরা মতামত জিজ্ঞেস করবার নামে প্রায়ই এমন একজন শ্রোতাকে চায় যার কাছ থেকে কিছুটা প্রশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং গানটি রচনা করে গিয়ে হাজির হলাম শ্ভাব্রিনের কাছে। কবিতার সমঝ্দার বলতে এই কেল্লায় সেই হচ্ছে একমাত্র লোক। প্রথমে একটু ভণিতা করে নিয়ে পকেট থেকে খাতাটা বার করলাম এবং নিচের এই কবিতাটি পড়ে শোনালাম তাকে।

ইচ্ছা করে নাশ করি প্রেমের ভাবনা,
ভুলে যাই প্রিয়ারে আমার;
কিন্তু হায়, যতক্ষণ মাশা কাছে থাকে,
চিন্তা মোর বন্দী থাকে তার!

আঁখি তার রুদ্ধ রাখে আমারে সর্বদা,
প্রতিক্ষণে মোর চোখে ভাসে;
আমার মর্মের মাঝে আনে অন্ধকার,
চিত্তমাঝে শান্তি মোর নাশে।

মাশা, তুমি জানো মোর অন্তরের দশা,
দয়া করো, দয়া করো মোরে;
কেবল তুমিই পারো মোরে মুক্তি দিতে,
চিরবন্দী আমি তব করে। [৬]

'কি রকম মনে হচ্ছে?' শ্ভাব্রিনকে জিজ্ঞেস করলাম। আশা ছিল যে শ্ভাব্রিন আমাকে ন্যায্যভাবেই প্রশংসা করবে। কিন্তু অপরিসীম ক্ষোভের সঙ্গে শুনতে পেলাম, যে শ্ভাব্রিন এমনিতে সব ব্যাপারে এত বেশি প্রশ্রয় দেয় সে চূড়ান্ত গলায় ঘোষণা করল যে আমার গানটি ভালো হয়নি।

'একথা কেন বলছ?' নিজের ক্ষোভকে গোপন করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে জবাব দিল, 'কেন বলছি জানতে চাও? আমার গুরু ভাসিলি কিরিলিচ ত্রেদিয়াকভ্স্কির[৭] লেখাকে নকল করে লেখা এই কবিতাটি। এটি শোনার পর তাঁর লেখা প্রেমের কবিতার কথাই বড়ো বেশি মনে পড়ে যায়।'

এই কথা বলে সে আমার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে কবিতার প্রতিটি লাইন এবং প্রতিটি শব্দকে নির্মমভাবে সমালোচনা করতে লাগল এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপে অস্থির করে তুলল আমাকে। শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে আমি তার হাত থেকে খাতাটা ছিনিয়ে নিলাম এবং বললাম যে আমি আর কক্ষণো তাকে আমার লেখা কোনো কবিতা দেখাব না। আমার এই শাসানি শুনে শ্ভাব্রিন হাসতে লাগল। বলল, 'দেখা যাক, তোমার কথা ঠিক থাকে কিনা। ইভান কুজমিচের যেমন খাওয়ার আগে দু-এক গ্লাস ভদ্‌কা চাই-ই চাই তেমনি কবিরও চাই একজন শ্রোতা। আর এই মাশাটি কে শুনি? — যার জন্যে তোমার এমন পেলব আবেগ আর এমন প্রেমের যন্ত্রণা? মারিয়া ইভানভনা নয় নিশ্চয়ই?'

ভুরু পাকিয়ে আমি জবাব দিলাম, 'যে-ই হোক না কেন তাতে তোমার কি? তোমার মতামতও আমি শুনতে চাই না, তোমার অনুমান বা আন্দাজ দিয়েও আমার কোনো কাজ নেই।'

'ওরে বাবা রে! এ যে দেখছি একাধারে অভিমানী কবি ও বিনয়ী প্রেমিক!' শ্ভাব্রিন বলে চলল, আর ওর কথা শুনে ক্রমেই সপ্তমে চড়তে লাগল আমার মেজাজ — 'বন্ধুভাবে তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোন — যদি সফল হতে চাও তাহলে আমার উপদেশ হচ্ছে এই যে শুধু কথার মালা গেঁথেই চুপ করে থেকো না।'

'হুজুর কি বলতে চান দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি!'

'সানন্দে! আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে এই — যদি তোমার ইচ্ছে থাকে যে মাশা মিরোনভা গোধূলি বেলায় তোমার ঘরে গিয়ে হাজির হবে তাহলে শুধু মৃদু কবিতা স্তবক উপহার দিলেই চলবে না, একজোড়া দুলও দিতে হবে।'

আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। মনের জ্বালাটা বহুকষ্টে চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাশা মিরোনভা সম্পর্কে এমন একটা নিচু ধারণা করবার কারণটা জানতে পারি কি?'

পৈশাচিক শ্লেষের সঙ্গে সে জবাব দিল, 'কারণ মেয়েটির স্বভাবচরিত্র যে কি রকম তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি।'

ফুঁশে উঠে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'সব মিথ্যে কথা, শয়তান! বেহায়ার মতো তুমি মিথ্যে বলছ!'

শ্ভাব্রিনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার হাতটা জোরে চেপে ধরে বলল সে, 'এসব কথা চুপচাপ সহ্য করা চলে না। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি।'

'বেশ! যখন তোমার মর্জি।' আমি জবাব দিলাম; আমার মন থেকে বড়ো রকমের একটা বোঝা নেমে গেছে। এই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থাটা এমন যে আমি ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারি।

তক্ষুণি আমি বেরিয়ে পড়লাম ইভান ইগ্নাতিচকে খুঁজে বার করবার জন্যে। গিয়ে দেখলাম সে একটা সুঁচ নিয়ে বসেছে। ক্যাপ্টেন-গিন্নির হুকুমে ব্যাঙের ছাতা সুতোয় গেঁথে রাখছে; তারপর সেগুলোকে শুকিয়ে শীতকালের জন্যে মজুদ রাখা হবে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে বলল, 'এই যে পিওতর আন্দ্রেইচ, আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন! আপনার শুভাগমনের উদ্দেশ্য জানতে পারি কি?' আমি সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমি আলেক্সেই ইভানভিচের সঙ্গে ঝগড়া করেছি এবং আমার ইচ্ছে যে ইভান ইগনাতিচ আমার দোসর হয়। একচোখের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, চোখটা বিস্ফারিত করতে করতে এবং মন দিয়ে আমার কথা শুনে সে বলল, 'আপনি আলেক্সেই ইভানভিচের শরীরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে চান এবং আপনার ইচ্ছে যে আমি এ-ব্যাপারে সাক্ষী থাকি — এই তো? আপনার কথার ঠিক অর্থ ধরতে পেরেছি তো?'

'তাই।'

'পিওতর আন্দ্রেইচ, হল কি আপনার? আপনি কি ভাবছেন বলুন তো?

আলেক্সেই ইভানভিচের সঙ্গে আপনি ঝগড়া করেছেন — কিন্তু তারপর? মুখের কথায় যতোই ঝগড়া করুন না কেন তাতে শরীরের হাড়গোড় ভাঙে না। সে আপনাকে গালাগালি দেবে, আপনি তাকে পাল্টা গালাগালি দেবেন। সে আপনাকে চড় মারে তো আপনি তার কান মলে দিন। এইভাবেই কিছুক্ষণ চলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যান। আমরা নজর রাখি যাতে মিটমাট হয়ে যায় আপনাদের মধ্যে। কারণ একথা তো ঠিকই যে পাশাপাশি যার সঙ্গে থাকতে হবে তাকে তলোয়ারের খোঁচা দেওয়া কি ভালো? অবশ্য আপনি যদি তাকে যমালয়ে পাঠাতে পারেন তাহলে ভালোই। আলেক্সেই ইভানভিচ লোকটাকে আমার কোনো দিনই ভালো লাগেনি, সে মরুক বাঁচুক তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মনে করুন, ব্যাপারটা যদি উল্টে যায়? অর্থাৎ তার তলোয়ার যদি আপনাকেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে? তাহলে কি হবে? তাহলে কার বোকামিটা প্রকাশ পাচ্ছে? বেয়াদপি মাফ করবেন, আপনি আমার এ প্রশ্নের জবাব দিন।'

এই সুবিবেচক লেফ্‌টেনাণ্টের যুক্তি আমাকে নাড়া দিতে পারল না। নিজের মতলবকেই আমি আঁকড়ে ধরে রইলাম। ইভান ইগ্‌নাতিচ বলল, 'যেমন আপনার অভিরুচি। যা ভালো মনে হয় করবেন। কিন্তু আমাকে কেন সেখানে থাকতে হবে? আমি থেকে কি করব? মানুষে মানুষে লড়াই খুব একটা দেখার জিনিস নাকি, বলুন দেখি? ভগবানের কৃপায় তুর্কী ও সুইড্‌দের বিরুদ্ধে লড়তে গেছি। দেখেছি সব।'

আমি তাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম, দ্বন্দ্বযুদ্ধে দোসরের কর্তব্য কি। কিন্তু ইভান ইগ্‌নাতিচ আমার কথার কোনো রকম অর্থ করতে পেরেছে বলে মনে হল না। সে বলল, 'যেমন আপনার অভিরুচি। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। যদি আমাকে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তেই হয় তাহলে আমি কি করব জানেন? ইভান কুজমিচের কাছে সরাসরি গিয়ে বলব যে এই কেল্লার মধ্যে একটি দুষ্কার্যের মতলব আঁটা হয়েছে। এতে রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। সুতরাং অধিনায়ক যেন দয়া করে এই দুষ্কার্যকে বন্ধ করবার জন্যে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন...'

এই কথা শুনে আমার দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হল। ইভান ইগ্নাতিচ যাতে অধিনায়কের কানে কিছু না তোলে সে জন্যে আমি অনুনয়-বিনয় করতে লাগলাম। তার মত পরিবর্তন করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হল আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমাকে কথা দিল এবং আমিও ঠিক করলাম যে তাকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করব না।

সন্ধ্যাটা যথারীতি কাটালাম অধিনায়কের বাড়িতে। যাতে কারও মনে কোনো সন্দেহ না হয় বা কারও কাছ থেকে কোনো রকম বিরক্তিকর প্রশ্ন না ওঠে সে জন্যে আমি চেষ্টা করলাম আমার প্রফুল্লতা বজায় রাখতে আর এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে যাতে মনে হতে পারে যে আমার মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই। কিন্তু আমার মতো অবস্থায় অন্যরা প্রায় সর্বদা যতাখানি ঔদাসীন্য দেখাতে পারে এবং সেকথা বলে বড়াই করে, — তা আমি অর্জন করতে পেরেছি এমন দাবি আমি করি না। সেই দিন সন্ধ্যায় আমার মনটা ছিল ভারি কোমল আর আবেগভরা, একটা অনুভূতির সুরে বাঁধা। মারিয়া ইভানভনা সেদিন আমার মনকে যতোখানি টানতে পেরেছিল এমন আর কোনোদিনও হয়নি। আমি ভাবছিলাম যে আমার সঙ্গে হয়তো এই ওর শেষ দেখা; আর এই চিন্তাটা আমার চোখে ওকে করুণ করে তুলেছিল। শ্ভাব্রিনও উপস্থিত ছিল সেখানে। আমি তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেলাম এবং ইভান ইগ্নাতিচের সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে তা বললাম তাকে। নিস্পৃহ গলায় সে বলল, 'আমাদের আবার দোসরের কি দরকার? দোসর ছাড়াই আমরা কাজ চালিয়ে নিতে পারব।' দুজনে ঠিক করলাম যে আমাদের লড়াই হবে কেল্লার অনতিদূরে খড়ের গাদার পিছনে। পরদিন সকালে ঠিক সাতটার সময় আমরা সেখানে হাজির হব। আমাদের দেখে মনে হয়েছিল যেন আমরা খুবই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের এই অন্তরঙ্গতা দেখে ইভান ইগ্নাতিচ তো মনের আনন্দে আসল কথাটাই প্রকাশ করে ফেলল। সারা মুখে একটা খুশির ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে উঠল সে, 'ঠিক আছে! কোঁদল করার চেয়ে মনের ঝাল মিটিয়ে জোড়াতালি দিয়ে মিটমাট করা ভালো। গায়ের চামড়া বাঁচলে তবে বাপের নাম।'

ক্যাপ্টেন-গিন্নি বসেছিলেন ঘরের এক কোণে, বসে বসে তাসের সাহায্যে

ভাগ্যগণনা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইভান ইগ্‌নাতিচ, কী বললে? আমি শুনতে পাইনি।'

আমার মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ইভান ইগ্‌নাতিচের নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেছে। সে কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছে না। শ্‌ভাব্রিন বাঁচাল তাকে। বলল:

'আমাদের মধ্যে আবার বন্ধুত্ব হতে দেখে ইভান ইগ্‌নাচিত খুশি হয়েছেন।'

'তুমি আবার ঝগড়া করতে গেলে কার সঙ্গে শুনি?'

'পিওতর আন্দ্রেইচ ও আমার মধ্যে ভীষণ রকমের মন কষাকষি হয়েছিল।'

'কি নিয়ে?'

'বিষয়টা অতি তুচ্ছ। একটা গান, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা।'

'গান? এটা কি ঝগড়া করবার মতো বিষয় হল? কি করে ঝগড়া হল শুনি?'

'ব্যাপার আর কী: পিওতর আন্দ্রেইচ একটা গান লিখেছিল। গানটা সে আমাকে গেয়ে শোনায়। তখন আমিও আমার প্রিয় গানটা গুন গুন করে গেয়ে উঠি:

> ক্যাপ্টেনের মেয়ে,
> শিশি-রাতে যেয়ো না পথে ধেয়ে। [৮]

বাস, ঝগড়া হয়ে গেল, পিওতর আন্দ্রেইচ রেগে ওঠে। পরে ভেবে দেখল যে খুশিমতো গান গাইবার অধিকার মানুষের আছে। ব্যাপারটা মিটে গেল।'

শ্‌ভাব্রিনের এই নির্লজ্জতা দেখে রাগে আমার হিতাহিত-জ্ঞান প্রায় লোপ পায় আর কি। কিন্তু ওর কথার অভদ্র ইঙ্গিতটুকু আমি ছাড়া আর কেউ ধরতে পারেনি। অন্তত তা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। গানের কথা থেকে কবিদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। অধিনায়ক মন্তব্য করলেন যে কবিদের সব হুল্লোড় আর মাতলামি করেই দিন কাটে। আমাকে তিনি বন্ধুজনোচিত উপদেশ দিলেন যে কবিতা-টবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। সৈন্য-জীবনের সঙ্গে কবিতা-লেখাটা খাপ খায় না। আর কবিতা লিখে কারও যে বিশেষ উপকার হয় তাও নয়।

যেখানে শ্ভাব্রিন আছে সেখানে বসে থাকতেও আমার অসহ্য লাগছিল। একটু পরেই ক্যাপ্টেন ও তাঁর পরিবারের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমি। ঘরে এসে তলোয়ারটা পরীক্ষা করলাম, তলোয়ারের ধার ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সাভেলিচকে বলে রাখলাম যেন সে আমাকে ছ-টার একটু পরেই উঠিয়ে দেয়। তারপর শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে খড়ের গাদার পিছনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সে এসেই আমাকে বলল, 'আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। কাজেই তাড়াতাড়ি সারা দরকার।' সঙ্গে সঙ্গে টিউনিক খুলে ফেলে অন্তর্বাস-পরা অবস্থায় খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম আমরা দুজনে। হঠাৎ একটা খড়ের গাদার পিছন থেকে চার-পাঁচজন সৈন্যসমেত বেরিয়ে এল ইভান ইগ্নাতিচ। আমাদের জানাল যে আমাদের দুজনকেই অধিনায়কের কাছে যেতে হবে। বিরক্তচিত্তে আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। সৈন্যরা আমাদের ঘিরে রইল আর ইভান ইগ্নাতিচের পিছনে পিছনে আমরা রওনা হলাম কেল্লার দিকে। বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে আগে আগে চলতে লাগল ইভান ইগ্নাতিচ।

সদলে আমরা এসে ঢুকলাম অধিনায়কের বাড়িতে। একটা দরজা খুলে ইভান ইগ্নাতিচ গুরুগম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, 'ওদের ধরে এনেছি!' ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা বেরিয়ে এলেন। 'আচ্ছা তোমাদের কী কাণ্ড বলো তো? কী হচ্ছে এসব? আমাদের এই কেল্লার মধ্যেই কিনা খুনোখুনির মতলব! ইভান কুজমিচ, এক্ষুণি ওদের দুজনকে গ্রেপ্তার করো! পিওতর আন্দ্রেইচ, আলেক্সেই ইভানভিচ, তোমাদের দুজনের তলোয়ার দিয়ে দাও! এক্ষুণি, এই মুহূর্তে! পালাশা, এই তলোয়ার দুটো নিয়ে কুঠরীতে বন্ধ করে রাখ্ তো। পিওতর আন্দ্রেইচ, তোমার কাছ থেকে এমন আচরণ আমি কক্ষণো আশা করিনি। লজ্জা হয় না তোমার? আলেক্সেই ইভানভিচের কথা আলাদা — ওকে তো মানুষ খুনের অপরাধেই রক্ষীবাহিনী থেকে এখানে বদলি করেছে, ভগবানে বিশ্বাস নেই ওর। কিন্তু তুমি, তুমি! তুমিও কি ওর মতো হতে চাও?'

স্ত্রীর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে ইভান কুজমিচ একমত হলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, 'শুনে রাখ, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা ঠিক কথা বলেছে! ফৌজী আইন-কানুনে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে যে ডুয়েল লড়া চলবে না।' ইতিমধ্যে আমাদের কাছ থেকে তলোয়ার দুটো নিয়ে পালাশা কুঠরীতে নিয়ে গেছে। আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। শ্ভাব্রিন নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলল। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনাকে উদ্দেশ করে ভাবলেশহীন গলায় বলতে লাগল সে, 'ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা, আপনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে এই মন্তব্য করতে হচ্ছে যে আমাদের বিচার করার ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে। এটা ইভান কুজমিচের ব্যাপার, তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' ক্যাপ্টেন-গিন্নি আপত্তি করে বললেন, 'বলছ কি তুমি? শরীর ও মনের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রী কি অভিন্ন নয়? ইভান কুজমিচ! তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে আলাদা আলাদা ঘরে আটক করে রাখ। যতোদিন মাথা থেকে শয়তান না নামে ততোদিন জল আর রুটি ছাড়া কিছু খেতে দিও না। তারপর ফাদার গেরাসিম আসুক, এসে ওদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে যাক — ভগবানের কাছে মাথা কুটে ক্ষমা চাক দুজনে, তারপর দশজনের সামনে নিজেদের পাপের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করুক।'

ইভান কুজমিচ কর্তব্য স্থির করতে পারছেন না। মারিয়া ইভানভনা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আস্তে আস্তে ঝড় কেটে গেল। অধিনায়ক-পত্নী শান্ত হলেন এবং পরস্পরকে চুমু খাইয়ে মিটমাট করিয়ে দিলেন আমাদের মধ্যে। আমাদের তলোয়ার দুটো ফিরিয়ে নিয়ে এল পালাশা। দুজনে যখন বেরিয়ে এলাম তখন বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যে আমাদের দুজনের মধ্যে মিটমাট হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল ইভান ইগ্নাতিচ। রাগত স্বরে আমি তাকে বললাম, 'আপনার লজ্জা হয় না? আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে কারও কাছে কিছু প্রকাশ করবেন না, কিন্তু শেষকালে কিনা অধিনায়কের কাছেই আমাদের নামে লাগিয়েছেন!' সে বলল, 'মাথার ওপরে ঈশ্বর আছেন, তিনিই বিচার করবেন। ইভান কুজমিচকে আমি কোনো কথাই

বলিনি। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা পেট থেকে টেনে বার করে নিলেন যে। অধিনায়ককে কোনো কিছু না জানিয়ে তিনিই সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন। তবে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে — ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' এই কথা বলে সে বাড়ির দিকে চলে গেল। শ্‌ভাব্রিন ও আমি একা রইলাম। আমি বললাম, 'আমাদের ঝগড়ার শেষ এইভাবে হতে পারে না।' শ্‌ভাব্রিন জবাব দিল, 'কক্ষণো নয়। আপনার হঠকারিতার জবাব রক্ত দিয়ে আপনাকে দিতে হবে। কিন্তু খুব সম্ভব ওরা আমাদের ওপর কিছুদিন নজর রাখবে। অন্তত কিছুদিন আমাদের ভাণ করতে হবে যেন আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। আচ্ছা চলি।' যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে তারপর আমরা যে যার পথে রওনা হলাম।

অধিনায়কের বাড়িতে ফিরে এসে রোজকার মতো মারিয়া ইভানভনার পাশে বসলাম আমি। ইভান কুজমিচ বাড়িতে নেই, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত। চাপা স্বরে কথা বললাম আমরা। আমি শ্‌ভাব্রিনের সঙ্গে ঝগড়া করেছি শুনে ওদের সবাইকে কী উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হয়েছে সে-কথা বলে মারিয়া ইভানভনা কোমল স্বরে ভর্ৎসনা করল আমাকে। বলল, 'যখন শুনলাম যে তুমি তলোয়ার নিয়ে লড়াই করবার মতলব এঁটেছ, আমি তো মূর্ছা যাই আর কি। পুরুষমানুষরা সত্যিই অদ্ভুত! সামান্য একটা মুখের কথা, যা এক সপ্তাহ পরে আর হয়তো মনেও থাকে না, তার জন্যেই তারা খুনোখুনি করে! এতে তারা যে শুধু নিজেরা প্রাণ খোয়ায় তা নয়, সেই সঙ্গে খুইয়ে বসে নিজেদের বিবেক এবং সেই সব লোকের মঙ্গল যারা... কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে ঝগড়াটা তুমি শুরু করোনি। দোষ নিশ্চয়ই আলেক্সেই ইভানভিচের।'

'মারিয়া ইভানভনা, একথা তুমি কেন বলছ?'

'আমি কি জানি... লোকটার সব কথাতেই খোঁচা উপহাস করে। আলেক্সেই ইভানভিচকে আমার ভালো লাগে না মোটে, তবুও যদি শুনি যে আমাকেও ওর ভালো লাগে না তাহলে আমার খুবই দুঃখ হবে। ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করব আমি।'

'মারিয়া ইভানভনা, তোমার কি মনে হয়, তোমাকে ওর ভালো লাগে?'

মারিয়া ইভানভনা লাল হয়ে উঠল।

'তাই মনে হয় আমার।' থেমে থেমে জবাব দিল ও।

'কেন, একথা মনে হয় কেন?'

'কারণ ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।'

'বিয়ে করতে চেয়েছিল! তোমাকে ও বিয়ে করতে চেয়েছিল? কোন্ সময়ে?'

'গত বছরে। তোমার এখানে আসার দু-এক মাস আগে।'

'তুমি সেই বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওনি বুঝি?'

'দেখতেই পাচ্ছো, আলেক্সেই ইভানভিচ যে খুব চালাক চতুর লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বংশ ভালো, বিষয় সম্পত্তিও আছে। কিন্তু যখনই আমি ভাবি যে বিয়ে করতে হলে এই লোকটির সঙ্গে আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে বেদীর সামনে আর সকলের চোখের ওপর তাকে চুমু খেতে হবে... না, না, তা আমি কক্ষণো পারব না, প্রাণ গেলেও না!'

মারিয়া ইভানভনার কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল এবং অনেক কিছুই আমি এবার বুঝতে পারলাম। ওর কথা উঠলে শ্‌ভাব্রিন কেন যে ওর নামে খারাপ ছাড়া ভালো কক্ষণো বলে না তা এতক্ষণে পরিষ্কার হল আমার কাছে। আমাদের দুজনের পরস্পরের প্রতি মনোভাব কী, তা সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, আর অনবরত চেষ্টা করেছে যাতে আমাদের দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। যে কথাগুলোকে উপলক্ষ করে আমরা ঝগড়া করেছি সেগুলো এখন আমার কাছে আরও ইতর বলে মনে হতে লাগল। কথাগুলোর মধ্যে শুধু যে কুৎসিত অশ্লীলতা আছে তা নয়, ইচ্ছাকৃত কুৎসারটনাও আছে। এই বেহায়া কুৎসারটনাকারীকে শাস্তি দেবার ইচ্ছাটা আগেকার সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে আরো বেশি প্রবল হয়ে উঠল। অধৈর্য হয়ে আমি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশি দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হল না! ঠিক পরের দিনই শ্‌ভাব্রিন এসে টোকা দিল আমার ঘরের জানলায়। আমি তখন একটা শ্লোকগাথা নিয়ে বসেছি, ছন্দ আর মিল খুঁজবার চেষ্টায় পালকের কলমটাকে কামড়াচ্ছি বসে

বসে; টোকা শুনে কলমটা ছুঁড়ে ফেলে তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তার কাছে। শ্‌ভাব্রিন আমাকে বলল, 'ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি? এখন আমাদের ওপর কারও নজর নেই। চল নদীর ধারে যাই। সেখানে কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না।' আমরা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম। একটা খাড়াই রাস্তা ধরে নামতে নামতে আমরা দাঁড়ালাম এসে একেবারে নদীর ধারে। তারপর তলোয়ার কোষমুক্ত করলাম। তলোয়ার-চালনায় শ্‌ভাব্রিন আমার চেয়ে পটু, কিন্তু সাহস আর শরীরের ক্ষমতা আমার বেশি। মসিয়ে বোপ্রে একসময়ে সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই তলোয়ার-চালনা আমি কিছুটা শিখেছিলাম। সেই শিক্ষা এবার কাজে লাগল। শ্‌ভাব্রিন আশা করেনি যে আমি এমন একটা বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী। বহুক্ষণ আমরা কেউ কাউকে ঘা দিতে পারলাম না। শেষকালে যখন বুঝতে পারলাম যে শ্‌ভাব্রিন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে তখন আমি নতুন উদ্যমে তাকে আক্রমণ করলাম। তাকে জলের মধ্যে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়েছি এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার নাম ধরে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম — সাভেলিচ। পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে আমার দিকে আসছে...। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ডান কাঁধের নিচে বুকের মধ্যে তীক্ষ্ম একটা খোঁচা অনুভব করলাম। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেম

কন্যে ওগো কন্যে!
বয়েস তোমার নয়কো বিয়ের যুগ্যি।
শুধাও তোমার মা-বাবাকে,
শুধাও তোমার আপন জনকে;
সবুর করো যতদিন না পাকে তোমার বুদ্ধি!

লোকসঙ্গীত

আমার চেয়ে সরেস পেলে
আমায় যাবে ভুলে;
আমার চেয়ে নিরেশ পেলে
রাখবে মনে তুলে।

লোকসঙ্গীত

জ্ঞান ফিরে আসার পর কিছুক্ষণ কোনো ঘটনাই আমার মনে পড়ল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি আমি, আর ভয়ানক দুর্বল বোধ করছি। একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে সাভেলিচ দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। আমার বুক ও কাঁধের চারপাশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আর কে যেন সন্তর্পণে সেই ব্যাণ্ডেজ খুলছে। তারপর আস্তে আস্তে আমার চিন্তার স্বচ্ছতা ফিরে এল। মনে পড়ল ডুয়েল লড়ার কথা। অনুমান করে নিলাম যে আমি আহত হয়েছি। ঠিক সেই সময়ে দরজা খোলার কিচ-কিচ শব্দ শোনা গেল, তারপরেই একটা চাপা গলার স্বর: 'কেমন আছে এখন?' আর সেই গলার স্বর শুনে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল আমার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে। 'আগের মতোই, তেমনি অজ্ঞান হয়ে আছে। আজ নিয়ে পাঁচদিন হল।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল সাভেলিচ। আমি পাশ ফিরতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম

না। 'আমি কোথায়? কে কথা বলছে?' প্রাণপণ চেষ্টা করে কথাগুলো বললাম আমি। মারিয়া ইভানভনা বিছানার কাছে সরে এসে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কেমন বোধ হচ্ছে?' দুর্বল স্বরে আমি জবাব দিলাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কে কথা বলছে — মারিয়া ইভানভনা? আচ্ছা বলো তো...' কথার মাঝখানেই থেমে গেলাম। কথাটা শেষ করবার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। সাভেলিচ উত্তেজিত হয়ে উঠল। সারা মুখে আনন্দ ফেটে পড়ছে। বারবার শুধু বলছে, 'জ্ঞান ফিরে এসেছে! জ্ঞান ফিরে এসেছে! হে ঠাকুর, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম! দাদাবাবু, ইস্, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলে! কম নয়, পাঁচ পাঁচটা দিন —একবার ভাবো দিকিনি!' সাভেলিচকে থামিয়ে দিয়ে মারিয়া ইভানভনা বলল, 'এখন আর বেশি কথা বোলো না সাভেলিচ। উনি এখনো খুব দুর্বল।' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমার চিন্তার রাজ্যে তখন ঝড় উঠেছে। তাহলে আমি আছি অধিনায়কের বাড়িতে, মারিয়া ইভানভনা এসেছিল আমাকে দেখতে। সাভেলিচকে আমি দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে কানে ছিপি এঁটে মাথা নেড়ে দিল। বিরক্ত হয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম আর তারপরেই গভীর ঘুম এসে বিস্মৃতির অতলে নিয়ে গেল আমাকে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি সাভেলিচকে ডাকলাম। কিন্তু তার বদলে চোখে পড়ল মারিয়া ইভানভনা আমার পাশে বসে আছে। স্বর্গের দেবীর মতো মিষ্টি সুরে আমাকে ও অভিবাদন জানাল। ঠিক সেই মুহূর্তে যে গভীর আবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার মাধুর্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই; কোনো কালে হবে বলেও আশা করি না। আমি ওর হাতে হাত রাখলাম, আবেগের আতিশয্যে হাতটা চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে চেপে ধরে রইলাম। মাশা হাত সরিয়ে নিল না... আর তারপরেই হঠাৎ ওর ঠোঁটের ছোঁয়া লাগল আমার গালে; এই চুম্বন ওর সারল্যভরা উচ্ছল প্রাণেরই একটা প্রকাশ। আমার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে আগুন বয়ে গেল যেন। আমি ওকে বললাম, 'মারিয়া ইভানভনা, লক্ষ্মীটি, আমার বৌ হয়ে আমার সারা জীবনকে সুখে ভরিয়ে তোল!' এবার ওর সম্বিৎ ফিরে এসেছে,

হাতটা টেনে নিয়ে ও বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, একটু শান্ত হও। এখনো বিপদ কাটেনি, তোমার ক্ষতের মুখ আবার খুলে যেতে পারে। অন্তত আমার কথা ভেবেও নিজের দিকে দৃষ্টি দিও!' এই কথা বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর উদ্বেল আনন্দে ভাসতে লাগলাম আমি। সুখ আমায় বাঁচিয়ে তুলল। ও আমার হবে! ও আমাকে ভালোবাসে! আমার সমগ্র সত্তা ভরে গেল এই চিন্তায়।

তারপর থেকে ক্রমেই ভালো হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। আমাকে চিকিৎসা করেছে ছাউনির নাপিত, অন্য কোনো চিকিৎসক এখানে নেই। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সে আমার ওপর দিয়ে কোনো রকম পরখ চালাবার চেষ্টা করেনি। তারুণ্য আর স্বাভাবিক নিরাময় ক্ষমতা আমাকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে সাহায্য করেছে। ক্যাপ্টেনের বাড়ির সবাই দেখাশোনা করেছে আমাকে। মারিয়া ইভানভনা প্রায় সর্বক্ষণ বসে থেকেছে আমার পাশটিতে। স্বাভাবিকভাবেই আবার প্রথম যেদিন সুযোগ পেলাম সেদিনই আগের বারের অসম্পূর্ণ প্রেম-নিবেদনের বাকিটুকু বলে নিতে চাইলাম আমি। এবার মারিয়া ইভানভনা অনেক বেশি ধৈর্য নিয়ে আমার কথা শুনল। আমার প্রতি ওর নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল সহজভাবে। আমাকে জানাল যে ওকে সুখী হতে দেখে ওর বাপ-মারও খুব আনন্দ হবে। তারপর বলল, 'কিন্তু তুমি ভালো করে ভেবে দেখো। এমনও হতে পারে তো যে তোমার বাবা-মা মত দেবেন না?'

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। আমার মা'য়ের মনটা খুবই নরম, এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বাবার মেজাজ ও মতামত যতদূর জানি তাতে তিনি যে আমার এই প্রেমের কাহিনী শুনে বিশেষ বিচলিত হবেন তা মনে হয় না। তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকেই তরুণ বয়সের খামখেয়ালি বলে মনে করবেন। এই সমস্ত কথা আমি মারিয়া ইভানভনার কাছে খোলাখুলি বললাম। তা সত্ত্বেও স্থির করলাম যে যতদূর সম্ভব কাকুতি-মিনতি করে বাবার কাছে একটা চিঠি লিখব এবং বাবার আশীর্বাদ চাইব। পরে চিঠিটা লিখে আমি মারিয়া ইভানভনাকে দেখালাম। চিঠিটা পড়ে ওর মনে হল যে চিঠির বক্তব্য জোরালো ও মর্মস্পর্শী হয়েছে এবং এই চিঠি পড়ার পরেও বাবার অমত
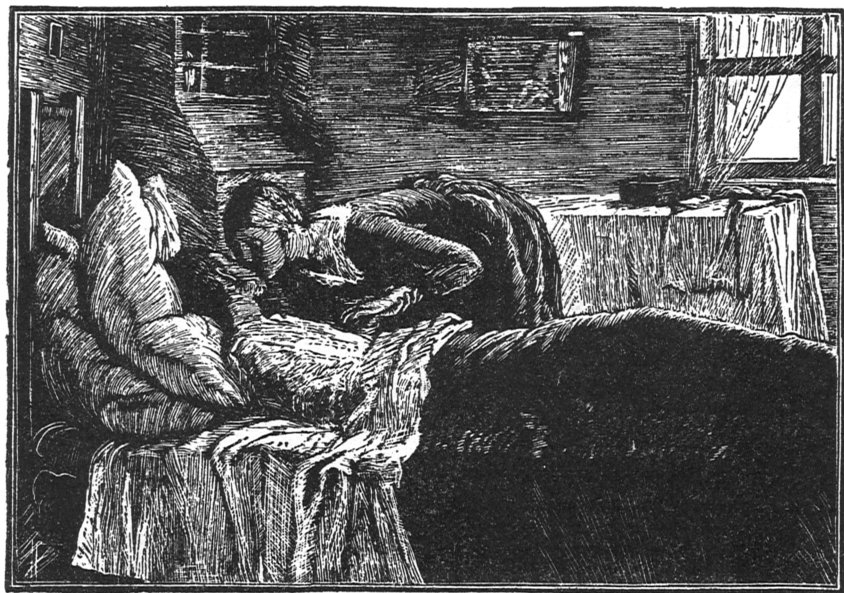
হবে একথা বিশ্বাস করতে ওর মন চাইল না। তারপর থেকে যৌবন ও প্রেমের সমস্ত নিষ্ঠা নিয়ে নিজেকে ও একেবারে সঁপে দিল নিজের কোমল হৃদয়বৃত্তির কাছে।

সেরে উঠবার পর কিছুমাত্র বিলম্ব না করে আমি শ্‌ভাব্রিনের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেললাম। ডুয়েল লড়ার জন্যে আমাকে ভর্ৎসনা করে ইভান কুজমিচ বলেছিলেন, 'পিওতর আন্দ্রেইচ, তোমাকে গ্রেপ্তার করলেই ঠিক কাজ করা হত। তবে এমনিতেই তোমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। অবশ্য আলেক্সেই ইভানভিচকে রুটির গুদামে আটক রাখা হয়েছে। এবার সে নিজের অপরাধের কথা চিন্তা করে অনুতাপ করুক। তার তলোয়ার কেড়ে নিয়ে সিন্দুকে তালাচাবি বন্ধ করেছে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা।' সুখের অনুভূতিতে আমার মন তখন এত বেশি ভরে ছিল যে সেখানে কারও অনিষ্ট কামনার স্থান ছিল না। শ্‌ভাব্রিনের পক্ষ নিয়ে আমি বলতে শুরু করলাম। শুনে সেই দয়ার্দ্র-প্রাণ অধিনায়ক নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে শ্‌ভাব্রিনকে মুক্তি দিলেন। শ্‌ভাব্রিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে গেছে সেজন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে স্বীকার করল যে সবই তার দোষ এবং আমাকে অনুরোধ জানাল আমি যেন এসব ঘটনা মনে না রাখি। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখাটা আমার স্বভাব নয়। সুতরাং আমিও আন্তরিকভাবেই তাকে ক্ষমা করলাম। সে আমার প্রতি যে অন্যায় করেছে এবং সে যে-ভাবে আমাকে আহত করেছে — দুই অপরাধের জন্যেই ক্ষমা করলাম তাকে। ধরে নিলাম যে তার কুৎসারটনার পেছনে ছিল তার আহত অভিমান ও প্রত্যাখ্যাত প্রেম এবং খুব একটা দরাজ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে আমার এই হতভাগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করলাম।

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে সেরে উঠে ফিরে এসেছি নিজের কোয়ার্টারে। অধৈর্য হয়ে প্রতীক্ষা করছি চিঠির জবাবের জন্যে। আশা করবার মতো মনের জোর নেই, তাই মনের দুশ্চিন্তাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করি। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা বা তাঁর স্বামীর কাছে আমি এখনো নিজের মনোভাব প্রকাশ করিনি। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি যে আমার প্রস্তাব শুনে তাঁরা খুব একটা অবাক হবেন না। মারিয়া ইভানভনা বা আমি — কেউ-ই তাঁদের কাছ

থেকে আমাদের অনুরাগ গোপন করে চলবার চেষ্টা করিনি এবং তাঁদের মত যে পাওয়া যাবে সে-বিষয়ে আমরা দুজনেই নিশ্চিন্ত।

অবশেষে একদিন সকালে হাতে একটা চিঠি নিয়ে সাভেলিচ এসে হাজির। ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে নিলাম তার হাত থেকে। খামের ওপরে বাবার হাতে ঠিকানা লেখা। লক্ষণটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল। সচরাচর মা'ই চিঠি লেখেন আমার কাছে আর সেই চিঠির শেষে বাবা দু-এক লাইন যোগ করে দেন। কিছুক্ষণ কাটল খামের মোহর ভেঙে চিঠিটা বার করবার মতো মনের অবস্থা আয়ত্ত করতে; ততোক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ঠিকানার গুরুগম্ভীর অক্ষরগুলোর দিকে। লেখা আছে: 'আমার পুত্র, পিওতর আন্দ্রেইচ গ্রিনেভকে, ওরেনবুর্গ প্রদেশ, বেলোগর্স্ক কেল্লা।' হাতের লেখা দেখে অনুমান করতে চেষ্টা করলাম, মনের কী অবস্থায় এই চিঠি লেখা হয়েছে। শেষকালে খামের মোহর ভেঙে বার করলাম চিঠিটা এবং প্রথম দু-একটা লাইন পড়েই পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল যে আমাদের ব্যাপারটার এইখানেই ইতি। চিঠিতে যা লেখা ছিল তা হচ্ছে এই:

'পিওতর! মিরোনভের কন্যা মারিয়া ইভানভনার সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়া তুমি যে পত্র লিখিয়াছ তাহা গত ১৫ তারিখে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রে তুমি তোমার এই বিবাহে পিতামাতার সম্মতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছ। তোমাকে জানাইতেছি যে তোমার এই বিবাহে সম্মতি বা আশীর্বাদ দিবার কোনো ইচ্ছাই আমার নাই। কেবল তাহাই নহে, অফিসার-পদে তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার এই শিশুসুলভ চপলমতির জন্যে তোমার শাস্তিবিধান করাও কর্তব্য মনে করিতেছি। তোমার আচরণের দ্বারাই তুমি প্রমাণ করিয়াছ, যে-তরবারি তোমাকে অর্পণ করা হইয়াছে আপন দেশকে রক্ষা করিবার জন্যে, তোমার মতো আরও সব অর্বাচীনের সঙ্গে ডুয়েল লড়িবার জন্যে নহে, তাহা ধারণ করিবার যোগ্যতা তোমার নাই। আন্দ্রেই কার্লোভিচের কাছে আমি অবিলম্বে পত্র লিখিতেছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিব, তোমাকে যেন বেলোগর্স্ক কেল্লা হইতে আরও দূরের এমন কোনো স্থানে পাঠানো হয় যেখানে

গেলে এই সকল আজগুবি চিন্তা তুমি ভুলিতে পারিবে। তোমার ডুয়েল লড়ার কথা এবং আহত হওয়ার কথা শোনা অবধি তোমার মা শোকে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন এবং আজ তিনি শয্যাশায়ী। তোমার উপর আর কী আশা-ভরসা করিব? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার সুমতি হয়, যদিও ঈশ্বরের এত মহান ক্ষমা আশা করিতে পারি এমন সাহস আমার নাই।

তোমার পিতা আ. গ.'

এই চিঠি আদ্যোপান্ত পড়ে আমার মনে বিচিত্র অনুভূতির উদ্ভব হল। আমার বাবা আমার ওপরে নির্বিচারে যে-সব কঠোর বাক্য বর্ষণ করেছেন তা আমার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এবং মারিয়া ইভানভনার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি যে অশ্রদ্ধার ভাব দেখিয়েছেন তা আমার কাছে মনে হয়েছে যেমন অভদ্র তেমন অন্যায়। বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে আমাকে অন্যত্র পাঠানো হতে পারে, এই চিন্তায় আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার সবচেয়ে কষ্ট হল মা'র অসুস্থতার খবর শুনে। সাভেলিচের ওপরে আমি বিরক্ত হলাম কারণ আমার বাবা-মা যে ওর কাছ থেকেই আমার ডুয়েল লড়ার খবর পেয়েছেন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। ছোট্ট ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ ওর সামনে এসে থামলাম এবং হিংস্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম, 'এবার হয়েছে তো? সেদিন যে আমি আহত হয়েছিলাম সে তোমার জন্যেই, ফলে একমাস আমাকে যমের দুয়ারে পড়ে থাকতে হয়েছিল — তাতেও তুমি খুশি নও? আমার মাকেও শুদ্ধ মেরে ফেলবার যোগাড় করেছ?' সাভেলিচ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, 'দাদাবাবু, তুমি এসব কী বলছ আমাকে? তুমি যে সেদিন চোট পেয়েছিলে তা কি আমারই জন্যে? ভগবান জানেন আমি সেদিন ছুটে যাচ্ছিলাম নিজের শরীর দিয়ে তোমাকে আড়াল করতে, যাতে আলেক্সেই ইভানিচের তলোয়ার তোমাকে ছুঁতে না পারে। কিন্তু বুড়ো শরীর বইতে পারল না বলেই সেদিন ঠেকাতে পারিনি। তোমার মা'র কাছে আমি কী দোষ করেছি?' আমি বললাম, 'কী দোষ করেছ? কে তোমাকে বলেছিল আমার সব খবর চিঠি লিখে জানাতে? তোমাকে কি আমার

ওপরে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে?' — 'আমি? আমি তোমার খবর চিঠিতে লিখেছি?' কাঁদতে কাঁদতে সাভেলিচ বলে উঠল, 'হা ভগবান! দাদাবাবু, এই দেখ কর্তা আমাকে চিঠি দিয়েছেন। আমি তোমার খবর পাঠিয়েছি কিনা, তা এই চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবে।' এই কথা বলে সে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করল। আমি পড়লাম। চিঠিতে লেখা আছে:

'শোন্ রে বুড়ো কুকুর, তোর উপর কড়া হুকুম ছিল যে আমার ছেলে পিওতরের সমস্ত খবর আমাকে দিতে হইবে। তাহা অমান্য করিতে তোর লজ্জা হয় না? আমার ছেলের অর্বাচীনতার খবর আমাকে কিনা শুনিতে হয় বাহিরের লোকের কাছে! এই কি প্রভুর ইচ্ছা পূরণ ও কর্তব্য পালন করিবার ধরণ? শোন্ রে বুড়ো কুকুর, সত্য কথা তুই গোপন করিয়াছিস্, অপ্রাপ্তবয়স্ককে প্রশ্রয় দিয়াছিস্ — এজন্যে তোকে আমি শুয়োরের পাল চরাইবার কাজে লাগাইব। আমার হুকুম, এই পত্র পাওয়া মাত্র অবিলম্বে আমাকে জানাইবি পিওতর কেমন আছে; শুনিয়াছি তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। আর আমাকে জানাইবি, শরীরের কোন্ স্থানে সে আঘাত পাইয়াছে এবং ঠিকমতো সেবাযত্ন হইতেছে কিনা।'

স্পষ্টই বোঝা গেল যে সাভেলিচের কোনো দোষ নেই। ওকে সন্দেহ করে এবং তিরস্কার করে অপমান করাটা ঠিক হয়নি। আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইলাম কিন্তু বুড়ো তবুও শান্ত হয় না। বারবার সে বলতে লাগল, 'পোড়া কপাল আমার! যে মনিবদের জন্যে এত করি তারা কিনা শেষকালে এই পুরস্কার দেয়! আমি বুড়ো কুকুর, আমাকে যেতে হবে শুয়োরের পালের সঙ্গে, আমার দোষেই তোমার শরীরে চোট লেগেছে! দাদাবাবু, তুমি আমার ছোট মনিব, তোমাকে বলি যে সমস্ত দোষ হচ্ছে সেই হতভাগা মুসিয়ে, ওই লোকটাই তো তোমাকে শিখিয়েছে লোহার শিক দিয়ে খোঁচা দিতে আর মাটির ওপরে পা ঠুকতে! যেন খোঁচা দিলে আর পা ঠুকলেই বদ্ লোকের হাত থেকে বাঁচা যায়! অত টাকা পয়সা খরচ করে মুসিয়েকে না আনলেই যেন চলত না!'

আমার চালচলন সম্পর্কে সমস্ত খবর আমার বাবার কাছে পাঠাল কে? কার এত মাথাব্যথা? জেনারেল কি? কিন্তু তাঁকে দেখে মনেই হয়নি যে আমার সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ আছে। আর সেই ডুয়েলের সংবাদ ওপরওলাদের কাছে পাঠাননি ইভান কুজমিচ, পাঠাবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেননি তিনি। তা হলে কে হতে পারে? ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলাম না। শেষকালে আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল শ্ভাব্রিনের ওপর। এ ব্যাপারে একমাত্র তারই কিছুটা স্বার্থ আছে। এমন কোনো খবর যদি সে পাঠাতে পারে, যার ফলে এই কেল্লা থেকে আমাকে সরে যেতে হয় এবং অধিনায়কের পরিবারের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয় — তাহলে তারই লাভ। সমস্ত ঘটনা খুলে বলবার জন্যে মারিয়া ইভানভনার কাছে আমি গেলাম। ওর সঙ্গে আমার দেখা হল বাড়ির অলিন্দে। আমার মুখের দিকে তাকিয়েই ও চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে তোমার? এমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছ?' — 'সব শেষ!' বলে আমি আমার বাবার চিঠিটা দিলাম ওর হাতে। এবার ফ্যাকাশে হবার পালা ওর। চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ফিরিয়ে দিল আমাকে এবং কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'বোঝা যাচ্ছে আমার কপালে নেই ...। তোমার বাবা-মা চান না যে আমি তোমাদের পরিবারের লোক হই। ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে! কিসে আমাদের মঙ্গল হবে তা আমাদের চেয়ে তিনিই ভালো জানেন। আমাদের আর কতটুকু ক্ষমতা বলো! শুধু তুমি যদি সুখী হতে পার...।' ওর হাত চেপে ধরে আমি বলে উঠলাম, 'তা হবার নয়! যদি তোমার ভালোবাসা পাই তাহলে আমি যে-কোনো অবস্থার জন্যে তৈরি! এসো, আমরা দুজনে গিয়ে তোমার বাবা-মার পা জড়িয়ে ধরি। তাঁরা দুজনেই সাদাসিধে মানুষ, দেমাকে এখনো তাঁদের মন পাথর হয়ে ওঠেনি...। তাঁদের আশীর্বাদ আমরা নিশ্চয়ই পাব। তাহলেই আমাদের বিয়ে হবে... আর তারপর কিছুদিন কাটলেই আমার বাবার রাগ পড়ে যাবে, আর আমার মা আছেন আমাদের পক্ষে, কাজেই বাবাকে আমরা নিশ্চয়ই শান্ত করতে পারব, বাবা আমাকে ক্ষমা করবেন...।' মাশা জবাব দিল, 'না, পিওতর আন্দ্রেইচ, তা হয় না। তোমার বাবা-মার আশীর্বাদ না পেলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া তুমি কক্ষণো সুখী হতে পারবে না।

ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছেই মাথা নোয়াতে হবে আমাদের। অন্য একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, অন্য একজনকে তুমি ভালবাসবে, এই যদি তোমার অদৃষ্ট হয়, তাহলে তাই হোক, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমাদের দুজনের জন্যেই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।' এই পর্যন্ত বলে ও আর কান্না সামলাতে পারল না, তাড়াতাড়ি চলে গেল। একবার আমার ইচ্ছে হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ওকে ধরি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, আমার নিজেরও এমন অবস্থা নয় যে আমার আবেগকে চেপে রাখতে পারি। তখন আমি বাড়ি চলে এলাম।

গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে আমি ঘরের মধ্যে বসে ছিলাম, এমন সময় সাভেলিচ এসে আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে দিল। লেখায় ভর্তি একটা কাগজের টুকরো আমার হাতে দিয়ে বলল সে, 'দেখে নাও দাদাবাবু! দেখে নাও আমি কি লিখেছি! মনিবের কানে লাগিয়ে বাপ আর ছেলেতে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিতে চাই কিনা দেখে নাও! কাগজটা নিলাম তার হাত থেকে। সাভেলিচ যে চিঠি পেয়েছে এটা হচ্ছে তার জবাব। চিঠিটা আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি:

'করুণাময় মনিব মাননীয় আন্দ্রেই পেত্রোভিচ বরাবরেষু!

আপনার পত্র পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আমি আপনার নোকর মাত্র। আপনি বলিয়াছেন, মনিবের হুকুম আমি অমান্য করিয়াছি, সেই কারণে আমি যেন মুখ না দেখাই। এই কথা বলিয়া আপনি আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আমি বুড়ো কুকুর নহি, আমি আপনার একান্ত অনুগত সেবক। মনিবের হুকুম চিরকাল আমি মানিয়া চলি। চিরকাল বিশ্বস্তভাবে আপনারই সেবা করিয়াছি। আপনার সেবাতেই আমার মাথার চুল পাকিয়ে গিয়াছে। পিওতর আন্দ্রেইচের আহত হইবার কথা আপনাকে লিখি নাই কারণ আমার ভয় ছিল যে সেই সংবাদ শুনিয়া আপনি অহেতুক আতঙ্কিত হইবেন। এক্ষণে শুনিলাম যে আমাদের গিন্নী-ঠাকুরাণী দুশ্চিন্তায় শয্যাশায়ী হইয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নিরাময় হইয়া উঠুন। দাদাবাবু বুকে চোট পাইয়াছেন। ক্ষতস্থানটি ডান কাঁধের নিচে হাড়ের ঠিক তলায়। তিন ইঞ্চি গভীর ক্ষত হইয়াছিল। নদীর

পাড় হইতে আমরা তাঁহাকে অধিনায়কের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিলাম। সেখানেই তিনি ছিলেন। চিকিৎসা করিয়াছে স্তেপান পারামনভ পরামাণিক। এক্ষণে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে দাদাবাবু আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু বলিবার নাই। শুনিতে পাই উপরওলা অফিসাররা দাদাবাবুর কাজে সন্তুষ্ট। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা দাদাবাবুকে নিজের সন্তানের মতো যত্ন করেন। আর দাদাবাবু যে এই গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িয়া গেলেন তার জন্য ছেলে ছোকরাদের ভর্ৎসনা করিতে নাই। চার চারটি পা থাকা সত্ত্বেও ঘোড়া মাঝে মাঝে হোঁচট খায়। আপনি আমাকে শুয়োরের পাল তদারকের কাজে পাঠাইবেন বলিয়াছেন। হুজুরের যাহা অভিরুচি। শ্রীচরণে গোলামের কোটি কোটি প্রণাম। ইতি

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত দাস
আর্খিপ সাভেলিয়েভ।'

নিরীহ বৃদ্ধটির চিঠি পড়তে পড়তে আমি মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখতে পারিনি। আমার নিজের এমন অবস্থা যে আমার বাবার চিঠির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হল, আমার মা'র দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যে সাভেলিচের এই চিঠিই যথেষ্ট।

এই সময় থেকেই আমার অবস্থা বদলে গেছে। মারিয়া ইভানভনা আমার সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না এবং যথাসম্ভব আমাকে এড়িয়ে চলে। অধিনায়কের বাড়িতে আমার আর কোনো আকর্ষণ থাকে না। ক্রমে বাড়িতে একা একা সময় কাটাতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠি। প্রথম প্রথম ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা আমাকে এজন্যে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে বিচলিত করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ইভান কুজমিচের সঙ্গে আমার দেখা হয় শুধু কাজের সময়ে। শ্ভাব্রিনের সঙ্গে দেখা করি কদাচিৎ, তাও অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। কারণ আমার মনে হয়, ওর মনে আমার প্রতি যে একটা প্রচ্ছন্ন অপছন্দ আছে তা লুকনো থাকে না। ফলে আমার সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়। জীবন অসহ্য

হয়ে ওঠে আমার কাছে। একটা নিরানন্দ ভাবাবেশে তলিয়ে যাই আমি; আমার একাকীত্ব ও কর্মহীনতার ফলে এই অবস্থা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। নিঃসঙ্গ জীবনে আরো উদ্দীপিত হয় আমার প্রেম এবং আমার এই প্রেম কাছে ক্রমবর্ধমান ভার বলে মনে হতে থাকে। বই পড়ায় বা সাহিত্য রচনায় আমার সমস্ত আগ্রহ চলে যায়, মনের স্ফূর্তি হারিয়ে ফেলি। ভয় হতে থাকে আমি পাগল হয়ে যাব, নয়তো মদ খেতে শুরু করব। আর তারপরেই ঘটে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা; আমার সমস্ত জীবনের ওপর এই ঘটনার গুরুতর ছাপ পড়ে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ও শুভ নাড়া খেলাম জীবনে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুগাচেভের বিদ্রোহ

হে যুবক হে তরুণ কান পেতে শোন ভাই
আমরা বুড়োর দল যাহা বলে যেতে চাই। [৯]

গান

যে অদ্ভুত ঘটনাবলী আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তার বর্ণনা শুরু করবার আগে আমার একটা অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য আছে। তা হচ্ছে, ১৭৭৩ সালের শেষাশেষি ওরেনবুর্গ প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেওয়া।

এই বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ অঞ্চলটি কয়েকটি অর্ধ-সভ্য জাতির বাসভূমি; একেবারে সাম্প্রতিক কালে তারা রুশ জারের আনুগত্য স্বীকার করেছে। তারা অনবরত বিদ্রোহ করত, আইনসম্মত নাগরিক জীবনের সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারত না, অপরিণামদর্শী ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল তাদের। ফলে তাদের দমিয়ে রাখার জন্যে গভর্ণমেণ্টকে সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। এজন্যে সম্ভাব্য জায়গায় কেল্লা খাড়া করা হয়েছিল। আর এই সব কেল্লায় সৈন্যরা ছিল প্রধানত কসাক — যারা ইয়াইক নদীর ধারে বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছে। কিন্তু ইয়াইক কসাকেরা কোথায় নিজেরাই এই সব অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবে, তা না হয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তারা নিজেরাই হয়ে উঠেছিল বিপদের কারণ। ১৭৭২ সালে তাদের প্রধান ঘাঁটিতেই একটা অভ্যুত্থান হয়। সৈন্যদলকে ঠিকমতো কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসবার জন্যে লেফ্‌টেনাণ্ট-জেনারেল ট্রাউবেনবার্গ কতগুলি কড়াকড়ি নিয়মকানুনের প্রবর্তন করেছিলেন। এই ছিল অভ্যুত্থানের

কারণ। অভ্যুত্থানের ফলে ট্রাউবেনবার্গ নৃশংসভাবে নিহত হন এবং কসাকদের পরিচালনা-ব্যবস্থায় খুশিমতো কতগুলি পরিবর্তন সাধিত হয়। শেষকালে নিষ্ঠুরভাবে গুলি চালিয়ে এবং শাস্তি দিয়ে দমন করা হয় বিদ্রোহকে।

বেলোগর্স্ক কেল্লায় আমি এসে পৌঁছবার অল্প কিছুকাল আগে এইসব ঘটনা ঘটেছিল। এখন অবস্থা একেবারে শান্ত; অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হয়। ধূর্ত বিদ্রোহীদের তথাকথিত অনুশোচনাকে অত্যন্ত সহজেই আন্তরিক বলে বিশ্বাস করেছেন কর্তৃপক্ষ। আসলে কিন্তু বিদ্রোহীরা গোপন বিদ্বেষ পোষণ করছে এবং নতুন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার সুযোগ খুঁজছে।

আমার কাহিনী শুরু করা যাক্।

একদিন সন্ধ্যেবেলা (১৭৭৩ সালের অক্টোবর মাসের শুরুতে) আমি একা-একা ঘরের মধ্যে বসে আছি। কান পেতে শুনছি বাইরের শারদ বাতাসের আর্তনাদ আর জানলা দিয়ে চোখ মেলে দেখছি টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরি — এমন সময়ে কে যেন আমাকে খবর দিল যে অধিনায়ক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তক্ষুণি অধিনায়কের বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম যে শ্ভাব্রিন, ইভান ইগ্নাতিচ এবং কসাক সার্জেণ্টটিও সেখানে উপস্থিত। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা বা মারিয়া ইভানভনা — দুজনের একজনও ঘরে নেই। অন্যমনস্কভাবে অধিনায়ক আমাকে সম্ভাষণ জানালেন। তারপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসতে বললেন আমাদের সবাইকে। বসল না শুধু সার্জেণ্ট, দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে অধিনায়ক বললেন, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর বলবার জন্যে তোমাদের ডেকেছি। জেনারেল কী লিখেছেন শোন।' এই বলে তিনি চশমা পরে নিচের এই চিঠিটা পড়ে শোনালেন:

'বেলোগর্স্ক কেল্লার অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মিরোনভ সমীপেষু।

(গোপনীয়)

আপনাকে এতদ্বারা জানাইতেছি যে, দন কসাক ধর্ম-প্রতিবাদী ইয়েমেলিয়ান পুগাচেভ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে এবং নিজেকে ভূতপূর্ব সম্রাট

তৃতীয় পিওতরের নামে অভিহিত করিয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে। তাহার নেতৃত্বে একটি বিদ্রোহী দলের সমাবেশ ঘটিয়াছে, ইয়াইক অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সে অসন্তোষ উদ্দীপিত করিয়াছে, কয়েকটি কেল্লা ধূলিসাৎ করিয়াছে, সর্বত্র লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়াছে। অতএব ক্যাপ্টেন, আপনার প্রতি নির্দেশ এই, যদি আপনার অধীনস্থ কেল্লা আক্রান্ত হয় তবে উক্ত অপরাধী ও ভণ্ডকে প্রতিরোধ করিবার জন্যে বা সম্ভব হইলে একেবারে নির্মূল করিবার জন্যে অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।'

'যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন!' চশমাটা খুলে চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে অধিনায়ক কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন, 'বলা যতো সহজ করা ততো নয়! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দুর্বৃত্ত শক্তিশালী। আমাদের এখানে কসাকদের বাদ দিয়ে মাত্র একশো ত্রিশ জন লোক। কসাকদের বাদ দিচ্ছি কারণ এ-ব্যাপারে তাদের ওপর ভরসা করা চলে না। মাক্‌সিমিচ, তুমি কিছু মনে কোরো না, তোমাকে কিছু বলিনি।' (সার্জেণ্ট মুখ টিপে হাসল।) 'কিন্তু কথাটা কি জান? অবস্থার ওপরে আমাদের আর এখন কোনো হাত নেই। প্রত্যেককে কর্তব্য-পালনে দৃষ্টান্ত স্থানীয় হয়ে উঠতে হবে, ছাউনি-চৌকি আর রাত-পাহারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আক্রমণ হলে কেল্লার দরজা বন্ধ করে দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে সৈন্যদের। আর মাক্‌সিমিচ, তোমার কাজ হবে, কসাকদের ওপরে ভালোভাবে নজর রাখা। কামানটা ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। আর খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে ওটাকে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এ সমস্ত খবর যেন গোপন থাকে, কেল্লার একটি লোকও যেন আগে থেকে কিছু টের না পায়।'

এই সমস্ত নির্দেশ জারি করে ইভান কুজমিচ আমাদের বিদায় দিলেন। শ্‌ভাব্রিন ও আমি একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সদ্য-শোনা কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা দুজনে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পার?' সে জবাব দিল, 'ভগবান জানেন! দেখাই যাক কী হয়। এখনো পর্যন্ত ঘটনাটাকে ভয়ানক কিছু বলে

মনে হচ্ছে না। অবশ্য যদি...' কথাটা শেষ না করেই অন্যমনস্কভাবে একটা ফরাসী সুর শিস দিয়ে বাজাতে বাজাতে গভীর কোনো চিন্তায় ডুবে গেল সে।

আমাদের সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও পুগাচেভের আবির্ভাবের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা কেল্লায়। এদিকে স্ত্রীর প্রতি ইভান কুজমিচের যতোই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, সামরিক প্রয়োজনের খাতিরে যে গোপন সংবাদ তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে তা তিনি পৃথিবী রসাতলে গেলেও স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করার মতো লোক নন। জেনারেলের চিঠি পেয়ে তিনি কৌশলে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কৌশলটা এই: ভাসিলিসা ইয়েগোরভনাকে তিনি বলেন যে ফাদার গেরাসিম ওরেনবুর্গ থেকে কতকগুলো আশ্চর্য খবর পেয়েছেন এবং এই খবরগুলো তিনি কিছুতেই কাউকে বলছেন না। শুনেই তো ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা তক্ষুণি পাদ্রির বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে তৈরি। ইভান কুজমিচ পরামর্শ দেন যে মাশাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত, নইলে মেয়েটাকে একেবারে একা-একা বাড়িতে থাকতে হবে। দুজনে বেরিয়ে যেতেই ইভান কুজমিচ হয়ে ওঠেন বাড়ির সর্বময় কর্তা। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডেকে পাঠান। পালাশা যাতে আমাদের কোনো কথা শুনতে না পায় সেজন্যে ওকে আটকে রাখেন ছোট একটা কুঠরীর মধ্যে।

ওদিকে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা পাদ্রির বৌয়ের কাছ থেকে কোনো খবরই বার করতে পারেননি। বাড়িতে ফিরে এসে তিনি টের পেলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে ইভান কুজমিচ সমর-পরিষদের সভা ডেকেছিলেন এবং সমর-পরিষদের সভা চলবার সময়ে পালাশা তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। বুঝতে পারলেন যে স্বামী তাঁকে বোকা বানিয়েছেন, তখন খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন স্বামীকে। এ ধরণের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন ইভান কুজমিচ। কৌতূহলী জীবনসঙ্গিনীর প্রশ্নে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে টপাটপ জবাব দিতে লাগলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা কী হয়েছে জান গিন্নী, আমাদের এখানকার স্ত্রীলোকদের মাথায় হঠাৎ কি খেয়াল চেপেছে, তারা সবাই খড় দিয়ে উনুন ধরায়। হঠাৎ একটা বিপর্যয় কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। কাজেই আমি কড়া আদেশ জারি করেছি যেন

ভবিষ্যতে কেউ খড় দিয়ে উনুন না ধরায়। শুকনো ডালপালা বা ঝোপঝাড় ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা চলবে না।' অধিনায়ক-পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই যদি হয় তাহলে পালাশাকে আটকে রাখবার কী দরকার পড়েছিল? আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বেচারীকে কুঠরীর মধ্যে বন্ধ থাকতে হয়েছিল কেন?' ইভান কুজমিচ এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিড়বিড় করে তিনি কি যেন বললেন, কিন্তু তার কোন অর্থবোধ হল না। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা বুঝতে পারলেন যে তাঁর স্বামী আসল কথা চেপে রাখছেন। এও বুঝতে পারলেন যে স্বামীর কাছ থেকে আসল কথাটা কিছুতেই বার করা যাবে না। সুতরাং তিনি আর কোনো প্রশ্ন না করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। আকুলিনা পাম্‌ফিলভনা একেবারে আনকোরা একটা পদ্ধতিতে শসার আচার তৈরি করেছে, সেই কথা বলতে শুরু করলেন সবিস্তারে। কিন্তু সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন, কী এমন গুরুতর বিষয় থাকতে পারে যা তাঁর স্বামী জানেন অথচ কিছুতেই তাঁর কাছে প্রকাশ করবেন না! অনেক ভেবেও কোনো হদিস পেলেন না।

পরদিন সকালে গির্জা থেকে ফিরে আসবার পথে লক্ষ্য করলেন যে ইভান ইগ্‌নাতিচ কামানের নল থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া, নুড়ি, পাথর, হাড়ের টুকরো ইত্যাদি যত সব আবর্জনা ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করতে করতে নলের মধ্যে ঢুকিয়েছিল, সেগুলোকে নল থেকে বার করছে ইভান ইগ্‌নাতিচ। অধিনায়ক-পত্নী মনে মনে চিন্তা করলেন, 'ব্যাপারটা কি? এসব যুদ্ধের তোড়জোড় কেন আবার? কিরগিজরা দুর্গ আক্রমণ করতে পারে — তাই ভাবছে নাকি সবাই? কিন্তু এমন একটা তুচ্ছ খবর ইভান কুজমিচ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে তা কক্ষণো হতে পারে না!' খবরটা না জানা পর্যন্ত স্ত্রীসুলভ কৌতূহল তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। ইভান ইগ্‌নাতিচের কাছ থেকে খবরটা টেনে বার করতে হবে, মনে মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত করে তিনি ইভান ইগ্‌নাতিচের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

হাকিম যেমন আসামীকে অসতর্ক করে দেবার জন্যে জেরা শুরু করেন মূল খবরটার সঙ্গে সম্পর্কহীন দু-একটা প্রশ্ন তুলে, তেমনি ভাসিলিসা

ইয়েগোরভনা প্রথমে তুললেন ঘরসংসারের দু-একটা কথা। তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বললেন, 'হা, ভগবান! কী ভয়ানক খবর — এ্যাঁ! কী যে হবে?'

ইভান ইগ্নাতিচ জবাব দিল, 'গিন্নী-মা, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঈশ্বর করুণাময়। আমাদের সৈন্যসংখ্যা প্রচুর, গোলাবারুদ যথেষ্ট। আর এই দেখুন, কামানটাকে পরিষ্কার করে রেখেছি। মনে হচ্ছে পুগাচেভকে আমরা হটিয়ে দিতে পারব। প্রভুর দয়া হলে অক্ষতই থাকতে পারব আমরা।'

'তা এই পুগাচেভটি কে?' ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা জিজ্ঞেস করলেন।

গোপন কথাটা এইভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে দেখে ইভান ইগ্নাতিচ জিভ কামড়াল। কিন্তু তখন আর সামলে নেবার সময় নেই। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার চাপে বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল সমস্ত কথা। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি কারও কাছে কোনো কথা প্রকাশ করবেন না।

নিজের প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেছেন বলতে হবে। একজন ছাড়া কারও কাছেই তিনি একটিও কথা বলেননি। এবং সেই বিশেষ একজনটি হচ্ছেন পাদ্রির বৌ। তাও তিনি পাদ্রির বৌকেও কথাটা বলতেন না, কিন্তু পাদ্রির বৌয়ের গোরুটা মাঠে ছাড়া থাকে, কি জানি পাজির দল যদি সেই গোরুটাকে টেনে নিয়ে চলে যায়!

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, সবাই পুগাচেভের কথা বলাবলি করছে। চারদিকে নানা রকম গুজব। কসাক সার্জেণ্টটিকে অধিনায়ক পাঠিয়েছিলেন আশেপাশের গাঁয়ে ও কেল্লাগুলিতে। চারদিককার হালচাল সাধ্যমতো জেনে আসতে বলেছিলেন তাকে। দুদিনের মধ্যেই মাক্সিমিচ ফিরে এসে জানাল যে কেল্লা থেকে প্রায় ষাট ভার্স্ট দূরে স্তেপ প্রান্তরের মধ্যে সে শিবির-আগুন জ্বলতে দেখেছে আর বাশ্কিররা তাকে বলেছে যে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে মার্চ করে। অবশ্য সে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না, কারণ আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে সে সাহস পায়নি।

কেল্লার কসাকদের মধ্যে অস্বাভাবিক ধরণের উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে জটলা করে, কথা বলে চাপা

স্বরে আর ড্র্যাগন বা ছাউনি সৈন্য দেখলেই যে যেদিকে পারে সরে পড়ে। একদল গোয়েন্দা ছাড়া হয়েছে তাদের মধ্যে। য়ুলাই নামে একটি কালমিক খ্রীষ্টান হয়েছিল, সে অধিনায়ককে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দেয়। য়ুলাইয়ের খবর অনুসারে সার্জেণ্টের দেওয়া খবর একেবারে মিথ্যে; ফিরে এসে এই ধূর্ত কসাকটি নাকি নিজের সঙ্গীসাথীদের কাছে অন্য কথা বলেছে। সে নাকি বিদ্রোহীদের শিবিরে গিয়েছিল, এমন কি বিদ্রোহীনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্যও হয়েছিল তার; বিদ্রোহীনেতা নাকি নিজের হাত তাকে চুম্বন করতে দিয়েছে এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছে তার সঙ্গে। অধিনায়ক সঙ্গে সঙ্গে সার্জেণ্টকে আটক করলেন এবং য়ুলাইকে নিযুক্ত করলেন তার জায়গায়। কসাকদের কাছে খবরটা গিয়ে যখন পেঁছিল তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে তারা খুশি হয়নি। নিজেদের অসন্তোষকে তারা উচ্চস্বরে ঘোষণা করল। অধিনায়কের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ইভান ইগ্নাতিচ নিজের কানে শুনে এল যে তারা বলছে, 'ওরে ছাউনির ইঁদুর! এর পরের বার তোর পালা।' সেই দিনই বন্দীকে জেরা করবার ইচ্ছে ছিল অধিনায়কের। কিন্তু দেখা গেল সার্জেণ্ট পালিয়ে গেছে পাহারাঘর থেকে। ওর দলের লোকরাই যে ওকে পালাতে সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর একটি নতুন ঘটনা অধিনায়কের উৎকণ্ঠা আরো বাড়িয়ে তুলল। বিদ্রোহী ইস্তাহারসমেত ধরা পড়ল একজন বাশ্কির। অধিনায়ক স্থির করলেন যে কেল্লার অফিসারদের আবার তিনি ডেকে পাঠাবেন। তখন আবার চেষ্টা করলেন সুবিধামতো যা হোক একটা ফিকির তুলে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু ইভান কুজমিচ মানুষটি সত্যপরায়ণ, চলেন সোজা রাস্তায়, সুতরাং এবারেও তিনি অন্য কোনো উপায় ভেবে না পেয়ে আগের বার যে উপায়টি প্রয়োগ করেছিলেন তারই শরণ নিলেন।

'শুনছো গো, শহর থেকে খবর এসেছে ফাদার গেরাসিমের কাছে ...' গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন তিনি। তাঁকে বাধা দিয়ে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা বললেন, 'থাক, হয়েছে, আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না। দেখছি, তোমার ইচ্ছে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সমর-পরিষদের সভা ডাকা আর ইয়েমেলিয়ান

পুগাচেভ সম্বন্ধে আলোচনা করা। এবার আর অত সহজে আমাকে বোকা বানানো যাবে না।' চোখদুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে ইভান কুজমিচ বললেন, 'গিন্নী, দেখছি তুমি সবই জেনে ফেলেছ। তাহলে ইচ্ছে হলে এখানেই থাক। তোমার সামনেই আমরা আলাপ-আলোচনা করব।' ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা জবাব দিলেন, 'এই তো বাপু। ধোঁকা দেওয়া তোমার কম্ম নয়। যাও অফিসারদের ডেকে পাঠাও।'

আমরা আবার জড়ো হলাম। স্ত্রীর সামনেই ইভান কুজমিচ চেঁচিয়ে পড়লেন পুগাচেভের ইস্তাহার। স্পষ্টই বোঝা গেল ইস্তাহার একজন অর্ধশিক্ষিত কসাকের লেখা। ইস্তাহারে শয়তানটা তার এই অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে যে আমাদের এই কেল্লায় অবিলম্বে সে হানা দেবে, কসাকদের আর সৈন্যদের ডাক দিয়েছে তার দলে যোগ দিতে, অফিসারদের পরামর্শ দিয়েছে যে মৃত্যুর ভয় যদি থাকে তবে যেন তারা প্রতিরোধ না করে। আবেদনের ভাষা অমার্জিত বটে কিন্তু খুবই জোরালো এবং সাধারণ মানুষের মনের উপরে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে রচিত।

'বদমায়েশ!' অধিনায়ক-পত্নী মন্তব্য করলেন, 'ব্যাটার সাহস তো কম নয় যে আমাদের কাছে এসব কথা বলে পাঠায়! ভাবখানা এমন যেন আমরা এক্ষুণি গিয়ে তার পায়ে পড়ি নিশান লুটিয়ে। কুত্তার বাচ্চা! জানে না যে চল্লিশ বছর ধরে আমরা পল্টনে আছি। চোখের ওপরে দেখতেও হয়েছে অনেক কিছু। এমন কোনো অধিনায়ক নিশ্চয়ই নেই যে এই ডাকাতের কথা মেনে নেবে?'

ইভান কুজমিচ জবাব দিলেন, 'তা নেই বটে, তবে শোনা যাচ্ছে শয়তানটা নাকি অনেকগুলি কেল্লা দখল করে নিয়েছে।'

'তার মানে লোকটার সত্যিই ক্ষমতা আছে,' শ্ভাব্রিন মন্তব্য করল।

অধিনায়ক বললেন, 'তার ক্ষমতার বহর এখনই টের পাওয়া যাবে। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা, ভাঁড়ারের চাবিটা দাও তো আমার হাতে। ইভান ইগ্নাতিচ, সেই বাশ্কিরটাকে নিয়ে এস এখানে আর য়ুলাইকে বলো চাবুক নিয়ে আসতে।'

ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটু সবুর করো, ইভান

কুজমিচ। আগে আমি মাশাকে বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে যাই। নইলে ও হয়তো চেঁচামেচি শুনে ভয় পেয়ে যাবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও তোমাদের ওসব তদন্তের ব্যাপারকে বিশেষ পছন্দ করি না। তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।'

আগেকার দিনে আইনগত ব্যাপারে দৈহিক নিপীড়নের রেওয়াজ ছিল। সেই রেওয়াজ এত শক্ত শিকড় গেড়েছিল যে দৈহিক নিপীড়নকে লোপ করবার জন্যে সরকারের যে সদয় নির্দেশ জারি হয়, দীর্ঘকাল তার প্রয়োগ হয়নি। এমনি একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে অপরাধীকে অতি অবশ্যই নিজের মুখে দোষ স্বীকার করতে হবে, নইলে অপরাধ পুরোপুরি প্রমাণিত হয় না। এই ধারণা শুধু যে যুক্তিহীন তা নয়, যথার্থ আদালতী বিচার বিবেচনার পরিপন্থীও। কারণ অপরাধ অস্বীকার করাটা যদি আসামীর নির্দোষিতার প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত না হয়, তাহলে আসামীর অপরাধ স্বীকার করাটাও তাকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে যুক্তি হিসেবে আরো বেশি অচল। আজো পর্যন্ত মাঝে মাঝে পুরনো যুগের এমন সব বিচারকের সঙ্গে আমার দেখা হয় যাঁরা এই বর্বর প্রথাকে লোপ করা হয়েছে বলে দুঃখপ্রকাশ করেন। দৈহিক নিপীড়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা — এ প্রশ্ন সেকালে কিন্তু না বিচারক না আসামী, কারুর মনেই কোনো দিন ওঠেনি। সুতরাং অধিনায়কের আদেশ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউই কিছুমাত্র অবাক হল না বা অস্বস্তি বোধ করল না। বাশ্‌কিরটিকে ভাঁড়ারে আটকে রাখা হয়েছিল। ভাঁড়ারের চাবি ছিল অধিনায়ক-পত্নীর কাছে ইভান ইগ্‌নাতিচ গেল তা নিয়ে আসবার জন্যে। কয়েক মিনিট পরেই বন্দীকে হাজির করা হল বাড়ীর বাইরের ঘরে। অধিনায়ক তাকে ঘরের ভিতরে আনবার জন্যে হুকুম দিলেন।

বাশ্‌কিরটির পা বেড়ি দিয়ে বাঁধা। অতিকষ্টে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের ভিতরে এসে মাথার লম্বা টুপিটা খুলে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। তার দিকে তাকিয়ে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল যেন। লোকটিকে আমি জীবনে ভুলতে পারব না। বয়স সত্তরের একটু বেশিই হবে। নাকও নেই, কানও নেই। মাথাটা কামানো। চিবুকের এখানে ওখানে দু-এক গাছি পাকা চুল শুঁড় তুলে

আছে। খর্বকায়, রোগা এবং কুঁজো। কিন্তু সরু দুচোখের কোটর থেকে যেন আগুনের ঝলক বেরিয়ে আসছে। এই ভয়ংকর লক্ষণগুলি দেখে অধিনায়ক চিনতে পারলেন যে, ১৭৪১ সালে [১০] এই লোকটিই দাঙ্গা হাঙ্গামার অপরাধে শাস্তি পেয়েছিল। বললেন, 'আচ্ছা! পুরনো ঘাগী দেখছি! আগেও একবার আমাদের জালে আটকা পড়েছিলি! একেবারে সাফ করে নাক কান কাটা যে, বোঝা যায় বিদ্রোহ করাটা এই তোর প্রথম নয়। কাছে আয় তো দেখি, বল, কে তোকে এখানে পাঠিয়েছে?'

বুড়ো বাশ্কির বেচারা হাঁ করে অধিনায়কের দিকে তাকিয়ে রইল, একটি কথাও বলল না। 'কথা বলছ না যে,' ইভান কুজমিচ বলে চললেন, 'তুমি কি রুশ ভাষা বোঝ না? য়ুলাই, ওকে ওর নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করো তো দেখি কে ওকে আমাদের কেল্লায় পাঠিয়েছে?'

অধিনায়কের এই প্রশ্ন য়ুলাই তাতার ভাষায় শোনাল ওকে কিন্তু ওর মুখচোখের ভাবে কোন পরিবর্তন এল না, তেমনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অধিনায়ক বললেন, 'ইয়াক্‌শি!* এক্ষুণি তোর মুখ থেকে কথা বার করিয়ে ছাড়ছি! ওর ওই কিম্ভূত ডোরাকাটা জামাটা খুলে নাও, তারপর লাগাও পিঠে চাবুক! য়ুলাই, আচ্ছা করে কষে কয়েক ঘা লাগাও তো দেখি!'

দুজন বিকলাঙ্গ সৈনিক বাশ্কিরের গায়ের জামা খুলতে লাগল। হতভাগ্য লোকটির মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। চারদিকে তাকাচ্ছে সে — ছেলেমেয়েদের হাতে ধরা পড়ে কোনো ক্ষুদে প্রাণীর যেমন অবস্থা হয় তেমনিভাবে। তারপর একজন সৈনিক যখন বন্দীর হাতদুটো তার নিজের কাঁধের ওপরে রেখে তাকে পিঠের ওপরে তুলে ধরে আর চাবুকটা নিয়ে শপাং শপাং শব্দ করল য়ুলাই, তখন বাশ্কিরের মুখ থেকে একটা চাপা কাতর গোঙানি বেরিয়ে আসে। মাথাটা নিচু করেছে সে, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে; আর দেখা গেল তার মুখের ভিতরে জিভ নেই — জিভের জায়গায় নড়নড় করছে কাটা গুঁড়ির মতো খানিকটা অংশ।

---

* [তাতার ভাষায়] আচ্ছা বেশ।

যখন ভাবতে বসি যে আমার জীবনকালেই এসব ঘটনা আমি দেখেছি, আবার সম্রাট আলেক্সান্দারের সদয় শাসনও আমার জীবনকালেরই ঘটনা, তখন অবাক না হয়ে পারি না। শিক্ষার অগ্রগতি, মানবিক ভাবাবেগের প্রসার কত দ্রুতই না হয়েছে! হে তরুণ যুবক! যদি কোনো দিন আমার লেখা এই লাইনগুলির উপরে তোমার চোখ পড়ে যায় তাহলে এই কথা মনে রেখো যে সবচেয়ে খাঁটি ও সবচেয়ে স্থায়ী পরিবর্তন হচ্ছে তাই, যা আসে মানুষের নীতিবোধের উন্নতি থেকে এবং যেজন্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হয় না। [১১]

লোকটির জিভ নেই দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অধিনায়ক বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, ওর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। য়ুলাই, ওকে আবার ভাঁড়ারে রেখে এস। আচ্ছা এবার তাহলে অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক্।'

আমাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা। হাঁপাচ্ছেন তিনি, মুখে চোখে প্রচণ্ড উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

অধিনায়ক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন, 'ব্যাপার কি, কী হয়েছে তোমার?'

ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা জবাব দিলেন, 'খুবই খারাপ খবর! আজ সকালে নাবাল-হ্রদ কেল্লা দখল হয়ে গেছে। ফাদার গেরাসিমের চাকর এইমাত্র আসছে ওখান থেকে। ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে ও। কেল্লার অধিনায়ককে এবং সমস্ত অফিসারকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সৈন্যরা সবাই বন্দী। আমার তো মনে হয়, অবস্থাটা একটু বুঝে দেখবার সময়ও আমরা পাব না, তার আগেই শয়তানটা এখানে এসে হাজির হবে।'

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে আমি অবাক হলাম এবং প্রচণ্ড ঘা খেলাম। নাবাল-হ্রদ কেল্লার অধিনায়কের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। শান্ত ও বিনয়ী মানুষটি, বয়সে তরুণ, মাস দুয়েক আগে নববধূর সঙ্গে ওরেনবুর্গ থেকে ফিরবার পথে উঠেছিলেন ইভান কুজমিচের বাড়িতে। আমাদের কেল্লা থেকে নাবাল-হ্রদ কেল্লার দূরত্ব পঁচিশ ভার্স্টের বেশি নয়। কাজেই পুগাচেভের বাহিনী যে কোনো

সময়ে আমাদের আক্রমণ করে বসতে পারে। মারিয়া ইভানভনার কপালে কি আছে ভাবতেই আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল।

অধিনায়ককে আমি বললাম, 'ইভান কুজমিচ, আমাদের জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই কেল্লাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য — একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভাবা দরকার। যদি ওরেনবুর্গের রাস্তা নির্বিঘ্ন থাকে তাহলে আপনি মেয়েদের ওরেনবুর্গে পাঠিয়ে দিন। নইলে আরো দূরের এমন কোনো কেল্লায় পাঠিয়ে দিন, যা বেশি নিরাপদ এবং শয়তানদের নাগালের বাইরে।'

ইভান কুজমিচ স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় একটা কথা বলছি শোন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যতদিন না বোঝাপড়া করতে পারছি ততদিন তোমাদের বরং অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া যাক। তাই ভালো হবে, না কী বলো?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'মোটেও ভালো হবে না! এমন কেল্লা কোথায় আছে যা নাকি বুলেটের নাগালের বাইরে? বেলোগর্স্ক নিরাপদ নয় কেন? ভগবানের দয়ায় বাইশটা বছর আমরা কাটিয়েছি এখানে। বাশ্কির, কিরগিজ, অনেককেই তো দেখলাম! এতদিন যখন আছি, তখন এই পুগাচেভকেও কাটিয়ে উঠতে পারব, এইটুকু আশা করা যেতে পারে!'

'বেশ, তবে তাই হোক!' ইভান কুজমিচ এবারে বললেন, 'যদি তোমার বিশ্বাস থাকে যে আমাদের এই কেল্লাতেই তুমি নিরাপদ, তাহলে এখানেই থেকে যাও। কিন্তু মাশাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো? যদি আমরা আক্রমণ ঠেকাতে পারি বা কোনো রকমে পরিত্রাণ পেয়ে যাই, তাহলে তো ভালোই — কিন্তু যদি আমাদের এই কেল্লা দখল হয়ে যায়?'

'তাহলে... তাহলে...' ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার মুখে কথা আটকে যেতে লাগল, প্রচন্ড একটা উত্তেজনার ভাব নিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি।

'না, তা হয় না।' অধিনায়ক বলে চললেন; জীবনে বোধ হয় এই প্রথম স্ত্রীর ওপরে তাঁর নিজের কথাটাই বজায় থাকছে তা বুঝতে পারলেন তিনি,

'মাশার এখানে কিছুতেই থাকা চলে না। আমরা ওকে ওরেনবুর্গে ওর ধর্ম-মা'র কাছে পাঠিয়ে দেব। ওখানে প্রচুর সৈন্য ও কামান আছে, দেওয়ালগুলো পাথরের। আর তুমিও ওর সঙ্গে চলে গেলেই ভালো হয়। আমাদের এই কেল্লা যদি দখল হয়ে যায় তাহলে তুমি, বুড়ো মানুষ, তোমার কপালে কী আছে কে জানে?'

ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা বললেন, 'বেশ, তাই হোক। মাশাকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে দেব। কিন্তু স্বপ্নেও ভেব না যে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। এই বুড়ো বয়সে তোমাকে ছেড়ে কোন্ এক বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে একা-একা মরব তা কিছুতেই হতে দেব না। আমরা এতদিন একসঙ্গে থেকেছি, একসঙ্গেই মরব।'

অধিনায়ক বললেন, 'বেশ, এই কথাই থাক। তাহলে আর দেরি করে লাভ কি। মাশা যাতে যাত্রা শুরু করতে পারে তার বন্দোবস্ত করো গিয়ে। কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব ওকে। আর যদিও এখানে লোকজনের খুব অভাব তবুও একদল রক্ষী দেব ওর সঙ্গে। কিন্তু মাশা কোথায়?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'আকুলিনা পাম্‌ফিলভনার কাছে। নাবাল-হ্রদ দখল হবার খবর শুনেই ওর বুকের ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে। একটা অসুখ-বিসুখ না করলে হয়। হে প্রভু, হে ঈশ্বর! এ কী দশা করলে আমাদের!'

মেয়ের যাত্রার আয়োজন করবার জন্যে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা উঠে গেলেন। তার পরেও অধিনায়কের ঘরে আলোচনা চলেছে, কিন্তু আমি আর সে আলোচনায় যোগ দিইনি বা কে কী কথা বলছে তাও শুনিনি। রাত্রিবেলা খাবার সময় মারিয়া ইভানভনাকে দেখা গেল। মুখটা ফ্যাকাশে, চোখ লাল। নিঃশব্দে আমরা খাওয়া শেষ করলাম এবং স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে উঠে পড়লাম খাওয়া শেষ করে। তারপর পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হলাম যে যার কোয়ার্টারের দিকে। ইচ্ছে করে আমার তলোয়ারটা ফেলে এসেছিলাম আমি; সেটা আনবার জন্যে ফিরে গেলাম। কেন জানি না মনে হয়েছিল, এবার ফিরে গিয়ে মারিয়া ইভানভনাকে একা পাব। সত্যি সত্যিই দরজার কাছে ও দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের জল ফেলতে আমার হাতে তলোয়ারটা

দিয়ে ও বলল, 'বিদায়, পিওতর আন্দ্রেইচ! আমাকে ওরেনবুর্গ যেতে হবে। তুমি বেঁচে থেকো আর সুখে থেকো! প্রভুর দয়া হলে আমরা আবার হয়তো একসঙ্গে মিলতে পারি। তা যদি না হয়...।' এই পর্যন্ত বলে ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি ওকে দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'বিদায়, আমার চোখের মণি, আমার বুকের ধন, বিদায়! আমার যাই হোক না কেন, জেনে রেখ যে মরবার সময় তোমার কথাই ভাবব আমি, তোমার জন্যেই প্রার্থনা করব।' আমার বুকের ওপরে মাথা রেখে মাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি ওকে আবেগভরে চুমু খেলাম, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সপ্তম অধ্যায়

আক্রমণ

আমার এই মাথা, ওগো সেপাইয়ের মাথা,
তিন আর তিরিশটি বছর যে করেছে সেবা!
তবু হায়, এ যে মোর সেপাইয়ের মাথা
না শুনেছে ভাল-মন্দ দুটো মিষ্টি কথা,
না পেয়েছে সোনাদানা,
না জুটেছে কড়িকাণা,
সেপাইয়ের বরাতে ভাই বড়ো হওয়া মানা।

আমার মাথাটি ওগো সেপাইয়ের মাথা।
নেহাতই কপাল ফাটা
রইল না ধড়ে মাথা —
ফাঁসির তক্তে উঠে
রেশমের দড়ি এঁটে
সে মাথা ঝুলায়ে দিনু আড়কাঠে। [১২]

লোকসঙ্গীত

সেদিন রাত্রে আমি ঘুমোইনি বা পোশাক ছাড়িনি। আমার ইচ্ছে ছিল, খুব ভোরে উঠে কেল্লার ফটকের কাছে দাঁড়াব এবং মারিয়া ইভানভনা যখন যাবে তখন শেষ বারের মতো বিদায় জানাব ওকে। আমি বুঝতে পারছি যে আমার মধ্যে মস্ত একটা পরিবর্তন ঘটছে। এতদিন পর্যন্ত একটা বিমর্ষভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, এখন আমার মনের ভয়ানক একটা উত্তেজিত অবস্থা — কিন্তু আমি দেখছি যে আগেকার অবস্থার চেয়ে এখনকার অবস্থা অনেক সহজে সহ্য করা যায়। বিচ্ছেদের যন্ত্রণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা আশা, অস্পষ্ট হোক, কিন্তু খুবই মধুর। আর থাকে বিপদ সম্পর্কে একটা অস্থির প্রত্যাশা ও এক মহৎ উচ্চাশার আবেগ। অলক্ষ্যে রাত্রি পার হল। বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল একজন কর্পোরাল। শোনা গেল যে কসাকরা রাত্রিবেলা কেল্লা ছেড়ে চলে গেছে, য়ুলাইকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে সঙ্গে, আর কেল্লার আশেপাশে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে অপরিচিত সব লোক। সময় থাকতে মারিয়া ইভানভনা আর কেল্লা ছেড়ে যেতে পারবে না, ভাবতেই আতঙ্ক হল আমার। কর্পোরালকে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে আমি ছুটলাম অধিনায়কের বাড়িতে।

দিনের আলো ফুটে উঠছে। রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছি এমন সময়ে কে যেন আমার নাম ধরে ডেকে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার পিছনে এসে দাঁড়াল ইভান ইগনাতিচ, বলল, 'কোথায় চলেছেন? ইভান কুজমিচ র‍্যাম্পার্টে আছেন, তিনি ডাকতে পাঠিয়েছেন আপনাকে। পুগাচেভ এসে গেছে।' দুরুদুরু বুক আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মারিয়া ইভানভনা চলে গেছেন কি?' ইভান ইগনাতিচ জবাব দিল, 'না, তিনি যেতে পারেননি। বড়ো বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা। ওরেনবুর্গের সঙ্গে এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই, আমাদের কেল্লা ঘেরাও হয়ে গেছে চারদিক থেকে পিওতর আন্দ্রেইচ, অবস্থা খুবই খারাপ!'

আমরা র‍্যাম্পার্টে গেলাম। র‍্যাম্পার্ট বলতে প্রাকৃতিক কারণে উচ্চতাপ্রাপ্ত খানিকটা জমি, চারদিকে খুঁটির বেড়াজাল। কেল্লার সমস্ত অধিবাসী ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে সেখানে। রাইফেল ধরে সার দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে সৈন্যদের। কামানটাকে টেনে সেখানে আনা হয়েছে আগের দিন। অধিনায়ক নিজের ক্ষুদ্র বাহিনীর সারির মধ্যে অনবরত সামনে পিছনে ছুটোছুটি করছেন। বিপদের আসন্নতা যেন এক অসাধারণ সজীবতায় উদ্দীপিত করে তুলেছে এই প্রবীণ যোদ্ধাকে। কেল্লা থেকে অনতিদূরে স্তেপের ওপরে দেখা যাচ্ছে জনকুড়ি অশ্বারোহীর মূর্তি। দেখে মনে হয় কসাক; কিন্তু ওদের মধ্যে বাশ্‌কিরও আছে। সেটা বোঝা যায় বনবেড়ালের চামড়ার উঁচু টুপি আর তূণ দেখে। বাহিনী পরিদর্শন শেষ করে অধিনায়ক সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তৃতায় বললেন, 'নওজোয়ানরা, আমরা যে আমাদের সম্রাজ্ঞীকে ভালোবাসি তার প্রমাণ আজকের এই যুদ্ধে দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীকে আমরা দেখিয়ে দেব যে আমরা সাহসী ও রাজভক্ত প্রজা।' অধিনায়কের কথায় সৈন্যরা উচ্চ নির্ঘোষে সোৎসাহ সমর্থন জানাল। আমার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে শ্‌ভাব্রিন, ওর স্থির দৃষ্টি শত্রুর দিকে নিবদ্ধ। কেল্লার সৈন্য সমাবেশ দেখে দূরের অশ্বারোহী দল জোট বেধে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওরা অবস্থাটা আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। ইভান ইগ্‌নাতিচকে অধিনায়ক হুকুম দিলেন লোকগুলোকে লক্ষ্য করে কামান দাগতে এবং কামানের সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলেন নিজেই। সোঁ-ও-ও করে আওয়াজ তুলে কামানের

গোলা ছুটল। লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে দূরে গিয়ে পড়ল গোলাটা, কারও কোনো ক্ষতি হল না। অশ্বারোহীরা দল ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে উধাও। স্তেপ জনশূন্য হয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা মাশাকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যাম্পার্টে এসে হাজির। মাশা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়তে রাজি নয়। অধিনায়ক-পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর, খবর কি? শত্রু কোথায়?' ইভান কুজমিচ জবাব দিলেন, 'শত্রু খুব বেশি দূরে নয়। ঈশ্বর করুন, ভালোয় ভালোয় কেটে যাক! মাশা, তুমি কি ভয় পেয়েছ?' মারিয়া ইভানভনা বলল, 'না বাবা। বরং বাড়িতে একা থাকতেই আমার বেশি ভয় করে।' এই বলে ও আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ওপরে জোর করে একটু হাসি ফোটাল। নিজের অজান্তেই আমি তলোয়ারের বাঁটটা শক্তভাবে চেপে ধরলাম। মনে পড়ল যে গতকাল ওর হাত থেকেই আমি তলোয়ারটা নিয়েছি। আমার প্রেমিকাকে রক্ষা করতে হবে, এই অর্থটুকুও যেন এই ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে। ভাবতেই বুকের ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। মনে মনে কল্পনা করলাম আমি ওর ত্রাণকর্তা; আমি যে ওর বিশ্বাসের উপযুক্ত তা দেখিয়ে দেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। চূড়ান্ত মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম অধৈর্য হয়ে।

কেল্লা থেকে প্রায় আধ-ভার্স্ট দূরে একটা ঢিবীর আড়াল থেকে এবার নতুন আরেক দল অশ্বারোহী বেরিয়ে এসেছে। স্তেপ অঞ্চল ছেয়ে গেছে বর্শা ও তীরধনুক সজ্জিত একদল সশস্ত্র মানুষে। এই দলের মধ্যে একজন চেপেছে একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে, পরনে গাঢ় রক্তবর্ণের পোশাক, হাতে খোলা তলোয়ার। এই লোকটিই পুগাচেভ। সে ঘোড়া থামাতেই সবাই ঘিরে দাঁড়াল তাকে। তারপর, যতোদূর মনে হয় তার হুকুমেই চারজন লোক পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এল একেবারে আমাদের কেল্লা পর্যন্ত। এই চারজনকে চিনতে পারলাম আমরা। আমাদের দলত্যাগী সেই চারজন লোক। একজন একটা কাগজের টুকরো মাথার ওপরে তুলে ধরে আছে। আরেকজনের বর্শার মাথায় য়ুলাইয়ের মুণ্ডটা গাঁথা। বর্শাটাকে ঝাঁকিয়ে মুণ্ডটাকে সে বেড়ার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে। বেচারী কাল্‌মিকের মুণ্ডটা এসে পড়ল অধিনায়কের পায়ের কাছে।

বিশ্বাসঘাতকরা চেঁচিয়ে বলল, 'বন্দুক নামিয়ে সবাই এসো জারের কাছে! জার রয়েছেন এখানে!'

ইভান কুজমিচ হুঙ্কার ছাড়লেন, 'রোসো, আমি দেখাচ্ছি তোদের!' তারপর সৈন্যদের হুকুম দিলেন, 'চালাও গুলি!' একঝাঁক গুলি বৃষ্টি করল আমাদের সৈন্যরা। যে কসাকটির হাতে চিঠিটা ছিল, সে ঘোড়ার জিনের ওপর থেকে টলে পড়ে গেল মাটিতে। অন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে পেছিয়ে গেল। মারিয়া ইভানভনার দিকে আমি তাকালাম। য়ুলাইয়ের রক্তমাখা মাথাটা দেখে ও শিউরে-উঠেছে, বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে হতভম্ব হয়ে গেছে, সমস্ত মিলিয়ে ওর প্রায় একটা হতচেতন অবস্থা। মৃত কসাকের হাতে কাগজের টুকরোটা রয়ে গেছে, সেটা নিয়ে আনবার জন্যে একজন কর্পোরালকে ডেকে হুকুম দিলেন অধিনায়ক। কর্পোরাল মাঠের দিকে চলে গেল। ফিরে আসবার সময় মৃত লোকটির ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে নিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। অধিনায়কের হাতে চিঠিটা দিল সে। অধিনায়ক পড়ে দেখলেন, তারপর ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে। ওদিকে বিদ্রোহীদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আক্রমণ করবার জন্যে ওরা প্রস্তুত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কানের পাশ দিয়ে শিস দিয়ে বুলেট ছুটতে লাগল। কয়েকটা তীর এসে বিঁধল আমাদের পায়ের কাছে মাটিতে আর বেড়ার খুঁটিতে। অধিনায়ক বললেন, 'ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা! এ সব মেয়েদের ব্যাপার নয়। মাশাকে নিয়ে যাও। মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ তো! এমনিতেই ওর প্রায় মরবার মতো অবস্থা হয়েছে।'

চারদিকে বুলেট বৃষ্টি হতে দেখে ভাসিলিসা ইরেগোরভনা খানিকটা দমে গেছেন। স্তেপের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি; সেখানে সাড়া জেগেছে। তখন স্বামীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'ইভান কুজমিচ, আমরা মরি কিংবা বাঁচি, সবই এখন ভগবানের হাতে। মাশাকে আশীর্বাদ করো! মাশা, তোর বাবাকে প্রণাম কর গিয়ে!'

মাশার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীরটা কাঁপছে। ইভান কুজমিচের কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল, প্রণাম করল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। বৃদ্ধ অধিনায়ক মেয়ের মাথার ওপরে তিনবার ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন, তারপর হাত ধরে

তুলে কপালে চুমু খেয়ে ধরা গলায় বললেন, 'মাশা, আমি আশীর্বাদ করি, তুই সুখী হ'। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস! ভগবান তোর সহায় হবেন! যদি সত্যিকারের খাঁটি মানুষের সঙ্গে তোর দেখা হয়, তাহলে ভগবান করুন, তোরা যেন ভালোবাসতে পারিস, তোদের যেন বুঝতে ভুল না হয়। তোর মা আর আমি যেমন একসঙ্গে জীবন কাটিয়েছি, তেমনি ভাবে থাকতে চেষ্টা করিস সেই মানুষটির সঙ্গে। এখন এস, মাশা! ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা, আর দেরি কোরো না, যতো তাড়াতাড়ি পার ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।' (বাবার বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।) কাঁদতে কাঁদতে অধিনায়ক-পত্নী বললেন, 'এসো, আমরাও চুমু খেয়ে বিদায় নিয়ে নিই! বিদায়, ইভান কুজমিচ! যদি কোনো দিন কোনো কারণে তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা কোরো!' স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে অধিনায়ক বললেন, 'বিদায়, ওগো বিদায়, আর না, যাও তোমরা! আর দেরি কোরো না! আর যদি সময় পাও তো মাশাকে সারাফান* পরিয়ে দিও।' মা ও মেয়ে চলে গেল। মারিয়া ইভানভনার যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও। ইভান কুজমিচ এবার ফিরে তাকিয়েছেন আমাদের দিকে। তাঁর সমস্ত মনোযোগ এখন শত্রুর দিকে। বিদ্রোহীরা তাদের নেতার কাছাকাছি ঘোড়া ছুটিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ সবাই একসঙ্গে ঘোড়া থেকে নামতে শুরু করল। অধিনায়ক বললেন, 'রুখে দাঁড়াও! এবার ওদের আক্রমণ শুরু হবে...।' আর ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল একটা ভীষণ চিৎকার আর গর্জন। বিদ্রোহীরা মরিয়া হয়ে আমাদের কেল্লার দিকে ছুটে আসছে। আমাদের কামানে গোলা ভরে রাখা হল। যে পর্যন্ত না আক্রমণকারীরা একেবারে সামনা-সামনি এসে পড়ে ততোক্ষণ অধিনায়ক অপেক্ষা করলেন, তারপর হঠাৎ কামান দাগলেন। গোলাটা গিয়ে ফাটে একেবারে ভিড়ের মাঝখানে। বিদ্রোহীরা ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে পিছু হটছে। শুধু তাদের নেতা একা দাঁড়িয়ে আছে সামনে...। তলোয়ারটা নাড়ছে সে, মনে হয় অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে ডাকছে পিছনের

---

* রুশীয় নারীর জাতীয় পোশাক।

লোকজনদের...। চিৎকার ও গর্জন মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল, আবার শুরু হয়ে গেল। সৈন্যদের দিকে ফিরে তাকিয়ে অধিনায়ক বললেন, 'কেল্লার দরজা খোল! ভেরী বাজাও! এগিয়ে চল নওজোয়ানরা! এগিয়ে চল আমার সঙ্গে!'

অধিনায়ক, ইভান ইগ্‌নাতিচ ও আমি সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাম্পার্ট ছাড়িয়ে অপর দিকে গিয়ে পেঁচেছি। কিন্তু সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেছে, তারা একটুও নড়ে না। ইভান কুজমিচ চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? যদি মরতেই হয় তাহলে মরব আমরা! সৈনিকদের এছাড়া গতি নেই!' এদিকে বিদ্রোহীরা ঢুকে পড়ে কেল্লার মধ্যে। এবার তারা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ভেরীর শব্দ থেমে গেল, কেল্লার সৈন্যরা হাতের রাইফেল নামিয়ে রাখল। একটা ঘা খেয়ে পড়ে গেলাম আমি, আবার উঠে দাঁড়ালাম, তারপর বিদ্রোহীদের সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার মধ্যে ঢুকলাম। অধিনায়কের মাথায় চোট লেগেছে, তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন একদল শয়তানের মাঝখানে, আর চাবির গোছাটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেবার জন্যে শয়তানরা জবরদস্তি করছিল। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে আমি ছুটে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কয়েকজন জোয়ান কসাক নিজেদের বেল্‌ট দিয়ে কষে বাঁধল আমাকে, তারপর বলল, 'একটু সবুর করো, জারের বিরুদ্ধে যাবার মজাটা এখুনি টের পাবে!' রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। কেল্লার বাসিন্দারা রুটি আর নুন হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে, বেজে উঠেছে গির্জার ঘণ্টা। হঠাৎ রব উঠল যে, জার ময়দানে বসে আনুগত্যের শপথ নিচ্ছেন ও বন্দীদের অপেক্ষায় আছেন। দল বেঁধে মানুষ ছুটল ময়দানের দিকে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সেখানে।

অধিনায়কের বাড়ির অলিন্দে একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে পুগাচেভ। পরনে জরি দেওয়া লাল কসাক জামা। মাথায় সেব্‌ল্‌ লোমের উঁচু টুপি; টুপিটা থেকে ঝুলছে একটা সোনার থোপ্‌না। তার চকচকে চোখদুটোর ওপরে আড়াআড়িভাবে টুপিটা বসানো। লোকটির মুখ আমার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। তাকে ঘিরে আছে কসাক সর্দাররা। হাতে ক্রুশ নিয়ে অলিন্দের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার গেরাসিম। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীর কাঁপছে। দেখে মনে হয়, যাঁদের যাঁদের শাস্তি দেওয়া হবে তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে তিনি

নিঃশব্দে মার্জনা ভিক্ষা করছেন। ময়দানের মাঝখানটিতে তাড়াহুড়ো করে একটা ফাঁসিমঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা এগিয়ে আসতেই বাশ্‌কিররা লোকজনদের ঠেলে সরিয়ে আমাদের জন্যে পথ করে দিল এবং আমাদের নিয়ে দাঁড় করাল পুগাচেভের সামনে। ঘণ্টার শব্দ থেমে গেছে। চারদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা। 'অধিনায়ক কে?' ভুয়ো-জার জিজ্ঞেস করল। আমাদের কেল্লার সেই সার্জেণ্টটি ভিড়ের থেকে বেরিয়ে এসে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল ইভান কুজমিচকে। বৃদ্ধের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পুগাচেভ বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয়! আমি তোমার জার — আর আমারই বিরুদ্ধে কিনা তুমি লড়াই চালাও!' ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হয়ে অধিনায়ক দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তবু নিজের বিলীয়মান শক্তিকে জড়ো করে দৃঢ় স্বরে জবাব দিলেন, 'তুমি আমার জার নও! তুমি একটা চোর ও ভুয়ো-জার! তাছাড়া আর কিছু নও তুমি! শুনতে পাচ্ছ আমি কী বলছি?' তীব্র ভ্রূকুটি করে তাকাল পুগাচেভ, তারপর একটা সাদা রুমাল নাড়ল। কয়েকজন কসাক বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল ফাঁসিমঞ্চের কাছে। যে বিকলাঙ্গ বাশ্‌কিরটিকে আগের দিন আমরা জেরা করেছিলাম, তাকে দেখা গেল হাতে দড়ি নিয়ে ফাঁসিমঞ্চের আড়কাঠের ওপরে দু-পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই হতভাগ্য ইভান কুজমিচ আমার চোখের সামনে শূন্যে ঝুলতে লাগলেন। তারপর পুগাচেভের সামনে নিয়ে আসা হল ইভান ইগ্‌নাতিচকে। পুগাচেভ তাকে বলল, 'জার পিওতর ফিওদরভিচ তোমার সামনে বসে আছেন, তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নাও!' ক্যাপ্টেনের কথার পুনরাবৃত্তি করে ইভান ইগ্‌নাতিচ জবাব দিল, 'তুমি আমাদের জার নও। বাপু হে, তুমি হচ্ছ একটা চোর ও ভুয়ো-জার!' পুগাচেভ আবার রুমাল নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ অধিনায়কের পাশে এই সুযোগ্য লেফ্‌টেনাণ্টটিও শূন্যে ঝুলতে থাকল।

এবার আমার পালা। সাহসের সঙ্গে আমি পুগাচেভের দিকে তাকালাম। আমার বীর সাথীরা যা বলেছে সেই একই জবাব দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। এই সময়ে বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যে আমি শ্‌ভাব্রিনকে দেখতে পেলাম। সে কসাক জামা গায়ে দিয়েছে এবং কসাকদের ধরণে চুল কেটেছে দেখে

আমি এত অবাক হলাম যে বলবার নয়। পুগাচেভের কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলল সে। পুগাচেভ আমার দিকে না তাকিয়েই হুকুম দিল, 'লটকাও ফাঁসিতে!' আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল। মনে মনে আমি প্রার্থনা করতে শুরু করলাম, আমার সমস্ত পাপের জন্যে আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে অনুশোচনা নিবেদন করলাম ভগবানের কাছে, আমার প্রিয়জনদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কাতর মিনতি জানালাম। আমাকে টানতে টানতে ফাঁসিমঞ্চের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। 'ভয় পেও না!' আমাকে ফাঁসিমঞ্চের কাছে নিয়ে যেতে যেতে খুনীরা বারবার বলল। হয়তো তারা আমাকে একটু উৎসাহিত করে তুলতে চেয়েছিল। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শুনলাম, 'সবুর করো! পাপিষ্ঠের দল, সবুর করো!' জল্লাদরা হাতের কাজ বন্ধ করে দিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম। সাভেলিচ পুগাচেভের পা জড়িয়ে ধরেছে। 'বাপ আমার! আমার মনিবের ছেলেকে কেন তুমি খুন করতে চাও?' — বলছে আমার বুড়ো খুড়ো — 'ওকে তুমি ছেড়ে দাও; ওকে ছেড়ে দিলে ওর বাড়ির লোকেরা তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেবে। আর যদি তুমি চাও যে লোক-দেখানোর জন্যে কাউকে না কাউকে ফাঁসি দিতেই হবে তাহলে আমি হাজির আছি, এই বুড়ো লোকটাকেই বরং ফাঁসি দিতে বলো!' পুগাচেভ ইঙ্গিত করতেই আমার হাত পায়ের বাঁধন খুলে ছেড়ে দেওয়া হল আমাকে। 'আমাদের জার তোমাকে ক্ষমা করেছেন।' ওরা বলল আমাকে। এভাবে মুক্তি পেয়ে আমার যে খুব আনন্দ হয়েছিল, সে কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি যে অনুতপ্ত হয়েছিলাম, এও বলব না। এক অতি-বিচিত্র আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল আমার মনে। আমাকে আবার সেই ভুয়ো-জারের সামনে নিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হল। পুগাচেভ তার পেশীবহুল হাতখানা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। 'হাতে চুমু খাও! হাতে চুমু খাও!' রব ওঠে চারদিকে। কিন্তু এভাবে নিজেকে ছোট করে নিজের সম্মান নষ্ট করার চেয়ে আমি হিংস্রতম শাস্তিও মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। সাভেলিচ উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে আমার পিঠে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'দাদাবাবু, এখন আর গোঁয়ার্তুমি কোরো না। তোমার এত বাছবিচার কিসের? একদলা থুতু ফেলে চুমু খেলেই হয় শয়তা... (ফুঃ!) চুমু খেলেই হয়

ওর হাতে।’ তবুও আমি নড়ি না। পুগাচেভ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলল, ‘হুজুর বোধ হয় আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেছেন! দাঁড় করিয়ে দাও!’ আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আমি মুক্তি পেলাম। তারপর চোখের সামনে আর যে-সব ভয়ানক কমেডির অভিনয় হল তাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হল আমাকে।

কেল্লার বাসিন্দারা আনুগত্যের শপথ নিচ্ছে। একজন একজন করে আসে, ক্রুশে চুমু খায়, ভুয়ো-জারকে প্রণাম করে, তারপর চলে যায়। ছাউনির সৈনিকেরা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সৈন্যবাহিনীর দর্জি হাতে একটা ভোঁতা কাঁচি নিয়ে, কাঁচিটা দিয়ে সৈনিকদের বিনুনি কেটে দিচ্ছে। সৈনিকেরা আসে, শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পুগাচেভের হাতে চুমু খায় আর তখন পুগাচেভ সমস্ত দোষ মার্জনা করে দলভুক্ত করে নেয় তাদের। এই সমস্ত শেষ হতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পুগাচেভ সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। জমকালো সাজপোশাক পরানো সাদা একটা ঘোড়া আনা হয়েছে তার জন্যে। দুটি কসাক তাকে বগলের তলায় ধরে তুলে দিল ঘোড়ার জিনের ওপরে। ফাদার গেরাসিমকে পুগাচেভ বলল যে তাঁর বাড়িতে সে খেতে যাবে। আর ঠিক এই সময়ে শোনা গেল স্ত্রীলোকের চিৎকার। ডাকাতের দল ভাসিলিসা ইয়েগোরভনাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে অলিন্দে। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার আলুথালু চুল, একেবারে উলঙ্গ চেহারা। তাঁর পরনের তুলোভরা জ্যাকেটটা ইতিমধ্যেই একজনের গায়ে উঠেছে। অন্যরা টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছে পালকের তোশক, সিন্দুক, চায়ের বাসনকোসন, কাপড়-চোপড় ও সংসারের হাজারটা খুঁটিনাটি জিনিস। হতভাগিনী বৃদ্ধা চিৎকার করে বললেন, ‘হাই রে, আমাকে তোমরা শান্তিতে মরতে দাও। তোমাদের প্রাণে যদি দয়া থাকে তো ইভান কুজমিচের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।’ হঠাৎ ফাঁসিমঞ্চের দিকে তাঁর নজর পড়ল। নিজের স্বামীকে চিনতে পারলেন তিনি। আর তারপরেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ‘শয়তানের দল! তোরা এ কী দশা করেছিস ওর! ইভান কুজমিচ! আমার চোখের মণি! বীর সৈনিক! প্রুসিয়ানদের বেওনেট বা তুর্কীদের বন্দুকের গুলি তোমাকে ছুঁতে পারেনি! সামনা-সামনি লড়াইয়ে

প্রাণ হারাওনি তুমি! শেষকালে তোমাকে কিনা প্রাণ দিতে হল এক জেল-পালানো চোরের হাতে!' পুগাচেভ বলল, 'ওই বুড়ি ডাইনীর বকবকানি থামাও তো দেখি।' একথা শুনে একজন তরুণ কসাক মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ারের কোপ বসাল। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার প্রাণহীন শরীর লুটিয়ে পড়ল অলিন্দের সিঁড়ির ওপরে। পুগাচেভ চলে গেল। সমস্ত মানুষ ছুটল তার পিছনে পিছনে।

অষ্টম অধ্যায়

অনিমন্ত্রিত অতিথি

অনাহূত অতিথি
তাতারের চেয়েও খারাপ। [১৩]

প্রবাদ

ময়দানটা জনশূন্য হয়ে গেল। আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। গুছিয়ে চিন্তা করবার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। পর পর কতকগুলি ভয়ঙ্কর ঘটনার ছাপ আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।

আমার সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে মারিয়া ইভানভনার ভবিষ্যৎ ভেবে। কোথায় আছে ও? কী ঘটেছে ওর কপালে? ও কি লুকোতে পেরেছে? যে জায়গায় লুকিয়েছে তা নিরাপদ তো?.. এমনি নানা চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। অধিনায়কের ঘরে গেলাম...। ঘরটা সবই ফাঁকা, চেয়ার, টেবিল, সিন্দুক ভাঙা, বাসনকোসন গুঁড়ো গুঁড়ো, জিনিসপত্র যে যা পেরেছে তুলে নিয়ে গেছে। শোবার ঘরের দিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, সেদিকে গেলাম এবং জীবনে এই প্রথম এসে ঢুকলাম মারিয়া ইভানভনার ঘরে। ঘরের একপাশে বিছানা, ডাকাতের দল ওর বিছানাটাকে লণ্ডভণ্ড করেছে, ওর পোশাকের আলমারিটা ভেঙেছে, ভিতরে যা কিছু ছিল লুটপাট করে নিয়ে গেছে। যেখানে যীশু খ্রীষ্টের বিগ্রহ ছিল, সে-জায়গাটা শূন্য, শুধু একটা বাতি তখনো টিমটিম করে জ্বলছে। আর অক্ষত আছে দুই জানলার মাঝখানে ঝোলানো আরসিটা।

কিন্তু এই অনাড়ম্বর কুমারী-প্রকোষ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী কোথায়? আমার মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা ভাবনা হল কল্পনায় ভেসে উঠল যেন ডাকাতদলের হাতে ও ধরা পড়েছে...। ভাবতেই আমার বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল যেন...। দুচোখ জ্বালা করে জল বেরিয়ে এল, প্রেমিকার নাম ধরে জোরে ডাকলাম। আর তার পর শুনতে পেলাম অস্পষ্ট একটা শব্দ; আলমারির পিছন থেকে কাঁপতে কাঁপতে ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এল পালাশা।

হতাশাসূচক একটা ভঙ্গি করে পালাশা বলল, 'পিওতর আন্দ্রেইচ! কী ভীষণ দিন! কী ভয়ানক কাণ্ড!'

অধৈর্য হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মারিয়া ইভানভনা কোথায়? তার খবর কি?'

পালাশা জবাব দিল, 'দিদিমণি বেঁচে আছেন। আকুলিনা পাম্‌ফিলভনার বাড়িতে লুকিয়ে আছেন তিনি।'

আতঙ্কে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'পাদ্‌রির বাড়িতে! সর্বনাশ! পুগাচেভ যে গেছে ওখানে!'

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম; চোখের পলক না ফেলতে রাস্তায়, তারপর কোনো দিকে দৃকপাত না করে সোজা পাদ্‌রির বাড়ির দিকে। পাদ্‌রির বাড়ির ভিতর থেকে হৈ-হট্টগোল হাসি আর গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে...। সঙ্গীদের নিয়ে উৎসবে মেতেছে পুগাচেভ। পালাশা এসেছে আমার পিছনে পিছনে। ওকে বললাম ও যেন যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে আকুলিনা পাম্‌ফিলভনাকে ডেকে নিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা খালি বোতল হাতে পাদ্‌রির স্ত্রী বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

'ভগবানের দোহাই! মারিয়া ইভানভনা কোথায় আমাকে বলুন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি উত্তেজনায়।

পাদ্‌রির স্ত্রী জবাব দিলেন, 'আহা বেচারী! পর্দার আড়ালে আমার বিছানায় শুয়ে আছে ও! পিওতর আন্দ্রেইচ, আরেকটু হল ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল আর কি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ফাঁড়াটা কেটে গেছে। ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানেন, শয়তানটা সবে খাবার টেবিলে বসেছে এমন সময় বাছার

আমার ঘুম ভেঙে যায় আর ককিয়ে ওঠে। আমার তো বুকের ভিতরটা দুর দুর করে উঠল। শব্দটা শুনতে পেয়ে যায় শয়তান। আমাকে জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ বুড়ী, কে ককাচ্ছে বলো তো?" দুহাত কপালে ঠেকিয়ে আমি বলি, "হুজুর, আমার ভাইঝি। ওর অসুখ করেছে, এক সপ্তাহেরও ওপর ও শয্যাশায়ী।" — "তোমার ভাইঝির কি ছুক্‌রী বয়েস?" আমি বলি, "হ্যাঁ, হুজুর।" — "তাহলে বুড়ী, তোমার ভাইঝিকে একবার নিয়ে এস তো দেখি।" শুনে আমার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে থাকে। কিন্তু কী আর করা যাবে, কোনো উপায় নেই। বলি, "হুজুর, নিশ্চয়ই আনতাম কিন্তু মেয়েটার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হুজুরের কাছে আসবে কী করে?" — "সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না বুড়ী। আমি নিজেই গিয়ে তাকে দেখব।" বলতে না বলতে শয়তানটা একেবারে ভিতরে গিয়ে ঢোকে। তারপর কী হল জানেন? পর্দাটা সরিয়ে বাজপাখির মতো চোখে তাকিয়ে দেখল শুধু — বাস্‌ আর কিছু নয়! ভগবানের অশেষ দয়া! সত্যি কথা বলতে কি, কাণ্ডকারখানা দেখে আমার স্বামী আর আমি তো শহীদের মতো মরব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। আর কপাল বলতে হবে যে বাছা আমার লোকটাকে চিনতে পারেনি। হায় ভগবান! পোড়া চোখে এসবও দেখতে হল! আর এজন্যেই কিনা বেঁচে রইলাম! ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়! বেচারী ইভান কুজমিচ! চোখের ওপরে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না! আর ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা! ইভান ইগ্‌নাতিচ! সে কী দোষ করেছিল! আর আপনাকে যে কী ভেবে ছেড়ে দিলে কে জানে? আলেক্সেই ইভানভিচ শ্‌ভাব্রিনের কাণ্ড দেখলেন তো? কসাকের মতো চুল কাটা হয়েছে আর ওদের সঙ্গে এসে বসেছে আমাদের বাড়িতে, খানাপিনা চলছে! লোকটার পেটে পেটে শয়তানি! যখন আমি বললাম যে আমার ভাইঝির অসুখ, সে কী চাউনি তার! যদি একবার দেখতেন! যাই হোক, তবুও যে সত্যিকারের পরিচয় সে বলে দেয়নি, তাতেই তার কাছে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকব।' এই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে মদে-বেসামাল অতিথিদের কোলাহল শোনা গেল। ফাদার গেরাসিমের গলার স্বরও তার মধ্যে ছিল। অতিথিরা ভদ্‌কা চাইছে আর গৃহস্বামী খোঁজ করছেন গৃহকর্ত্রীর। পাদ্‌রির স্ত্রী অস্থির হয়ে উঠে বললেন, 'পিওতর আন্দ্রেইচ, আপনি বাড়ি চলে যাবেন।

এখানে আপনার থাকাটা ঠিক নয়। শয়তানের দল খানাপিনায় মেতেছে। এখন ওদের মদে-বেসামাল অবস্থা; এ সময়ে আপনি যদি ওদের সামনে পড়ে যান তাহলে আর রক্ষে নেই। চলে যান এখান থেকে। যা হবার তা হবেই। হয়তো ভগবানের কৃপা থেকে আমরা একেবারে বঞ্চিত হব না।'

পাদ্‌রির স্ত্রী ভিতরে চলে গেলেন। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে আমি ফিরে গেলাম আমার কোয়ার্টারে। ময়দানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার চোখে পড়ল, একদল বাশকির ফাঁসিমঞ্চের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে আর ফাঁসিতে ঝোলানো শরীরগুলোর পা থেকে টেনে টেনে জুতো খুলবার চেষ্টা করছে। রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে উঠল কিন্তু অতিকষ্টে আমি নিজেকে সংযত করলাম। আমি ভালো করেই জানি যে এসব ব্যাপারে বাধা দিতে যাওয়াটা একেবারেই অর্থহীন। ডাকাতের দল কেল্লার সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছে, অফিসারদের কোয়ার্টারগুলো লুটপাট করছে। সর্বত্র শোনা যাচ্ছে মদে-বেসামাল বিদ্রোহীদের হুঙ্কার আর গর্জন। আমি বাড়ি গেলাম। আমার অপেক্ষায় সাভেলিচ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, 'ভগবানের দয়ায় ফিরে এসেছে যা হোক। আমার তো মনে হচ্ছিল তুমি বোধ হয় আবার ওই শয়তানদের কবলে পড়েছ। দাদাবাবু, এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে দেখ গে যাও। পাজীগুলো আমাদের সমস্ত জিনিস চুরি করে নিয়ে গেছে — জামাকাপড়, থালাবাটি, কিচ্ছুটি ফেলে যায়নি! অবিশ্যি এজন্যে আমি ভাবি না! ভারি তো সব জিনিস! কিন্তু ভগবানের অশেষ দয়া যে তোমায় প্রাণে মারেনি। আর দলের সর্দারটিকে চিনতে পেরেছ তো দাদাবাবু?'

'না, চিনতে পারিনি। কে সে?'

'কি বলছ দাদাবাবু! সেই মাতাল লোকটাকে ভুলে গেলে? সেই যে যাকে তুমি সরাইখানায় তোমার খরগোশের চামড়ার কোটটা দিয়েছিলে? ইস্, একেবারে নতুন ছিল কোটটা, আর জানোয়ারটা সেটা গায়ে দিতে গিয়ে পট্ পট্ করে ছিঁড়ে ফেলেছিল।'

আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম। সত্যিই, সেদিনকার সেই পথপ্রদর্শকের

সঙ্গে আজকের এই পুগাচেভের চেহারার সাদৃশ্যটা বিস্ময়কর। এবার আর কোনো সন্দেহই রইল না যে পুগাচেভ ও সেই পথপ্রদর্শকটি অভিন্ন ব্যক্তি। এবার আমি বুঝতে পারলাম, কেন সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। ঘটনার এই আশ্চর্য যোগাযোগ দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। একটা ভবঘুরেকে দেওয়া ছেলেবেলাকার একটা জামা বাঁচিয়ে দিলে আমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে। আর একদিন যে মাতাল লোকটা এক সরাইখানা থেকে আরেক সরাইখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই কিনা আজ দুর্গের পর দুর্গ আক্রমণ করছে এবং রাষ্ট্রের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলছে!

'দাদাবাবু, কিছু খাবে তো বলো!' স্বাভাবিক অভ্যাসবশে সাভেলিচ জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে অবশ্য কিছু নেই। তবে যা হোক কিছু খুঁজে-পেতে এনে রান্না চাপিয়ে দিচ্ছি।'

সাভেলিচ চলে যেতেই আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম। এখন কী করব আমি? এই দুর্বৃত্তের অধীনে কেল্লাতেই থেকে যাওয়া বা ওর দলের সঙ্গে সঙ্গে চলা — সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসারের পক্ষে দু-কাজই সমান অমর্যাদার। কর্তব্যের ডাকে যদি সাড়া দিতে হয় তবে আমার উচিত এমন জায়গায় গিয়ে আমার অস্তিত্ব জানানো যাতে স্বদেশের এই দুর্দিনে এখনো আমার শক্তি নিয়োজিত হতে পারে...। কিন্তু আমার প্রেমের দাবি আমাকে জোর করে মারিয়া ইভানভনার কাছে ধরে রাখতে চাইছে — যাতে আমি ওর ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকর্তা হতে পারি। আমি বুঝতে পারছি, অবস্থার দ্রুত ও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হবে — তা সত্ত্বেও মারিয়া ইভানভনার আশঙ্কাজনক অবস্থার কথা চিন্তা করে শিউরে না উঠে পারছি না।

একজন কসাকের আবির্ভাবে আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। কসাকটি ছুটতে ছুটতে এসে জানাল যে, 'মহান জার তোমাকে তাঁর সামনে হাজির হতে হুকুম করেছেন।' যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যেতে হবে?'

কসাকটি জবাব দিল, 'অধিনায়কের বাড়িতে। খাওয়াদাওয়ার পরে প্রভু আমাদের স্নানঘরে চলে গেলেন আর এখন তিনি বিশ্রাম করছেন। হুজুর

লক্ষণ দেখে মনে হয়, উনি মস্ত লোকই বটে, খেতে বসে দু-দুটো আগুনে ঝলসানো গোটা শুয়োরের ছানা খেয়ে ফেলেছেন! আর স্নান করলেন এমন গরম জলে যে তারাস কুরোচকিন পর্যন্ত সইতে পারল না; গা ঘসে দেবার ভার ফমকা বিক্‌ভায়েভকে দিয়ে এসে নিজে ঠান্ডা জল নিয়ে কোনো রকমে হাঁপ ছেড়েছে। কী বলব, চালচলন দেখে মনে হয় বটে যে উনি মস্ত লোক। শোনা গেল স্নানঘরে গিয়ে নাকি উনি বুকের ওপর রাজচক্রবর্তী চিহ্ন দেখিয়েছেন। বুকে জার চিহ্ন থাকে। বুকের একদিকে জোড়ামাথার ঈগলপাখি, প্রায় একটা পাঁচ কোপেকের মতো বড়ো; আর অন্যদিকে ওনার নিজেরই ছবি।'

কসাকটির মতের বিরুদ্ধাচরণ করাটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। অধিনায়কের বাড়িতে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ি ওর সঙ্গে। পুগাচেভের সঙ্গে আমার এই আসন্ন সাক্ষাৎকারের পরিণতি কী হতে পারে, তাই নিয়ে মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করি। পাঠক অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারেন যে আমি কিছুমাত্র স্বস্তি বোধ করিনি।

অধিনায়কের বাড়িতে যখন পেঁছিলাম তখন সন্ধ্যা ঘনায়মান। ফাঁসিমঞ্চ থেকে শাস্তিপ্রাপ্তদের শরীর ঝুলছে, আর কালো ও ভয়ংকর বিভীষিকার মতো দেখাচ্ছে মঞ্চটাকে। বেচারী ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার মৃতদেহ তখনো পড়ে আছে অলিন্দের নিচে আর সেই অলিন্দের সামনে দুজন কসাক পাহারারত। যে কসাকটি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে আমার আগমন-সংবাদ জানাবার জন্যে ভিতরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে আমাকে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। এই ঘরেই আগের দিন ভারি কোমল একটা মূর্ছনার মধ্যে মারিয়া ইভানভনার কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়েছি।

ঘরে ঢুকে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হল। সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিল, সারা টেবিলে বোতল আর গ্লাসের ছড়াছড়ি, আর জনদশেক কসাক-সর্দারে পরিবৃত হয়ে পুগাচেভ বসে আছে। কসাক-সর্দারদের মাথায় লম্বা টুপি, পরনে রঙিন শার্ট। মদে চুর অবস্থা সকলের, রুক্ষ মুখগুলো লাল হয়ে উঠেছে, চোখগুলো চকচক করছে। কিন্তু শ্‌ভাব্রিন ও মাক্‌সিমিচ এই দলে নেই যদিও এই দুই বিশ্বাসঘাতক সম্প্রতি ওদের দলভুক্ত। আমাকে দেখে পুগাচেভ

বলল, 'মান্যবরের শুভাগমন হোক! আমরা তোমার দর্শনপ্রার্থী, দয়া করে বসো।' ঘরের মধ্যে যারা হুল্লোড় করছে তারা জায়গা ছেড়ে দিল আমার জন্যে। নিঃশব্দে আমি গিয়ে বসলাম টেবিলের একধারে। আমার পাশের আসনে বসে আছে একজন কসাক যুবক, ছিমছিমে সুন্দর চেহারা। সে আমার জন্যে একগ্লাস সাধারণ মদ ঢেলে দিল, আমি অবশ্য তা স্পর্শও করিনি। কৌতূহলের সঙ্গে চারদিকের লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। টেবিলের মাথার দিকে বসে আছে পুগাচেভ, তার কনুই টেবিলের ওপরে রাখা, তার হাতের মস্ত চওড়া মুষ্টির ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে তার কালো দাড়ি। তার মুখের ভঙ্গিমার মধ্যে একটা ছন্দ আছে, দেখে ভালো লাগে; সেই চেহারার মধ্যে কোথাও হিংস্রতার চিহ্ন নেই। বছর পঞ্চাশেক বয়সের একটি লোকের সঙ্গে ঘন ঘন কথা বলছে সে, কখনো তাকে ডাকছে কাউন্ট বলে, কখনো তিমোফেইচ, কখনো বা শুধু কাকা। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সাথীর মতো ব্যবহার, তাদের নেতার সঙ্গে ব্যবহারেও বিশেষ কোনো তারতম্য আছে বলে মনে হয় না। আলোচনা চলছে সকালবেলার আক্রমণ, বিদ্রোহের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে। সকলেই জাঁক করছে, নিজের নিজের মত প্রকাশ করছে, পুগাচেভের মতের বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করতেও কোনো রকম সংকোচ নেই। এই অদ্ভুত সমর-পরিষদের আলোচনায় স্থির হল যে অভিযান করা হবে ওরেনবুর্গের দিকে। পরিকল্পনাটা ছিল খুবই দুঃসাহসিক — এ এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা যা আর একটু হলেই পেতে পারত দুর্বিপাকময় সাফল্যের গৌরব। ঘোষণা করা হল যে পরের দিন অভিযান শুরু হবে। পুগাচেভ বলল, 'ভাইসব, এবার এস, শুতে যাবার আগে একটু গান গাওয়া যাক। আমার প্রিয় গানটা একটু গেয়ে শোনাও তো দেখি। চুমাকভ! তুমিই শুরু করো!' আমার পাশে যে লোকটি বসেছিল, মিহিগলায় গাইতে শুরু করলে মাঝিমাল্লাদের বিষণ্ণ এক গান, আর সকলে যোগ দিলে সমস্বরে:

> হে মা সবুজ পাতার বন, তোমার শন্‌শনানি থামাও,
> বাধা দিয়ো না তোমার সাহসী ছেলের চিন্তায়।
> কাল সকালে যে আমায় যেতে হবে বিচারের জন্যে
> ভয়ংকর বিচারকের কাছে, স্বয়ং জারের কাছে।

জার-সম্রাট আমায় পুছবেন:
বল্‌ত, চাষার ছেলে, বল্‌ত আমায়,
চুরি করিস কার সঙ্গে, লুঠপাটে কে সঙ্গে থাকে,
সঙ্গীসাথী অনেক নাকি তোর?
বলছি তোমায়, প্রভু তুমি ধর্মাবতার,
বলছি তোমায় সত্যি কথা, সকল কথাই বলছি,
সঙ্গীসাথীর সংখ্যা আমার মাত্র মোটে চার:
আমার প্রথম সাথী অন্ধকার রাত,
আমার দ্বিতীয় সাথী শান-দেওয়া অসি,
তৃতীয় সাথীটি মোর বিশ্বস্ত ঘোটক,
আমার চতুর্থ সাথী ছিলো — বাঁধা ধনু,
আমার দূতেরা হোল তীক্ষ্ম তীরগুলি।
ধর্মাবতার প্রভু তখন বলেন আমায়:
সাবাস তোকে রে, ওরে চাষার সন্তান,
জানিস তুই চুরি করতে, জানিস তুই জবাব দিতেও!
সেই জন্যে, বাছা আমার, দেব তোকে পুরস্কার
মাঠের মাঝে উ'চু একটা প্রাসাদ,
শক্ত দুটো খুটি, তাদের মধ্যে আড়কাঠি।

এই পল্লীগীতির বিষয় হচ্ছে ফাঁসিকাঠ, যারা গাইছে তারা নিজেরাও শেষ পর্যন্ত মরবে ফাঁসিকাঠেই — গানটা শুনে আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। গানের শব্দগুলোর নিজস্ব শক্তি এবং সেই শব্দগুলো যারা সুর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করছে তাদের ভয়ঙ্কর চেহারা, সুরেলা গলা, মুখচোখের বিষণ্ণভাব — সব মিলিয়ে আমার মধ্যে যে অনুভূতির সৃষ্টি হল তা প্রায় একটা আতঙ্কের মতো।

অতিথিরা মদ খেল আরেক গ্লাস করে। তারপর পুগাচেভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সকলের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন চলে যেতে চাইছি এমনি ভাব করে উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে ডেকে পুগাচেভ বলল, 'বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' রইলাম কেবল আমরা দুজনে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইলাম। পুগাচেভ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বাঁ চোখটা এমনভাবে ধাঁচ করে আছে যে দারুণ একটা শয়তানি ও তামাসার ভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে মুখের ওপরে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময়ে সে হো-হো শব্দে হেসে উঠল। তার হাসির মধ্যে এমন একটা সত্যিকারের খুশির সুর ছিল যে আমিও তার দিকে চেয়ে হাসতে শুরু করে দিলাম, জানি না কেন।

সে বলল, 'আমার লোকরা যখন তোমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিচ্ছিল তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না ? বলো, সত্যি কিনা ? আমি হলফ করে বলতে পারি যে, ভয়ে তোমার মাথার ঠিক ছিল না! আর তোমার চাকরটি যদি না থাকত তাহলে এতক্ষণে তুমিও ফাঁসিকাঠে ঝুলে থাকত। বুড়ো ভালুকটাকে চিনতে আমার একটুও দেরি হয়নি। সেদিন তুমি নিশ্চয়ই ভাবতে পারনি, যে-লোকটি তোমাকে পথ দেখিয়ে সরাইখানায় নিয়ে গিয়েছিল সে হচ্ছে স্বয়ং জার! বলো, ভাবতে পেরেছিলে ?' (এই বলে সে চোখেমুখে বেশ একটা ভারিক্কি ও রহস্যজনক ভাব ফুটিয়ে তোলে।) 'আমার বিরুদ্ধে গিয়ে তুমি ভয়ানক খারাপ কাজ করেছ। কিন্তু তবুও আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, কারণ তোমার সদয় ব্যবহারে আমি উপকৃত। আর এমন একসময়ে তোমার দয়া পেয়েছি যখন শত্রুর ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আর কয়েকটা দিন সবুর করেই দেখ! আমার রাজ্য ফিরে পাবার পর তোমার জন্যে আরো অনেক কিছুই আমি করব। তবে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমার প্রতি তুমি বিশ্বস্ত থাকবে।'

শয়তানটার এই ধৃষ্টতা দেখে আমার এত মজা লাগল যে আমি মুচকিয়ে না হেসে থাকতে পারলাম না।

ভ্রূকুটি করে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হাসছ কেন ? তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি মহারাজ ? সিধে জবাব দাও।'

আমি উভয়-সঙ্কটে পড়লাম। এই রাস্তার লোকটাকে সর্বময় প্রভু হিসেবে কিছুতেই স্বীকার করে নেওয়া চলে না। যদি করি তবে সে-কাজ হবে আমার পক্ষে একটা অমার্জনীয় কাপুরুষতা। আর যদি লোকটাকে মুখের ওপরে জালিয়াৎ বলি তাহলে হয়তো আমার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। আগের

বারে অবস্থাটা ছিল অন্য রকম। তখন প্রথম দেখার ঘৃণা মনের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল আর চোখের সামনে ছিল অনেক মানুষের ভিড়। সে অবস্থায় ফাঁসিকাঠের নিচে দাঁড়িয়ে যে সব কথা বলা যায়, তা এখন বলা নিতান্তই অর্থহীন দম্ভপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। কী বলব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। স্থির গাম্ভীর্যের সঙ্গে পুগাচেভ আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। শেষকালে মানবিক দুর্বলতার ওপরে জয়ী হল কর্তব্যবোধ। (এই মুহূর্তটির কথা ভেবে এখনো আমি আত্মশ্লাঘা বোধ করি।) পুগাচেভকে আমি বললাম, 'বেশ শোনো সত্যি কথাই বলি। তুমি নিজেই ভেবে দেখো, তোমাকে রাজা বলে স্বীকার করে নিতে আমি পারি কি! তুমি বিবেচক লোক — তুমি নিজেই বুঝতে পারছ যে তোমাকে যদি আমি রাজা বলে স্বীকার করি তবে তা হবে আমার পক্ষে একটা চালাকি।'

'তাহলে কী বলতে চাও তুমি? কে আমি?'

'ঈশ্বর জানেন তুমি কে? কিন্তু তুমি যে-ই হও না কেন, এক সর্বনাশা খেলায় মেতেছ তুমি।'

চকিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে পুগাচেভ বলল, 'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর না যে আমিই হচ্ছি জার পিওতর ফিওদরভিচ? বেশ কথা! তবে জান তো—সাহস যার জয় তার? আগেকার দিনে গ্রিশ্‌কা ওত্রেপিয়েভ[১৪] কি রাজত্ব করে যায়নি? আমার সম্পর্কে যা খুশি ধারণা কর, কিন্তু আমার সঙ্গেই থেকে যাও। আমি যা-ই হই না কেন তাতে তোমার কী যায় আসে? বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তুমি আমার অধীনে কাজ কর, দেখবে আমি তোমাকে ফিল্‌ড্‌-মার্শাল ও প্রিন্স বানিয়ে দেব। কী বল, রাজি?'

দৃঢ় স্বরে আমি জবাব দিলাম, 'না। অভিজাত বংশে আমার জন্ম, সম্রাজ্ঞীর প্রতি আমি আনুগত্যের শপথ নিয়েছি। তোমার অধীনে আমি কিছুতেই কাজ করতে পারি না। তুমি যদি সত্যিই আমার শুভার্থী হও, তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ওরেনবুর্গে চলে যাই।'

পুগাচেভকে দেখে মনে হল, বিষয়টা সে চিন্তা করে দেখছে। সে বলল,

'যদি তোমাকে আমি যেতে দিই তাহলে অন্তত এই প্রতিজ্ঞাটুকু তুমি করে যেতে পার কিনা যে আমার বিরুদ্ধে তুমি কখনো অস্ত্রধারণ করবে না!'

আমি জবাব দিলাম, 'তা কী করে হয়? তুমি ভালো করেই জান যে নিজের ইচ্ছায় চলবার উপায় নেই আমার। আমার ওপর তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার আদেশ হলে সে-আদেশ আমি মেনে চলবো, আমার আর কিছু করার নেই। এখন তুমি নিজেই সেনাপতি, অধীনদের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি কর তুমি। সেটা কী রকম হবে যদি আমি হুকুম মানতে না চাই, যখন দরকার হবে হুকুম মানার। এখন তোমার হাতেই আমার জীবন; যদি ছেড়ে দাও, তোমাকে ধন্যবাদ; যদি ফাঁসিকাঠে ঝোলাও, ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন, যা সত্য, তা-ই আমি তোমায় বলেছি।'

আমার আন্তরিকতায় বিস্মিত হল পুগাচেভ। আমার কাঁধের ওপরে একটা চাপড় মেরে সে বলল, 'বেশ, তাই হোক! আমি শাস্তি দিলে শাস্তিই দিই, ক্ষমা করলে ক্ষমাই করি। তুমি যেখানে খুশি যেতে পার, যা খুশি করতে পার। আগামী কাল যাবার আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেও। এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোও। আমার নিজেরও ঘুম পাচ্ছে।'

পুগাচেভকে রেখে আমি বেরিয়ে এলাম। তুষার-ঢাকা নিস্তব্ধ রাত্রি। আকাশে চাঁদ আর তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে; সেই আলো এসে পড়েছে ময়দানে, ফাঁসিমঞ্চে। অন্ধকার কেল্লা, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু আলো দেখা যাচ্ছে সরাইখানায়, সেখানে একদল লোকের মাতামাতি এখনো শেষ হয়নি, শোনা যাচ্ছে তাদের চিৎকার। পাদ্‌রির বাড়ির দিকে আমি তাকালাম। বাড়ির দরজা ও জানলার খড়খড়ি বন্ধ, দেখে মনে হয় বাড়িটার মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।

আমার কোয়ার্টারে ফিরে এসে দেখলাম, আমার অপেক্ষায় বসে থেকে সাভেলিচ হা-হুতাশ করছে। আমার মুক্তির খবর শুনে তার এত আনন্দ হল যে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে সে বলল, 'হে ভগবান, হে সৃষ্টিকর্তা, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম! সকাল হলেই

আমরা এই কেল্লা ছেড়ে যেদিকে চোখ যায় চলে যাব। আর দাদাবাবু, তোমার জন্যে রান্না করে রেখেছি, খেয়ে নাও। তারপরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দাও সকাল পর্যন্ত — ঠাকুরের দয়া হয়েছে, আর ভয় কি!'

সাভেলিচের উপদেশ মানা গেল। বেশ খিদে পেয়েছিল, খেলাম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। তারপর শরীরে ও মনে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম খালি মেঝের ওপরেই।

নবম অধ্যায়

বিচ্ছেদ

তোমারে জানিনু যবে
মধুর সে অনুভূতি, হে সুন্দরীতমা,
যখন বিচ্ছেদ এল, কী বিষাদ, কী বিষাদ,
অন্তরেতে ভরে যেন অমা। [১৫]

খেরাস্কভ

ভোরবেলা ড্রামের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি সোজা গিয়ে হাজির হলাম সমাবেশের জায়গায়। ফাঁসিমঞ্চের পাশে পুগাচেভের লোকজন ইতিমধ্যেই ভিড় দিয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তারা তখনো ঝুলছে ফাঁসিমঞ্চে। কসাকরা চেপেছে ঘোড়ার পিঠে, সৈন্যদের হাতে রাইফেল। ঝাণ্ডা উড়ছে। কামানটানা গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটা কামান; তার মধ্যে আমাদের নিজেদের কামানটাও আছে — দেখেই চিনতে পারলাম। ভুয়ো-জারের অপেক্ষায় বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। ভারি চমৎকার সাদা একটি কিরগিজ ঘোড়ার লাগাম্ ধরে অধিনায়কের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন কসাক। অধিনায়ক-পত্নীর মৃতদেহ তখনো পড়ে আছে কিনা তা দেখবার জন্যে আমি তাকালাম। মৃতদেহটাকে একপাশে সামান্য একটু ঠেলে দিয়ে বস্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তারপর একসময়ে পুগাচেভ বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। মাথার টুপি খুলল সবাই। অলিন্দে দাঁড়িয়ে পুগাচেভ অভিবাদন জানাল সকলকে। সর্দারদের মধ্যে একজন এসে তার হাতে তামার মুদ্রা ভর্তি একটা থলি দিয়ে গেল। থলির মধ্যে থেকে মুঠো মুঠো মুদ্রা নিয়ে পুগাচেভ ছড়াতে লাগল ভিড়ের মধ্যে। আর সেই মুদ্রা কুড়োবার জন্যে

হুমড়ি খেয়ে পড়ল মানুষগুলো। হাত-পা ভেঙে বসল বেশ কিছু লোক। পুগাচেভের যারা সেরা দোসর, তারা এসে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। এই দোসরদের দলে শ্ভাব্রিনও ছিল। শ্ভাব্রিনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আমার। আমার চোখেমুখে যে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে আন্তরিক বিদ্বেষ ও চেষ্টাকৃত অবজ্ঞার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল শ্ভাব্রিন। ভিড়ের মধ্যে আমার দিকে চোখ পড়ে গেল পুগাচেভের, ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডেকে বলল, 'আমার কথাটা শুনে রাখো। এখান থেকে তুমি সোজা ওরেনবুর্গে চলে যাও। ওরেনবুর্গের শাসনকর্তা আর সেনাপতিদের বল গিয়ে যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি ওখানে হাজির হচ্ছি। ওদের পরামর্শ দেবে, ওরা যেন শিশুর মতো ভালোবাসা ও আনুগত্য নিয়ে আমার সম্বর্ধনার আয়োজন করে রাখে। নইলে মৃত্যুর হাত থেকে ওদের কারও রেহাই নেই। তোমার যাত্রা শুভ হোক!' তারপর শ্ভাব্রিনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নওজোয়ানরা, এই হচ্ছে তোমাদের নতুন অধিনায়ক! সমস্ত ব্যাপারে একে মেনে চলো। তোমাদের ভার এবং কেল্লার ভার এরই ওপর থাকবে এবং কোনো কিছু হলে একেই জবাবদিহি করতে হবে আমার কাছে।' কথাগুলি শুনে আতঙ্কে আমার বুকের ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে গেল। এই কেল্লার অধিনায়ক হবে শ্ভাব্রিন! মারিয়া ইভানভনা পড়বে গিয়ে ওর হাতে! হায় ভগবান, কী উপায় হবে মেয়েটার? অলিন্দ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল পুগাচেভ। ঘোড়াটাকে নিয়ে যাওয়া হল তার কাছে। কসাকরা সাহায্য করবার সময় পায়নি, তার আগেই পুগাচেভ একলাফে অত্যন্ত অনায়াস-ভঙ্গিতে চেপে বসেছে ঘোড়ার জিনের ওপরে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম যে সাভেলিচ ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে পুগাচেভের হাতে একটা কাগজ দিচ্ছে। ব্যাপারটা কি হতে পারে তা আমি অনুমান করতে পারলাম না। পুগাচেভ ভারিক্কি স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?' সাভেলিচ জবাব দেয়, 'পড়ে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে।' পুগাচেভ কাগজটা হাতে নিল এবং চোখমুখে যথোচিত ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে তুলে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাগজটির দিকে, শেষকালে বলল, 'বড়ো বিশ্রী

পে'চানো পে'চানো হাতের লেখা তোমার। এই লেখার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারা আমার দিব্য চক্ষুর কর্ম নয়। আমার পয়লা-সেক্রেটারি গেল কোথায়?'

কর্পোরালের পোশাক-পরা একজন যুবক দ্রুত পায়ে পুগাচেভের কাছে ছুটে গেল। 'চে'চিয়ে পড়ো তো।' তার হাতে কাগজটা দিয়ে বলল ভুয়ো-জার। কী মতলব নিয়ে সাভেলিচ পুগাচেভের কাছে চিঠি লিখেছে তা জানবার জন্যে আমি ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। পুগাচেভের পয়লা-সেক্রেটারি শব্দের প্রত্যেকটি মাত্রাকে আলাদা-আলাদা করে বানান করে নিচের এই কথাগুলো চে'চিয়ে পড়ল:

'দুটি পোশাক, একটি ক্যালিকো কাপড়ের, অপরটি ডোরাকাটা সিল্‌কের। ছয় রুব্‌ল।'

ভ্রূকুটি করে পুগাচেভ জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে কী?'

শান্ত স্বরে সাভেলিচ জবাব দিল, 'আরও পড়ে যেতে বলো।'

পয়লা-সেক্রেটারি পড়ে চলল:

'চমৎকার সবুজ কাপড়ের একটা পোশাক। সাত রুব্‌ল।

সাদা কাপড়ের ট্রাউজার। পাঁচ রুব্‌ল।

হাতাসমেত বারোটি ওলন্দাজ শার্ট। দশ রুব্‌ল।

চায়ের সরঞ্জাম বোঝাই একটি বাক্স। আড়াই রুবল...'

পুগাচেভ ফেটে পড়ল, 'কী এসব ছাইভস্ম? তোমার চায়ের সরঞ্জাম বোঝাই বাক্স বা ট্রাউজার বা জামার হাতার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সাভেলিচ বোঝাতে শুরু করল, 'ব্যাপারটা কী জানো? শয়তানের দল আমার মনিবের যে-সব সম্পত্তি চুরি করে নিয়ে গেছে এটা হচ্ছে তারই একটা ফিরিস্তি...'

'শয়তানের দল মানে?' হুঙ্কার ছাড়ল পুগাচেভ।

সাভেলিচ বলল, 'ক্ষমা করো, মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। শয়তানের দল নয় ত। তোমার দলের লোকজন। তারা আমাদের বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে চলে গেছে। শয়তানের দল বলেছি বলে রাগ করো না। চার

চারটি পা থাকা সত্ত্বেও ঘোড়া মাঝে মাঝে হোঁচট খায়। ফিরিস্তিটা পড়ে যেতে বলো।'

'পড়ো,' পুগাচেভ বলতেই সেক্রেটারি পড়ে চলল:

'তুলোভরা সুতীর লেপ একটা। তাফ্‌তা লেপ একটা। চার রুব্‌ল।

শেয়ালের লোমের কিনার দেওয়া লাল কাপড়ের কোট একটা। চল্লিশ রুব্‌ল।

খরগোশের চামড়ার কোট একটা। এই কোটটি হুজুরকে সরাইখানায় দেওয়া হয়েছিল। পনেরো রুব্‌ল।'

'এ-সবের অর্থ কী?' দু-চোখে আগুন ধরিয়ে চিৎকার করল পুগাচেভ।

স্বীকার করতেই হবে যে বেচারী সাভেলিচের কথা শুনে সেই মুহূর্তে আমার আতঙ্ক হয়েছিল। পুগাচেভের কথায় আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছিল সাভেলিচ, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে পুগাচেভ বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয়! এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে আসো!' সেক্রেটারির হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে সাভেলিচের মুখের ওপরে ছুঁড়ে বলতে থাকল, 'ওরে বুড়ো গণ্ডমূর্খ! সামান্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে গেছে তাতেই এত আক্ষেপ! আমার হুকুম না মানবার জন্যে এখানে আর যাদের আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তোকে আর তোর মনিবকেও ঝুলিয়ে দিতে পারতাম জানিস? কিন্তু তোদের দুজনেরই প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছি। সেজন্যে কোথায় বাকিটা জীবন আমার এবং আমার দলের মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবি বুড়ো ইঁদুর — তা না করে এই ফিরিস্তি নিয়ে এসেছিস্? খরগোশের চামড়ার কোট! খরগোশের চামড়ার কোট কাকে বলে তা দেখিয়ে দিচ্ছি! জানিস, জ্যান্ত অবস্থায় তোর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে সেই চামড়া দিয়ে একটা কোট বানিয়ে দিতে পারি!'

সাভেলিচ জবাব দিল, 'তোমার যেমন অভিরুচি করবে। আমি আমার মনিবের গোলাম মাত্র। মনিবের সম্পত্তি খোয়া গেলে আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।'

স্পষ্টই বোঝা গেল যে পুগাচেভ দিল্‌দরিয়া মেজাজে আছে। আর বাক্যব্যয় না করে সে সামনের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল। শ্‌ভাব্রিন ও অন্য সর্দাররা চলল

তার পিছনে পিছনে। সুশৃংখলভাবে দলটি বেরিয়ে গেল কেল্লা থেকে। পুগাচেভকে বিদায় দেবার জন্যে ভিড় করে এগিয়ে গেল লোকেরা। আমি ও সাভেলিচ ছাড়া ময়দানে আর কোনো জনপ্রাণী নেই। সাভেলিচের হাতে রয়েছে সেই ফিরিস্তিটা, গভীর আক্ষেপের সঙ্গে ফিরিস্তিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সে।

সাভেলিচ ভেবেছিল, পুগাচেভের সঙ্গে আমার যখন খাতির তখন নিশ্চয়ই কিছুটা সুযোগ-সুবিধা করে নেওয়া যাবে। কিন্তু ওর এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হল না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওর এই অসঙ্গত ব্যগ্রতার জন্যে ওকে একটু ধমক দিই। কিন্তু ধমক দিতে গিয়ে আমি হেসে ফেললাম। সাভেলিচ বলল, 'দাদাবাবু হাসছ বটে। কিন্তু আবার যখন নতুন করে ঘরসংসার পাততে হবে তখন বুঝবে এটা সত্যি সত্যিই হাসির ব্যাপার কিনা।'

মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি পাদ্রির বাড়িতে গেলাম। পাদ্রির স্ত্রী খুবই খারাপ খবর শোনালেন আমাকে। রাত্রিবেলা মারিয়া ইভানভনার প্রচণ্ড জ্বর এসেছে আর এখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর প্রলাপ বকছে। পাদ্রির স্ত্রী আমাকে মারিয়া ইভানভনার ঘরে নিয়ে গেলেন। পা টিপে টিপে আমি বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, অবাক হলাম ওর চেহারার পরিবর্তন দেখে। ও আমাকে চিনতে পারল না। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ওর বিছানার পাশে। ফাদার গেরাসিম ও তাঁর স্ত্রী আমাকে নানারকম সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন কিন্তু আর কিছুই কানে ঢুকছে না আমার। বিষণ্ণ একটা চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। বাপ-মা হারা এই হতভাগিনীকে অসহায় অবস্থায় একদল হিংস্র বিদ্রোহীর মাঝখানে ফেলে যেতে হবে অথচ আমার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই — ভাবতেই আতংক হচ্ছে আমার। শ্ভাব্রিন — বিশেষ করে শ্ভাব্রিন — একটা বিভীষিকার মতো গ্রাস করেছে আমার কল্পনাকে। ভুয়ো-জার তাকে কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে দিয়ে গেছে, সে এখন এই কেল্লার অধিনায়ক, আর এই কেল্লাতেই থাকবে এই নিরীহ হতভাগিনী, তার ঘৃণার পাত্রী — সুতরাং সুযোগ পেয়ে সে যে কতদূর অগ্রসর হবে কে জানে! কিন্তু আমার করার কিছু আছে কি? কী করলে ওকে সাহায্য করতে পারি? কী করলে ওকে মুক্ত করতে পারি এই দুর্বৃত্তের কবল থেকে? আমার সামনে একটিমাত্র রাস্তা খোলা আছে —

অবিলম্বে ওরেনবুর্গে যাওয়া চলে এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বেলোগর্স্ক কেল্লা মুক্ত করতে ব্যবস্থা করা এবং এ ব্যাপারে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করা। তাই করব স্থির করি। পাদ্রি এবং আকুলিনা পাম্ফিলভনার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আকুলিনা পাম্ফিলভনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম যেন তিনি এই হতভাগিনীর সেবাযত্ন করেন; ওকে আমি আমার স্ত্রী বলে গণ্য করলাম। ওর হাতটা তুলে নিয়ে চুমু খেলাম। আমার চোখের জলে ওর হাত ভিজে গেল। সদর পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসতে আসতে পাদ্রির স্ত্রী বললেন, 'বিদায়! বিদায় পিওতর আন্দ্রেইচ! ঈশ্বর করুন আবার যেন সুসময়ে আমরা মিলতে পারি। আমাদের কথা ভুলে যাবেন না, চিঠিপত্র দেবেন। আহা বেচারী মারিয়া ইভানভনা— আপনি ছাড়া ওর আর কেউ নেই, আপনিই ওর সান্ত্বনা, আপনিই ওর রক্ষক।'

ময়দানে বেরিয়ে এসে ফাঁসিমঞ্চের সামনে আমি একবার দাঁড়ালাম। প্রণাম জানালাম ফাঁসিমঞ্চের উদ্দেশ্যে। তারপরেই কেল্লার এলাকা ছেড়ে এগিয়ে চললাম ওরেনবুর্গের রাস্তা ধরে। সাভেলিচ চলল সঙ্গে সঙ্গে। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে ও।

আপন মনে চিন্তা করতে করতে আমি রাস্তা দিয়ে চলেছি হঠাৎ শুনলাম পিছন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, একজন কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে কেল্লার দিক থেকে, একটা বাশ্কির ঘোড়াকে লাগাম ধরে নিয়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে এবং দূর থেকে আমাকে থামবার জন্যে ইঙ্গিত করছে। আমি থামলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে লোকটি এসে হাজির হল সে আমাদের পূর্ব-পরিচিত সেই সার্জেণ্ট। ঘোড়া থেকে নেমে দ্বিতীয় ঘোড়ার লাগামটা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, 'হুজুর, আমাদের কর্তা আপনার জন্যে এই ঘোড়াটা পাঠিয়ে দিয়েছেন আর নিজের গায়ের থেকে খুলে এই কোটটা।' (একটা ভেড়ার চামড়ার কোট ঘোড়ার জিনের সঙ্গে আটকানো ছিল।) 'আরেকটা জিনিসও তিনি আপনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন' — এই পর্যন্ত বলে সার্জেণ্ট থামে, তার মুখে কথা আটকে যাচ্ছে — 'পঞ্চাশটা কোপেক তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু পথে আসতে আসতে সেগুলো আমার পকেট থেকে পড়ে গেছে। আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি।' আড়চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে

সাভেলিচ বলল, 'পথে আসতে আসতে পকেট থেকে পড়ে গেছে? বাপু হে, তোমার বুকের কাছটায় যে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজছে — সেটা কি জন্যে শুনি? বেহায়া কোথাকার!' কিছুমাত্র উদ্বেগ না দেখিয়ে সার্জেণ্ট জবাব দিল, 'আমার পকেট ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজছে? তা তুমি বুড়ো মানুষ, ভগবান তোমায় দেখবে! ঝন্‌ঝন্‌ করে যা বাজছে তা পয়সা নয়, ঘোড়ার লাগাম।' দুজনের কথা কাটাকাটি থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'বেশ কথা। যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিও। আর পথে আসতে আসতে তোমার পকেট থেকে যে পঞ্চাশটা কোপেক পড়ে গেছে, ফিরে যাবার সময় সেগুলো কুড়িয়ে পাও কিনা দেখো। ওটা তোমাকে আমি ভদ্‌কার জন্যে দিলাম।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! আপনার মঙ্গল হোক!' এই বলে সে ফিরতি পথে ঘোড়া ঘুরিয়ে দিল। বুকের কাছটায় সে একহাতে চেপে ধরে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ভেড়ার চামড়ার কোটটা আমি গায়ে দিলাম। তারপর ঘোড়ার ওপরে চেপে বসে সাভেলিচকে বসালাম পিছন দিকে। সাভেলিচ বলল, 'দেখলে তো দাদাবাবু, শয়তানটার কাছে যে আরজি পেশ করেছিলাম তাতে ফল হয়েছে। নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা পেয়েছে চোরটা। অবিশ্যি এই লম্বা-ঠেঙে বাশ্‌কির ঘোড়াটা আর এই কোটটার দাম এমন কিছু নয় — আমাদের যে সব জিনিস ওরা চুরি করেছে, দামের দিক থেকে তার অর্ধেকও নয়। তাছাড়া তুমি ভালোমানুষি করে ওকে যে-সব জিনিস দিয়েছ তা তো হিসেবের মধ্যে ধরছিই না। তবুও যা পাওয়া গেছে তাই ভালো। কাজে লাগবে। কিছু না পাওয়ার চেয়ে ঘেয়ো কুকুরের একগোছা লোমও ভালো।'

দশম অধ্যায়
অবরুদ্ধ শহর

সাজিয়ে সেনা প্রান্তরে ও পাহাড়ে,
শিখর থেকে ঈগল-সম রইল চেয়ে শহরে।
হুকুম দিল ছাউনিটাকে গুলি-গোলায় সাজাতে,
রাতের বেলায় আড়াল থেকে শহর মুখো চালাতে।[১৬]

খেরাস্কভ

ওরেনবুর্গের কাছাকাছি এসে প্রথমেই আমাদের সঙ্গে দেখা হল একদল কয়েদীর। তাদের মাথা কামানো, শাস্তিদাতার সাঁড়াশী তাদের মুখগুলিকে বিকৃত করে দিয়েছে। দুর্গের কাছাকাছি অঞ্চলে তারা কাজ করছে আর তাদের কাজের তদারক করছে ছাউনির জনকতক বিকলাঙ্গ সৈন্য। কেউ কেউ পরিখা থেকে গাড়ি বোঝাই আবর্জনা নিয়ে ফেলে আসছে, কেউ কেউ কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। নগরের দেওয়াল মেরামত করবার জন্যে রাজমিস্ত্রীরা ইট নিয়ে উঠছে র‍্যাম্পার্টের ওপরে। শহরের প্রবেশপথে শান্ত্রীরা আমাদের আটকাল এবং আমাদের পাসপোর্ট দেখতে চাইল। আমি বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে আসছি শুনে সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রীদের সার্জেণ্ট আমাকে নিয়ে গেল জেনারেলের বাড়িতে।

জেনারেলের সঙ্গে দেখা হল তাঁর বাগানে। শরৎকালের হাল্‌কা বাতাস আপেল গাছগুলোর পাতা উড়িয়ে দিয়ে গেছে আর তিনি সেই সব গাছের পরিচর্যা করছেন। একজন বুড়ো মালী রয়েছে সঙ্গে। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি গাছের গুঁড়িগুলোকে খড় দিয়ে মুড়ে দিচ্ছেন। তাঁর চেহারার মধ্যে ফুটে

উঠেছে স্থৈর্য, স্বাস্থ্য ও প্রসন্নতার ছাপ। তিনি খুশি হলেন আমাকে দেখে এবং যে-সব ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী আমি প্রত্যক্ষ করে এসেছি সে-সম্পর্কে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে সমস্ত কথা বললাম। গাছের শুকনো ডাল ছাঁটতে ছাঁটতে বৃদ্ধ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন আমার কথা। বেলোগর্স্কের বিষণ্ণ কাহিনী আগাগোড়া বলা হয়ে তিনি বললেন, 'বেচারী মিরোনভ! কী দুর্ভাগ্যের কথা! তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের রাজপুরুষ। আর মাদাম মিরোনভা ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীলা নারী, ভারি সুন্দর ব্যাঙের ছাতার আচার তৈরী করতে জানতেন। আচ্ছা, ক্যাপ্টেনের মেয়ে মাশার খবর কী?' জবাবে আমি বললাম যে মেয়েটি পাদ্রির স্ত্রীর হেপাজতে কেল্লাতেই রয়ে গেছে। জেনারেল মন্তব্য করলেন, 'না, না, এটা ভালো কাজ হয়নি। মোটেই ভালো কাজ হয়নি। ওই শয়তানগুলো নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলবে সেই ভরসা কিছুতেই রাখা চলে না। বেচারী মেয়েটার কপালে কী আছে কে জানে!' আমি বললাম যে বেলোগর্স্ক কেল্লা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় এবং আমার বিশ্বাস আছে যে বেলোগর্স্কের হতভাগ্য অধিবাসীদের মুক্তি দেবার জন্যে মান্যবর সৈন্য পাঠাতে বিলম্ব করবেন না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জেনারেল বললেন, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে! বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবার সময় এখনো চলে যায়নি। আজ চায়ের সময়ে এসো, আমার সঙ্গে বসে একটু চা খাবে। আমি আজই সমর-পরিষদের সভা ডাকছি। দুর্বৃত্ত পুগাচেভ আর তার সৈন্যদলের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল খবর তুমি আমাদের দিতে পারবে আশা করি। আচ্ছা, এবার বিশ্রাম করো গিয়ে।'

আমার জন্যে নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে সাভেলিচ ইতিমধ্যেই ঘরদোর গোছাবার কাজে লেগে গেছে। অধৈর্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে সমর-পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ জীবন; সুতরাং পাঠক অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারেন যে সমর-পরিষদের সভায় হাজির থাকতে আমি অপারগ হইনি। নির্দিষ্ট সময়েই আমি জেনারেলের বাড়িতে হাজির ছিলাম।

আমি গিয়ে দেখলাম যে নগরের রাজপুরুষদের মধ্যে একজন আমার আগেই উপস্থিত। যতোদূর মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন শুল্ক দপ্তরের পরিচালক। মোটা চেহারা, লাল টকটকে গাল, পরনে কিংখাপের পোশাক। তিনি আমাকে ইভান কুজমিচের কথা বারবার জিজ্ঞেস করলেন; ইভান কুজমিচ নাকি তাঁর পুরনো বন্ধু। আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি নানা প্রশ্ন করতে থাকলেন এবং নানা শিক্ষণীয় মন্তব্য জুড়ে দিলেন। তাঁর এসব প্রশ্ন ও মন্তব্য শুনে বুঝতে পারা যায় যে এই মানুষটি সামরিক ব্যাপারে নিপুণ না হলেও অন্ততপক্ষে বুদ্ধিমান এবং সহজ উপলব্ধির ক্ষমতা তাঁর আছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র জেনারেল ছাড়া আর কেউ-ই সামরিক ব্যক্তি নন। সকলে আসন গ্রহণ করলে হাতে হাতে চায়ের পেয়ালা দেওয়া হল। তারপর পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে জেনারেল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিস্তৃত এক বিবরণ দিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা করা উচিত। আক্রমণমূলক ব্যবস্থা না আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা? মনে রাখবেন, এই দুই ব্যবস্থার প্রত্যেকটিরই সুবিধার দিক আছে, অসুবিধার দিক আছে। আক্রমণমূলক ব্যবস্থায় শত্রুকে দ্রুত নির্মূল করে ফেলবার আশা থাকে। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বেশি নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ...। সুতরাং বিষয়টির উপরে আমরা যথোচিত ভাবে ভোট নেব। পদ্ধতিটা হবে আইনসঙ্গতভাবে পদমর্যাদার দিক থেকে যিনি সবচেয়ে নিচে তিনি সবার আগে ভোট দেবেন, তারপর ক্রমশ উঁচুদিকে যেতে হবে। এন্‌সাইন্‌!'* এই বলে আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'এবার আপনাকে আপনার মতামত আমাদের সামনে পেশ করতে অনুরোধ করছি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পুগাচেভ আর তার দলবলের সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিয়ে আমি জোর দিয়ে বললাম, 'নিয়মিত ও স্থায়ী সৈন্যদলের আক্রমণ ঠেকাবার ক্ষমতা এই ভুয়ো-জারের নেই।'

---

* কমিশন-প্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে পদমর্যাদার দিক দিয়ে যারা সবচেয়ে ছোট, পূর্বে তাদের এই নাম ছিল।

আমার এই মত রাজপুরুষরা যে পছন্দ করছেন না তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে এটা হচ্ছে ছোকরা-বয়সের মাথা-গরম ও অবিবেচনার ফল। ঘরের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠল। কে যেন চাপাস্বরে বলে উঠল, 'একেবারে ছেলেমানুষ!' কথাটা আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে জেনারেল বললেন, 'এন্‌সাইন্‌, সমর-পরিষদের সভায় সাধারণত দেখা যায় যে প্রথমদিককার ভোটগুলি আক্রমণমূলক ব্যবস্থার পক্ষেই পড়ে। এমনটিই হয়ে আসছে। যাক, এবার আমাদের ভোটের ব্যাপারে ফিরে আসি। কাউন্‌সিলর মশাই, আপনার মত বলুন!'

কিংখাপের পোশাক-পরা বৃদ্ধটি একথা শুনে তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করলেন তৃতীয় পেয়ালা চা, যে চায়ের সঙ্গে অনেকটা পরিমাণে রাম্‌ মেশানো হয়েছে। তারপরে তিনি জেনারেলকে যে জবাব দিলেন তা হচ্ছে এই: 'মাননীয় মহাশয়, আমি মনে করি, আক্রমণমূলক বা আত্মরক্ষামূলক — কোনো ব্যবস্থাই ঠিক নয়...'

অবাক হয়ে জেনারেল বলে উঠলেন, 'আপনি বলছেন কি, কাউন্‌সিলর মশাই! এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ জানা নেই। হয় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা, নয়তো আক্রমণমূলক...।'

'মাননীয় মহাশয়, এক্ষেত্রে উৎকোচ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

'হে, হে, হে, যথার্থ বলেছেন। উৎকোচ ব্যবস্থার কৌশল গ্রহণেও কোনো আপত্তি নেই। আপনার উপদেশ মেনে নিলাম। দুর্বৃত্তটির মস্তকের জন্যে আমরা পুরস্কার ঘোষণা করব। এই উদ্দেশ্যে গোপন তহবিল থেকে সত্তর রুব্‌ল বা এমন কি একশো রুব্‌লও আমরা ব্যয় করতে পারি...।'

জেনারেলের কথায় বাধা দিয়ে শুল্ক দপ্তরের পরিচালক বললেন, 'ব্যস, তাহলেই দেখবেন, ওই ডাকাতের দল তাদের সর্দারকে হাতে পায়ে বেঁধে আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে যাবে। তা যদি না করে তাহলে আমাকে কাউন্‌সিলর না বলে কিরগিজের ভেড়া বলবেন।'

জেনারেল জবাব দিলেন, 'এই প্রস্তাবটি আমরা বিচার-বিবেচনা করব। কিন্তু প্রস্তাব যাই হোক না কেন, সামরিক ব্যবস্থাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যথোচিত ক্রমানুসারে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন।'

দেখা গেল সকলেই আমার বিরুদ্ধে। রাজপুরুষরা সকলেই নানান কথা তুললেন; যেমন, সৈন্যদের ওপর ভরসা না রাখতে পারা, সাফল্যের অনিশ্চয়তা, সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। সকলেই মনে করছেন, খোলা মাঠে যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ভাগ্যকে ছেড়ে না দিয়ে পাকাপোক্ত পাথুরে দেওয়ালের আড়ালে কামান-বন্দুক সাজিয়ে অপেক্ষা করাটা ঢের বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। সকলের বলা হয়ে গেলে পর, জেনারেল পাইপের ছাই ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা দিলেন তা হচ্ছে এই:

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখছি যে এন্‌সাইনের মতের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। সঠিক সমর নীতির উপরে এন্‌সাইনের মত প্রতিষ্ঠিত। এ নীতি প্রায় সর্বদা আক্রমণের পক্ষে, প্রতিরক্ষার পক্ষে নয়।'

এই পর্যন্ত বলে তিনি পাইপে তামাক ভরতে শুরু করলেন। বিজয়গর্বে আমি স্ফীত হয়ে উঠলাম এবং উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকালাম রাজপুরুষদের দিকে। রাজপুরুষদের মুখের ওপরে উদ্বেগ ও অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ফিস্‌ফাস আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন নিজেদের মধ্যে।

'কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ,' একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে একরাশ ঘন ধোঁয়া ছেড়ে জেনারেল বলতে লাগলেন, 'নিজের উপরে এই বিপুল দায়িত্বভার নেবার সাহস আমার নেই। পরম কারুণিক মহামান্য সম্রাজ্ঞীর আদেশে এই প্রদেশের নিরাপত্তার ভার আমার উপরে অর্পিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে এই নিরাপত্তার প্রশ্নটিই জড়িত। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের মতকেই আমি গ্রহণ করছি, অর্থাৎ সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ ব্যবস্থা হচ্ছে সহরের অভ্যন্তরেই অবরোধের জন্যে অপেক্ষা করে থাকা এবং গোলাবর্ষণ করে বা (সম্ভব হলে) আচমকা মুখোমুখি আক্রমণ করে শত্রুকে হটিয়ে দেওয়া।'

এবার আমার দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকাবার পালা রাজপুরুষদের। পরিষদের সভা শেষ হল। জেনারেলের মতো বহুদর্শী যোদ্ধার এই দুর্বলতা দেখে দুঃখ করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়েছেন।

এই বিখ্যাত অধিবেশনটির কিছুদিন পরেই আমরা জানলাম যে, পুগাচেভ তার কথামতো ওরেনবুর্গের অভিযান শুরু করেছে। নগরের প্রাচীরের ওপর থেকে বিদ্রোহী-সৈন্যদের দেখতে পেলাম। মনে হল, গতবারের আক্রমণের সময় আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তার চেয়ে বিদ্রোহীদের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এবারে ওদের কাছে কামান আছে। ছোটখাটো যে-সব কেল্লা ওরা দখল করেছে সেখানকারই কামান এগুলো। সমর-পরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ওরেনবুর্গ শহরের মধ্যে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ক্ষোভে আমার প্রায় কান্না পেতে লাগল।

ওরেনবুর্গ অবরোধের বর্ণনা দেবার চেষ্টা আমি করব না। সে-কাহিনী ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে; ঘরোয়া ইতিবৃত্তে তার স্থান নেই। আমি শুধু যথাসম্ভব সংক্ষেপে এইটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকতে চাই যে শাসনকর্তৃপক্ষের অসতর্কতার ফল হিসেবে শহরবাসীদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, হাজার রকম অসুবিধের মধ্যে পড়তে হল মানুষকে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে ওরেনবুর্গের জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে চূড়ান্ত পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করে থাকত সবাই। জিনিসপত্রের দাম খুবই বেশি, যাকে বলা যায় একেবারে অগ্নিমূল্য। ফলে মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। বাড়ীর উঠোনে কামানের গোলা এসে পড়ে — তাতেও কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন কি পুগাচেভ মাঝে মাঝে যে হামলা করে তা নিয়েও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না কেউ। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়ে আমি তো প্রায় মরার সামিল। দিন কাটে। বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে আমি কোনো চিঠিপত্র পাইনি। সমস্ত রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে বিচ্ছেদ অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। ওর কপালে কী ঘটেছে জানতে না পেরে যন্ত্রণা ভোগ করছি আমি। এখন নিজেকে ভুলিয়ে রাখার একমাত্র উপায় শুধু ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ানো। পুগাচেভকে ধন্যবাদ যে ওর দৌলতে ঘোড়াটা ভালোই পেয়েছি। সামান্য যা কিছু খাবারের সংস্থান আমার আছে তাই ঘোড়াটার সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাই আর ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে যাই একেবারে শহরের বাইরে, পুগাচেভের ঘোড়সওয়ার দলের সঙ্গে বন্দুকের

লড়াইয়ের জন্যে। এই সমস্ত সঙ্ঘর্ষে বেশি সুবিধা করতে পারে সাধারণত পুগাচেভের দলের লোকরা। তারা ভালো পানাহার করে, ভালো ঘোড়ায় চাপে। শহরের ক্ষীণকায় অশ্বারোহী বাহিনী তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ'টে উঠতে পারে না। মাঝে মাঝে আমাদের ক্ষুধার্ত পদাতিক বাহিনীও অভিযানে নামে কিন্তু পুরু হয়ে বরফ পড়ে থাকে বলে তারা বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহী অশ্বারোহী বাহিনীর বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। র‍্যাম্পার্টের ওপর থেকে আমাদের কামানগুলি বৃথাই গর্জন করে আর যখন কামানগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেগুলি বরফে আটকে যায় কারণ আমাদের ঘোড়াগুলির এমন কাহিল অবস্থা যে কামানগুলোকে টেনে তুলতে পারে না। এই হচ্ছে আমাদের সামরিক তৎপরতার ধরণ আর ওরেনবুর্গের রাজপুরুষদের মতে এরই নাম সতর্কতা ও বিবেচনা!

একদিন নাতিক্ষুদ্র একটি শত্রুদলকে আমরা ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। দল থেকে ছিটকে পড়া একটি কসাকের পিছু ধাওয়া করেছিলাম। তারপর লোকটার নাগাল ধরে যে-মুহূর্তে আমি আমার তুর্কী তলোয়ার উ'চিয়ে ঘা দিতে চলেছি, সে তার মাথার টুপিটা খুলে ফেলে চিৎকার করে উঠল, 'পিওতর আন্দ্রেইচ, কেমন আছেন আপনি?'

লোকটির দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম। আমাদের সেই সার্জেণ্ট। তাকে দেখে আমার যা আনন্দ হল বলবার নয়। বললাম, 'আরে, মাক্‌সিমিচ যে! তুমি কি অনেক দিন আগে বেলোগর্স্ক থেকে বেরিয়েছ?'

'না, অনেক দিন নয়। মাত্র কালই আমি এসেছি। আপনার একটি চিঠি আমার কাছে আছে।'

'কোথায়?' গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'এই যে!' বলে মাক্‌সিমিচ তার শার্টের ভিতরে হাত গলাল: 'পালাশাকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে চিঠিটা যে করে হোক আপনার হাতে পে'ছি দেব।' ভাঁজ করা একটা কাগজ সে আমার হাতে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। উত্তেজনায় অধীর হয়ে চিঠিটার ভাঁজ খুললাম। চিঠিতে যা লেখা ছিল তা হচ্ছে এই:

'ভগবান আমার বাবা-মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। এই পৃথিবীতে আমার আত্মীয় বা অভিভাবক বলতে আর কেউ নেই। তোমার দিকেই আমি ঝুঁকেছি। আমি জানি তুমি আমার শুভার্থী এবং প্রয়োজনের সময় সবাই তোমার সাহায্য পেয়ে থাকে। ভগবান করুন, এই চিঠিটা যেন তোমার হাতে পড়ে। মাক্সিমিচ কথা দিয়েছে যে চিঠিটা তোমাকে পেঁাছে দেবে। পালাশাকে মাক্সিমিচ বলেছে যে সে প্রায়ই তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে। তুমি নাকি নিজের সম্পর্কে এতটুকুও সাবধান নও। যারা তোমার মঙ্গলের জন্যে সব সময়ে প্রার্থনা করে তাদের কথাও কি তোমার মনে পড়ে না! আমি বহুদিন অসুখে ভুগে সেরে উঠেছি। আমি সেরে উঠবার পর ফাদার গেরাসিমকে আলেক্সেই ইভানভিচ হুকুম দিয়েছে, আমাকে যেন তার হাতে দিয়ে আসে। বাবার পরে সে-ই এখন এই কেল্লার কর্তা, ফাদার গেরাসিমকে সে শাসিয়েছে যে তার কথা না শুনলে ফাদার গেরাসিমের নামে পুগাচেভের কাছে সে নালিশ করবে। এখন আমি আমাদের পুরনো বাড়িতেই আটক আছি। আলেক্সেই ইভানভিচ চাইছে যে আমি ওকে বিয়ে করি। সে বলে, সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে, কারণ আকুলিনা পাম্ফিলভনা যখন শয়তানগুলোর কাছে আমাকে তাঁর ভাইঝি বলে পরিচয় দেন তখন সে সত্য কথা প্রকাশ করেনি। কিন্তু আলেক্সেই ইভানভিচের মতো লোকের স্ত্রী হওয়ার চেয়ে আমার সে-সময়ে মরণও ভালো ছিল। সে আমার সঙ্গে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে আর বলে যে আমি যদি আমার মত না বদলাই ও তাকে বিয়ে করতে রাজি না হই তাহলে সে আমাকে বিদ্রোহীদের শিবিরে রেখে দিয়ে আসবে। তারপর শুনিয়ে রাখে যে লিজাভেতা খার্লোভার কপালে যা ঘটেছিল, আমারও সেই পরিণতি হবে। ভেবে দেখবার জন্যে আলেক্সেই ইভানভিচের কাছ থেকে আমি সময় চেয়েছি। সে তিনদিন অপেক্ষা করতে রাজি আছে, তিনদিন পরে আমি যদি তাকে বিয়ে করতে রাজি না হই তাহলে আর আমাকে সে ক্ষমা করবে না। পিওতর আন্দ্রেইচ! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এই হতভাগিনীকে বাঁচাও! জেনারেল ও অধিনায়কদের বুঝিয়ে বলো,

তাঁরা যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সাহায্যের জন্যে সৈন্য পাঠান। সম্ভব হলে তুমিও সঙ্গে এসো। ইতি

হতভাগিনী

মারিয়া মিরোনভা।'

চিঠিটা পড়ে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠলাম। ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলাম শহরে। সারা রাস্তা নিরীহ ঘোড়াটাকে নির্দয়ভাবে কাঁটার ঘা দিয়েছি। সারা রাস্তা অনেক চিন্তা করেও অভাগিনীকে উদ্ধার করার কোনো পথ খুঁজে পাইনি। শহরে পোঁছে সোজা চলে এলাম জেনারেলের বাড়িতে, একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জেনারেলের সামনা-সামনি।

তিনি তখন একটা মীরশাউম পাইপে তামাক টানতে টানতে পায়চারি করছিলেন ঘরের মধ্যে। আমাকে দেখে থামলেন। আমাকে এভাবে হাজির হতে দেখে সম্ভবতই অবাক হয়েছিলেন তিনি এবং উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছি। আমি বললাম, 'মান্যবর, আপনি আমার বাপের মতো। আপনার পায়ে ধরে ভিক্ষে চাইছি, ভগবানের দোহাই আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না! প্রশ্নটা আমার সমস্ত জীবনের সুখ নিয়ে!'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কী, খুলে বলো তো শুনি। আমাকে কী করতে হবে বলো!'

'আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আপনি আমাকে হুকুম দিন, জন পঞ্চাশ কসাক ও একদল সৈন্য নিয়ে বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়ে আসি!'

জেনারেল চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছিলেন যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। (তিনি যে খুব ভুল করেছিলেন তা নয়।)

অবশেষে তিনি বললেন, 'কী বললে? বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেবে?'

আগ্রহের সঙ্গে আমি জবাব দিলাম, 'সাফল্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত! শুধু আমাকে যেতে দিন!'

মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'বাপু হে, তা হয় না। বেলোগর্স্ক কেল্লা এখান থেকে অনেক দূরে। শত্রু সহজেই মূল ঘাঁটির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তোমাকে পুরোপুরি হাতের মুঠোয় এনে ফেলবে। যোগাযোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়...'

আমার ভয় হল, এবার তিনি হয়তো রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেবেন। তাড়াতাড়ি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন মিরোনভের কন্যা আমার কাছে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। শ্‌ভাব্রিন তাঁকে জবরদস্তি বিয়ে করতে চাইছে।'

'বটে! এই শ্‌ভাব্রিনটা একেবারে পাজির পা-ঝাড়া! ব্যাটাকে যদি একবার হাতের মুঠোয় পাই, তাহলে চব্বিশ ঘণ্টাও পার হতে দেব না, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে র‍্যাম্পার্টে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারব! কিন্তু এখন কিছু করবার নেই, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে!'

'ধৈর্য!' আমি প্রায় উন্মত্তের মতো কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম, 'আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি আর সেই ফাঁকে সে মারিয়া ইভানভনাকে বিয়ে করে বসুক!'

জেনারেল নির্বিকার ভাবে বললেন, 'এই কথা! শুধু বিয়ে করা কেন, তার চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারে! বরং আপাতত শ্‌ভাব্রিনের বৌ হয়ে থাকাটাই ভালো। তাহলে অন্তত লোকটা ওকে যত্ন করবে। তারপর আমরা যখন লোকটাকে গুলি করে মারব তখন ওর আরেকটা বিয়ের বন্দোবস্ত করে দিলেই চলবে। ভগবানের ইচ্ছেয় ওতে কিছু আটকাবে না। সুন্দরী বিধবার চিরকাল বসে থাকতে হয় না। তার মানে, কী জানো, কুমারী মেয়ের চেয়ে তরুণী বিধবারই সহজে স্বামী জোটে।'

'শ্‌ভাব্রিনের হাতে ওকে তুলে দেওয়ার চেয়ে আমি বরং মরব!' রাগে অন্ধ হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্‌ঁ, হ্‌ঁ, হ্‌ঁ, হ্‌ঁ!' টেনে টেনে বৃদ্ধ বললেন, 'এতক্ষণে বোঝা গেল! তুমি নিজেই মারিয়া ইভানভনার প্রেমে পড়েছ দেখছি। তাহলে ত, ব্যাপার অন্য রকম। তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে! কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার হাতে একদল সৈন্য ও জন পঞ্চাশ কসাককে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এই ধরণের একটি অভিযান শুরু করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আমি এর দায়িত্ব নিতে পারি না।'

হতাশ হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মনের মধ্যে খেলে গেল। প্রাচীন যুগের ঔপন্যাসিকদের ধরণে বলতে গেলে, পরবর্তী অধ্যায়টি পড়লেই পাঠক জানতে পারবেন সেটা কী।

একাদশ অধ্যায়

বিদ্রোহী গ্রাম

যদিও হিংস্র স্বভাব অতিশয়
কিন্তু ভরাপেট তখন সিংহ মশায়
'কী হেতু আগমন গুহায়?'
শুধালেন হেসে সিংহ মশায়। [১৭]

আ. সুমারকভ

জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি দ্রুতপায়ে আমার নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। সাভেলিচের সঙ্গে দেখা হতেই সে তার স্বভাবসিদ্ধ নালিশ জানাতে শুরু করে দিল, 'দাদাবাবু, ওই মাতাল শয়তানগুলোর সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে কী লাভটা হচ্ছে শুনি! এটা কি বনেদী লোকদের সাজে? যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে বেঘোরেই প্রাণটা খোয়াবে যে! হ্যাঁ, যদি বুঝতাম যে তুর্কী বা সুইডীয় — তাহলে অন্য কথা। আর এগুলোর নাম যে মুখে আনতেও পাপ।'

সাভেলিচের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের কাছে এখন সর্বসমেত কত টাকা আছে?' একগাল হেসে সে জবাব দিল, 'দাদাবাবু, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। টাকা আমাদের আছে। বদ্‌মাইসগুলো আমাদের সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে বটে কিন্তু টাকা আমি লুকিয়ে রাখতে পেরেছি।' এই বলে সে তার পকেট থেকে রুপোর মুদ্রা-ভর্তি একটা লম্বা হাতে-বোনা থলিয়া বার করল। আমি বললাম, 'সাভেলিচ, একটা কথা বলি শোন। এই টাকাটার অর্ধেক আমাকে দাও আর বাকি অর্ধেক তোমার নিজের জন্যে রেখে দাও। আমি বেলোগর্স্ক কেল্লায় যাচ্ছি।'

সাভেলিচ কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'দাদাবাবু! ভগবানের দোহাই দাদাবাবু! সারা রাস্তায় লুঠেরারা ছড়িয়ে আছে, এই সময়ে তুমি যাবে কী করে? তোমার নিজের প্রাণের মায়া না থাকে অন্তত তোমার বাপ-মার কথাটা একবার ভেবে দেখ দাদাবাবু! আর বেলোগস্কর্ কেল্লায় হঠাৎ যাবার কী এমন দরকার পড়ল? কী আছে ওখানে? কয়েকটা দিন সবুর করো, পল্টন এসে হতচ্ছাড়াগুলোকে পাকড়াও করুক। তারপর যেখানে খুশি যেও।'

কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি। বুড়োকে বললাম, 'ওসব কথা বলে এখন আর কোনো লাভ নেই। আমি যাবই, যেতে আমাকে হবেই। মন খারাপ করো না সাভেলিচ, মাথার ওপরে ভগবান আছেন, হয়তো আবার আমাদের দেখা হবে। আর শোনো, টাকাপয়সা যা আছে তা নিয়ে বেশি হিসেব করতে যেও না বা বেশি কিপ্‌টেমি কোরো না। যা তোমার দরকার লাগবে, কিনবে, যতোই দাম হোক না কেন। এই টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। যদি তিনদিনের মধ্যে আমি ফিরে না আসি...'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সাভেলিচ বলল, 'এসব তুমি কী বলছ, দাদাবাবু? তোমার ভাবখানা এমন যেন আমি তোমাকে একা-একা যেতে দিচ্ছি আর কি! তুমি যাই বলো না কেন, তোমাকে একা যেতে দেব তা তুমি স্বপ্নেও ভেব না মনে। আর তুমি যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ যে যাবেই, কাজেই আমিও যাব তোমার সঙ্গে। হেঁটে যেতে হলেও যাব। কিন্তু তোমাকে একা-একা কিছুতেই ছেড়ে দেব না। একথা তুমি বিশ্বাস করতে পার যে তুমি এখানে থাকবে না আর আমি এই পাথরের দেওয়ালের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব? আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি, দাদাবাবু! তোমার যা অভিরুচি দাদাবাবু, কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়ব না।'

আমি জানি যে সাভেলিচের সঙ্গে তর্ক করে ফল হয় না। সুতরাং তাকে যাত্রার তোড়জোড় করতে বললাম। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমার নিজের তাগড়াই ঘোড়াটায় চাপলাম আমি আর সাভেলিচ চাপল একটা হাড়-জিরজিরে খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে। শহরের একজন লোক সাভেলিচকে এই ঘোড়াটা দিয়েছে, ঘোড়াটাকে খাওয়ানোর সামর্থ্য তার ছিল না। নগরদ্বারের

কাছে আমরা এলাম। শান্ত্রীরা আমাদের ছেড়ে দিল। ওরেনবুর্গ পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলাম দুজনে।

সন্ধ্যা নামছে। বের্দা গ্রাম পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। এই গ্রামে এখন ঘাঁটি করেছে পুগাচেভ। রাস্তা বরফে ঢাকা; কিন্তু এই বরফের ওপরে সর্বত্র ঘোড়ার খুরের ছাপ, এই ছাপগুলো রোজই নতুন নতুন করে পড়ে। আমি কদমে ঘোড়া ছোটাচ্ছি। আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াটা সাভেলিচের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর বারবার চিৎকার করে বলছে সে, 'দাদাবাবু, আরেকটু আস্তে চলো! ভগবানের দোহাই, দাদাবাবু! তোমার এই লম্বা-ঠেঙে জানোয়ারটার সঙ্গে এই হতভাগা ঘোড়াটা কিছুতেই তাল রাখতে পারছে না! আর তোমার এত তাড়াই বা কিসের? ভোজে যেতে পারলেই হত ভালো, কিন্তু চলেছি হয়ত ফাঁসীর দিকে — এই তোমাকে বলে রাখলাম, দাদাবাবু!.. প্রাণটা খুইয়ে বোসো না... আমার মনিবের ছেলে যে মরতে চলল ঠাকুর!..'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বের্দা গ্রামের আলো দেখা গেল। আমরা এসে পেঁছলাম একটা খাদের ধারে; এই খাদটা গ্রামের একটা স্বাভাবিক পরিখা হিসেবে কাজ করছে। সারাটা পথ সাভেলিচ এসেছে আমার পিছনে পিছনে, তার সেই করুণ কাকুতি একবারও থামায়নি। আমার আশা ছিল, গ্রামের পাশ কাটিয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে যেতে পারব। হঠাৎ দেখলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিক আমার সামনেটিতে লাঠি হাতে জন পাঁচেক চাষী দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল, এটা হচ্ছে পুগাচেভের ছাউনির একটা অগ্রণী পাহারা-ঘাঁটি। লোকগুলো আমাদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিল। সংকেত শব্দ আমার জানা নেই সুতরাং আমি নিঃশব্দে জায়গাটা পার হয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘিরে ফেলল, একজন এসে ধরল আমার ঘোড়ার লাগাম। তলোয়ার বার করে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে ঘা বসালাম আমি, লোকটির মাথার টুপি ওকে বাঁচিয়ে দিল বটে কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিল। অন্যরা হকচকিয়ে গিয়ে সরে গেছে। নিশ্বাস ফেলবার মুহূর্তের এই ফাঁকটুকুর সুযোগ আমি নিলাম। ঘোড়ার পেটে কাঁটার ঘা দিতেই জোর কদমে ঘোড়া ছুটল।

ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার আমাকে হয়তো সমস্ত বিপদ থেকেই বাঁচিয়ে দিতে পারত, কিন্তু হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাভেলিচ নেই। খোঁড়া ঘোড়ায় চেপে বেচারী হয়তো লোকগুলোর হাত থেকে পালিয়ে আসতে পারেনি। এখন কী করি? কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে যখন বুঝলাম যে সে আটকা পড়েছে তখন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চললাম সাভেলিচকে সাহায্য করবার জন্যে।

খাদের কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে অনেক মানুষের কলরব ভেসে এল। এই কলরবের মধ্যে সাভেলিচের গলাও শোনা যাচ্ছে। আমি আরো জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দাঁড়ালাম গিয়ে সেই চাষী-পাহারাদলের মধ্যে যারা আমাকে আগেরবার থামাতে চেষ্টা করেছিল। সাভেলিচকে তারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তাকে টেনে নামিয়েছে ঘোড়া থেকে, তারপর বাঁধবার উপক্রম করছে। আমাকে হাজির হতে দেখে সবাইকার মহা আনন্দ, হৈ-হৈ করতে করতে সবাই ছুটে এল আমার দিকে, পরক্ষণেই আমাকে টেনে নামিয়ে ফেলল ঘোড়া থেকে। ওদের মধ্যে যে লোকটিকে দেখেশুনে সর্দার বলে মনে হচ্ছিল, সে ঘোষণা করল যে আমাদের দুজনকে অবিলম্বে জারের কাছে হাজির করবে। তারপর বলল, 'তোমাদের এক্ষুণি ফাঁসিকাঠে লট্‌কানো হবে, না সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব — তা আমাদের জারই বলে দেবেন।' আমি নির্বিবাদে ওদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম, আমার দেখাদেখি সাভেলিচও তাই করল। বিজয় উল্লাসে শান্ত্রীরা নিয়ে চলল আমাদের।

খাদের ওপর পাড়ে উঠে আমরা গ্রামে ঢুকলাম। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কলরব আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে চারদিক থেকে। রাস্তায় ঠাসাঠাসি লোক কিন্তু এত অন্ধকার যে কেউ আমাদের দিকে নজর দিচ্ছে না, আমাকে ওরেনবুর্গের অফিসার বলে চিনতেও পারছে না। আমাদের বরাবর নিয়ে যাওয়া হল চৌমাথার কাছে একটা বাড়িতে। ফটকের কাছে রয়েছে কয়েক পিপে মদ আর দুটো কামান। একজন চাষী বলল, 'ওই হচ্ছে রাজপ্রাসাদ। আমি ভিতরে গিয়ে তোমাদের খবর জানিয়ে আসছি।' সে ভিতরে চলে গেল। সাভেলিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বুড়ো বারবার বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে আর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে

চলেছে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমাকে। তারপর একসময়ে সেই চাষীটি বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, 'ভিতরে চলো। আমাদের জার তোমাকে ভিতরে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম, চাষীরা যাকে রাজপ্রাসাদ বলেছে তার ভিতরে। ভিতরে দুটো চর্বির মোমবাতি জ্বলছে, দেওয়ালগুলো মুড়ে দেওয়া হয়েছে সোনালি কাগজ দিয়ে। এটুকু ছাড়া বাদবাকি সবই সাধারণ একটা কুঁড়েঘরের মতো। তেমনি টেবিল ও বেঞ্চি, হাতমুখ ধোবার জন্যে ঝোলানো পাত্র, পেরেকে ঝোলানো তোয়ালে, এককোণে চুল্লির আঙটা আর চওড়া তাকের ওপরে সাজানো রয়েছে মাটির হাঁড়ি-কলসী। পুগাচেভ বসে আছে কোণের আইকনের নিচে, পরনে লাল পোশাক, মাথায় লম্বা টুপি, তার দুই হাত কোমরে। তার কয়েকজন প্রধান অনুচর দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে। সকলেরই হাবভাবে কৃত্রিম অতি-বিনীত ভাব। বোঝা যাচ্ছে ওরেনবুর্গ থেকে একজন অফিসার এসে হাজির হয়েছে — এই সংবাদ শুনে সবাই হয়েছে বিশেষ রকমের কৌতূহলী, আর স্থির করেছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সাড়ম্বরে। আমি ঢোকামাত্রই পুগাচেভ আমাকে চিনতে পারল। তার চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য হঠাৎ উবে গেল, সোল্লাসে অনুরঙ্গ সুরে বলে উঠল, 'আরে তুমি! খবর কি? এখানে কী জন্যে এসেছ?' আমি বললাম যে আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার একদল লোক আমাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। পুগাচেভ জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমার কাজটা কী?' আমি কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। পুগাচেভ ভাবল যে বাইরের লোকের সামনে আমি কথা বলতে ইতস্তত করছি, তখন সে ইঙ্গিতে সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলল। সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল, শুধু দুজন বাদে, তারা নড়ল না। পুগাচেভ বলল, 'তোমার যা বলবার এদের সামনেই বলতে পারো। এদের কাছে আমি কোনো কথা গোপন করি না।' ভুয়ো-জারের এই দুই সহযোগী দিকে আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম। একজন প্রাচীন লোক, ছোটখাটো কুঁজো চেহারা, মুখে অল্প একটু পাকা দাড়ি। পরনের মোটা উলের কোটের ওপরে সে একটা নীল ফিতে বেঁধেছে আর এই ফিতেটার জন্যেই তার দিকে চোখ পড়ে। অপরজনকে

আমি আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না। শক্তসমর্থ লম্বা চেহারা, চওড়া কাঁধ, দেখে মনে হয় বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। তার গাড় লালচে দাড়ি, চকচকে কটা চোখ, খাঁদা নাক, কপালে ও গালে লালচে দাগ — সব মিলিয়ে তার বসন্তের দাগওলা চওড়া মুখখানায় একটা কুটিল ভাব ফুটে উঠেছে। পরনে লাল শার্ট, কিরগিজ আলখাল্লা, কসাক পাজামা। প্রথমজনের নাম (আমি পরে জেনেছি) বেলোবরদভ, সৈন্যদলের কর্পোরাল ছিল, পালিয়ে চলে এসেছে। দ্বিতীয়জনের নাম আফানাসি সকোলভ (সবাই ডাকে খ্লপুশা বলে) কয়েদী হয়ে ছিল, তিন তিনবার সাইবেরিয়ার খনি-অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসেছে। আমার সারাটা মন জুড়ে ছিল অন্য একটা চিন্তা কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন আচমকা এই লোকগুলির মাঝখানে এসে পড়ার পর লোকগুলির ছাপ গাঁথা হয়ে গেল মনের মধ্যে। আর পুগাচেভ যখন আবার আমার কাছে জানতে চাইল — 'ওরেনবুর্গ থেকে তুমি কেন আসছ? কথা বলো।' — তখনই শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলাম আমি।

আমার মনে অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল। আমার মনে হল, পুগাচেভের সঙ্গে এই যে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ, এটা নেহাতই একটা নিয়তির বিধান। এর ফলে আমার উদ্দেশ্যকে সফল করবার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। মনে মনে স্থির করলাম যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করব এবং আমার এই সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ কিছু বিবেচনা না করেই পুগাচেভের প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'একটি অনাথাকে বাঁচাবার জন্যে আমি বেলোগর্স্ক কেল্লায় যাচ্ছিলাম, এই অনাথাটির ওপরে সেখানে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে।'

দুচোখে আগুন ঝরিয়ে পুগাচেভ চেঁচিয়ে বলল, 'আমার প্রজাদের মধ্যে কার এমন সাহস যে একটি অনাথার ওপর দুর্ব্যবহার করে? যতো ধূর্তই সে হোক, তাকে ন্যায়-বিচারের শাস্তি পেতেই হবে। বলো — কে এই দুর্বৃত্ত?'

আমি বললাম, 'শ্ভাব্রিন! পাদ্রির বাড়িতে তুমি যে অসুস্থ মেয়েটিকে দেখেছিলে সেই মেয়েটিকে সে বন্দী করে রেখেছে। মেয়েটিকে সে জোর করে বিয়ে করতে চায়।'

ভীতিপ্রদর্শনের স্বরে পুগাচেভ বলল, 'শ্ভাব্রিনকে উচিত শিক্ষা দেব

আমি। হুকুম ছাড়া নিজের খুশিমতো কাজ করলে ও জনগণের উপর অত্যাচার করলে ফল কী হতে পারে তা জানতে হবে তাকে। ফাঁসিকাঠে লটকাবো তাকে।'

ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলায় খ্লপুশা বলল, 'আমাকে কিছু বলবার অনুমতি দাও। শ্ভাব্রিনকে কেল্লার অধিনায়ক করবার বেলাতেও তুমি বড়ো বেশি তাড়াহুড়ো করেছিলে, এখন তাকে ফাঁসি দেবার বেলাতেও তোমার তর সইছে না। একজন অভিজাত শ্রেণীর লোককে কসাকদের মাথার ওপরে বসিয়ে একবার তুমি কসাকদের অপমান করেছ। এখন তার নামে কথা উঠতেই তাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে জমিদার ভড়কে দিয়ো না।'

নীল ফিতেওলা বুড়ো বলল, 'খাতির করবারও দরকার নেই বা মাথায় তোলবারও দরকার নেই। শ্ভাব্রিনকে ফাঁসি দিলে কিছু ক্ষতি নেই। কিন্তু এই অফিসারটিকেও একটু জেরা করা বোধ হয় অনুচিত কাজ হবে না। ও কেন এখানে এসেছে? তোমাকে যদি ও সম্রাট বলে স্বীকার নাই করে, তবে তোমার কাছে ও সুবিচার চাইতে এসেছে কেন? আর যদি ও তোমাকে সম্রাট বলে স্বীকার করে তাহলে যারা তোমার জাত-শত্রু তাদের দলে মিশে ওরেনবুর্গে এতদিন ও কী করছিল? তুমি যদি বলো তো ওকে আমি সদরে নিয়ে যাই, তারপর গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দেখি। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, ওরেনবুর্গের কর্তারা ওকে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে।'

আমার মনে হল যে এই বুড়ো শয়তানটার যুক্তি সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। বুঝতে পারলাম এবার কাদের হাতে এসে পড়েছি; আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার এই অস্বস্তি পুগাচেভ লক্ষ্য করেছে। আমার দিকে চোখ টিপে সে জিজ্ঞেস করল, 'কথাগুলো শুনলে তো? আমার তো মনে হয়, আমার ফিল্ড্-মার্শাল সত্যি কথাই বলেছে। তুমি কী বলো?'

বিদ্রূপের সুরে-বলা পুগাচেভের কথাগুলি শুনে আমার সাহস ফিরে এল। শান্ত স্বরে আমি জবাব দিলাম যে আমি পুগাচেভের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছি, সুতরাং পুগাচেভ আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে।

পুগাচেভ বলল, 'বেশ কথা। আচ্ছা এবার আমাকে বলো তো, তোমাদের ওই শহরটার অবস্থা এখন কী রকম?'

আমি বললাম, 'অবস্থা ভালো, ঈশ্বরের দয়ায় ওখানে কোনো গোলমাল নেই।'

পুগাচেভ বলে উঠল, 'অবস্থা ভালো! বলছ কী তুমি! ওখানে তো লোকে না খেয়ে মরছে!'

ভুয়ো-জারের কথাটা সত্যি, কিন্তু আমি যে আনুগত্যের শপথ নিয়েছি, তার মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে। সুতরাং আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম যে না খেতে পেয়ে মরার কথাটা নেহাতই গুজব কারণ ওরেনবুর্গে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান আছে।

এবার বুড়ো কথা বলল, 'দেখছ তো, ও তোমার মুখের ওপরে মিথ্যে কথা বলছে। শহর থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তারা সবাই একবাক্যে বলেছে যে ওরেনবুর্গে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী চলছে, লোকে মরা জন্তুর মাংস খেয়ে দিন কাটায়, তাও পাওয়া যায় না, পেলে বর্তে যায় সবাই। আর ও বলছে, শহরে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান আছে। যদি তুমি শ্‌ভাব্রিনের ফাঁসি দিতে চাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই একই ফাঁসিকাঠে এই মুখফোড় ছোকরাকেও ঝুলিয়ে দাও। তাহলে আর দুজনের কারও মনে কোনো ঈর্ষা থাকবে না।'

হতকুচ্ছিৎ বুড়োলোকটার কথাবার্তা পুগাচেভের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে বলে মনে হল। কপাল ভালো বলতে হবে যে ঠিক এই সময়ে খ্লপুশা আপত্তি করল সঙ্গীর কথায়। বলল, 'খুব হয়েছে নাউমিচ, এবার থামো তো বাপু। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, পৃথিবী শুদ্ধ লোককে গলা টিপে মারলে বা ফাঁসিতে লটকালে তুমি খুশি হও। কি যে মহাবীর তুমি? দেখলে মনে হয় ধড়ে প্রাণ নেই। ঘাটের মড়া ছাড়া কিছু নও। তবুও তোমার শুধু চিন্তা কী করে অন্য সবাইকে যমের বাড়িতে পাঠানো যায়! রক্তপাত কি কিছু কম করেছ?'

বেলোবরদভ সমানে জবাব দিল, 'আর তুমি ভাবো নিজেকে কী? সাধুপুরুষ? তা হঠাৎ তোমার প্রাণে এমন দয়া উথ্‌লিয়ে উঠল যে?'

খ্লপুশা জবাব দিল, 'আমি তো পাপী আছিই, তা আমি জানি। এই হাত দিয়ে' (এই বলে সে আস্তিন গুটিয়ে থ্যাবড়া হাতের মুঠি পাকিয়ে লোমশ হাতখানা বার করল) 'এই হাত দিয়ে অনেক খ্রীষ্টানের রক্তপাত করেছি।

কিন্তু তাই বলে অতিথিদের খুন করিনি, খুন করেছি শত্রুদের। আমি মানুষ খুন করি চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বা গভীর জঙ্গলের মধ্যে! মানুষ যখন ঘরের মধ্যে চুল্লির পাশে বসে বিশ্রাম করে তখন তাকে আমি খুন করি না। আমি খুন করি লাঠি কিংবা কুড়ুলের ঘায়ে, মেয়েমানুষের মতো গুজগুজ ফুসফুস করে খুন করি না।'

বুড়ো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'খাঁদা!'

খ্লপুশা চিৎকার করে উঠল, 'ধাড়ী ইঁদুর, বিড়বিড় করে কি বলা হচ্ছে শুনি? একটু সবুর করো, খাঁদা নাক কাকে বলে সেটা তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়ব। তোমার পালাও আসবে। ভগবান করুন, চিমটের গন্ধটা কেমন লাগে তা যেন টের পেতে হয়। যতোদিন সেই সময় না আসে ততোদিন একটু সমঝে চলো — নইলে তোমার দাড়ি উপ্‌ড়িয়ে ফেলব।'

ভারিক্কি চালে পুগাচেভ ঘোষণা করল, 'জেনারেল মশাইরা, আপনাদের কথা কাটাকাটি বন্ধ করুন! ওরেনবুর্গের কুকুরগুলোকে যদি একসঙ্গে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে — তাতে কিছু আসবে না। কিন্তু আমাদের এখানকার কুকুরগুলো যদি খেয়োখেয়ি করে তাহলেই ক্ষতি আছে। বাস, এবার আপনারা মিটমাট করে ফেলুন।'

খ্লপুশা ও বেলোবরদভ মুখ ভার করে নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বুঝতে পারলাম, কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। এভাবে চলতে দিলে ব্যাপারটা আমার পক্ষেই অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে, এমন আশংকা আছে। পুগাচেভের দিকে ফিরে তাকিয়ে খুশির সুরে আমি বললাম, 'ও, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, ভেড়ার চামড়ার কোট ও ঘোড়াটার জন্যে তোমার ধন্যবাদ পাওনা আছে। তোমার সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই শহরে পোঁছতে পারতাম না। শীতে জমে গিয়ে পথেই মরে থাকতাম।'

আমার ফিকিরে কাজ হল। পুগাচেভ খুশি হয়ে উঠল। চোখ টিপে ভুরু পাকিয়ে সে বলল, 'দান করলেই প্রতিদান মিলে। এবার আমাকে বলো তো দেখি, শ্‌ভাব্রিন যে মেয়েটির ওপরে দুর্ব্যবহার করেছে সে তোমার কে হয়? মেয়েটিকে মন দিয়ে বসোনি তো? এ্যাঁ?'

'সে আমার বাগ্‌দত্তা,' আবহাওয়ার পরিবর্তনটা আমার অনুকূলে যাচ্ছে দেখে এবং সত্য গোপন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বুঝতে পেরে আমি বললাম।

পুগাচেভ বলল, 'তোমার বাগ্‌দত্তা! একথা আমাকে আগে বলনি কেন? আমরা তোমার বিয়ে দেব, তোমার বিয়েতে ভোজ খাব।' তারপর বেলোবরদভের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'শোন ফিল্‌ড্‌-মার্শাল! আমরা দুজনে পুরনো বন্ধু। এসো এবার সকলে মিলে রাতের খাওয়া খেতে বসি। সকাল হলেই বুদ্ধি খোলে। কাল সকালে ঠিক করা যাবে, আমার বন্ধুকে নিয়ে কী করা যায়।'

আমার প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শনের প্রস্তাবে রাজি না হতে পারলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু উপায় নেই। দুটি কসাক তরুণী — এই বাড়ির মালিকেরই দুই মেয়ে — একটা সাদা কাপড় বিছিয়েছে টেবিলের ওপরে; নিয়ে এসেছে রুটি, মাছের ঝোল, কয়েক বোতল ভদ্‌কা ও বীয়ার। ঘটনাচক্রে আবার আমাকে পুগাচেভ ও তার ভীষণ সঙ্গীদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খেতে হল।

পানাহারের হুল্লোড় চলল অনেক রাত পর্যন্ত। আমি ছিলাম অনিচ্ছুক দর্শক। শেষকালে একসময়ে মদের নেশায় চুর হয়ে গেল আমার সঙ্গীরা। পুগাচেভ চেয়ারে বসে বসেই ঢুলছে। তখন সঙ্গীরা উঠে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে আমাকে বেরিয়ে আসতে বলল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি ওদের সঙ্গে চললাম। খ্লপুশার হুকুমে শান্ত্রীরা আমাকে নিয়ে গেল সদরে। সাভেলিচ ছিল সেখানে। সেখানেই সারা রাত তালাবন্ধ করে রাখা হল আমাদের। আমার খুড়োটি এতসব কাণ্ডকারখানা ঘটতে দেখে এমন থ' হয়ে গেছে যে আমাকে একটা প্রশ্নও করল না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়েই বহুক্ষণ ধরে গোঙাল আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। শেষকালে তার নাক ডাকতে শুরু করল। আমি নিজে এতসব চিন্তায় ডুবে থাকলাম যে সারারাত ঘুম এল না আমার চোখে।

পরদিন সকালে পুগাচেভ ডেকে পাঠাল আমাকে। আমি তার কাছে গেলাম। দরজার সামনে একটা স্লেজগাড়ি দাঁড়িয়ে, তিনটে তাতার ঘোড়া জোড়া হয়েছে গাড়ির সঙ্গে। রাস্তায় মানুষের ভিড়। অলিন্দে পুগাচেভের সঙ্গে আমার দেখা হল। ফারের কিনার দেওয়া কোট গায়ে দিয়ে, মাথায় কিরগিজ টুপি পরে

ভ্রমণের উপযুক্ত পোশাক পরেছে সে। তার গত সন্ধ্যার সঙ্গীরা ঘিরে আছে তাকে, তাদের সকলেরই এখন অনুগতভাব। আগের দিন সন্ধ্যায় আমি যে দৃশ্য দেখেছি তার সঙ্গে এ দৃশ্যের প্রচণ্ড একটা পার্থক্য রয়েছে। পুগাচেভ সহাস্যে আমাকে সম্ভাষণ জানাল, তারপর স্লেজগাড়িতে উঠতে বলল আমাকে।

গাড়িতে উঠে আমরা বসলাম। একজন চওড়া-কাঁধ তাতার লোক তিন ঘোড়ার স্লেজটা চালাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। পুগাচেভ তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেলোগর্স্ক কেল্লায় চলো!' আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। ঘোড়াগুলো চলতে শুরু করে, টিং টিং শব্দে ঘণ্টা বাজে। বরফের ওপর দিয়ে উড়ে চলে স্লেজগাড়ি...।

'থাম! থাম!' কে যেন চিৎকার করছে। গলাটা আমার খুবই পরিচিত। শুনে আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাভেলিচ ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকে আসছে। পুগাচেভের হুকুমে গাড়ি থেমে গেল। সাভেলিচ বলল, 'দাদাবাবু, এই বুড়ো বয়সে আমাকে আর ফেলে যেও না এই শয়তা...' পুগাচেভ বলল, 'কী হে ধাড়ী ইঁদুর! ভগবানের দয়ায় আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল। যাও, কোচোয়ানের পাশে বসো গিয়ে।'

উঠে বসে সাভেলিচ বলল, 'ধন্যবাদ হুজুর! তুমি আমার বাপ, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে! এই বুড়ো মানুষটাকে দয়া করবার জন্যে ভগবান তোমাকে একশো বছর পরমায়ু দিন! যতোদিন বেঁচে থাকব, তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি প্রার্থনা করব। আর কোনোদিন তোমার সামনে খরগোশের চামড়ার কোটের কথা তুলব না।'

খরগোশের চামড়ার কোটের কথাটা কানে গেলে পুগাচেভ হয়তো বাস্তবিকই চটে উঠতে পারত। কিন্তু কপাল ভালো বলতে হবে, হয় সে সাভেলিচের কথা শুনতেই পায়নি কিংবা এই অসঙ্গত ইঙ্গিতকে অগ্রাহ্য করেছে। ঘোড়া ছুটে চলেছে, রাস্তার লোকেরা থেমে গিয়ে নিচু হয়ে প্রণাম করছে, মাথা নেড়ে রাস্তার দুধারের জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছে পুগাচেভ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গ্রামের বাইরে চলে এলাম। মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে আমাদের স্লেজগাড়ি ছুটে চলল।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের ভাব কী হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার সঙ্গে যে মেয়েটির দেখা হবে, তাকে আবার কোনো দিন দেখতে পাব সে-আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখা হওয়ার মুহূর্তটির চিত্র কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম... আর যে মানুষটির হাতে আমার ভাগ্য নির্ভর করছে, ভাবলাম তার কথাও। পর পর কয়েকটি অস্বাভাবিক ঘটনাসূত্রে এই মানুষটির সঙ্গে আমার এক রহস্যজনক যোগাযোগ ঘটে গেছে। মনে পড়ছে তার নির্বিকার হিংস্রতা ও রক্তলোলুপ অভ্যেসের কথা। সে-ই কিনা হতে চলেছে আমার প্রেমিকার ত্রাণকর্তা। পুগাচেভ জানে না, ক্যাপ্টেন মিরোনভের কন্যা ও। নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে না দেখে শ্ভাব্রিন হয়তো ওর সত্যকার পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে। হয়তো অন্য কোনো উপায়ে খবরটা জেনে ফেলতে পারে পুগাচেভ... তা যদি হয় তো মারিয়া ইভানভনার কপালে কী আছে কে জানে! আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমপ্রবাহ নেমে গেল। খাড়া হয়ে উঠল গায়ের লোম...

'কী ভাবছ?' পুগাচেভ আমাকে জিজ্ঞেস করল। তার এই প্রশ্ন শুনে আমার চিন্তায় বাধা পড়ল।

আমি বললাম, 'ভাবনার কি আর শেষ আছে? আমি অভিজাত বংশের ছেলে, সৈন্য বাহিনীর অফিসার, কালও আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আর আজ কিনা আমাকে একই গাড়িতে তোমার পাশে বসে যেতে হচ্ছে আর আমার সমস্ত জীবনের সুখ নির্ভর করছে তোমারই ওপরে।'

পুগাচেভ বলল, 'তাতে কী! তোমার ভয় করছে নাকি?'

জবাবে আমি বললাম, পুগাচেভ একবার যখন আমাকে ক্ষমা করেছে, তখন আমার আশা আছে যে তার ক্ষমাই শুধু আমি পাব না, সাহায্যও পাব।

ভুয়ো-জার বলে উঠল, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ! একেবারে ঠিক কথা! আমার দলের নওজোয়ানরা তোমার দিকে কী-ভাবে তাকিয়েছিল তা তুমি নিজেই দেখেছ। এই তো আজও বুড়োটা হলফ করে বলছিল যে তুমি হচ্ছ গোয়েন্দা এবং সেজন্যে তোমাকে শাস্তি ও ফাঁসি দেওয়া উচিত।' সাভেলিচ ও তাতার লোকটা যাতে শুনতে না পায়, এমনিভাবে গলা নামিয়ে তারপর সে বলল,

'কিন্তু আমি রাজি হইনি। তুমি যে আমাকে একগ্লাস ভদ্‌কা ও খরগোশের চামড়ার কোট দিয়েছিলে তা আমি ভুলিনি। দেখছ তো, তোমার দলের লোকরা যতোই আমাকে রক্তলোলুপ দানব বলুক না কেন, আসলে আমি তা নই।'

বেলোগর্স্ক কেল্লা দখলের সময়কার দৃশ্য আমি ভুলিনি। কিন্তু পুগাচেভের এই উক্তির প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে না করে আমি চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুগাচেভ জিজ্ঞেস করল, 'ওরেনবুর্গের লোকরা আমার সম্পর্কে কী বলে?'

'বলে যে তোমার সঙ্গে যুঝে ওঠাটা সহজ ব্যাপার নয়। এ তো আর বলবার কিছু নেই: নিজেকে তুমি জানিয়ে ছেড়েছ।'

ভুয়ো-জারের চোখেমুখে খুশিভরা গর্বের হাসি ফুটে উঠেছে। উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। কী করে লড়াই করতে হয় তা আমি জানি। য়ুজেয়েভায় যে যুদ্ধ হয়েছিল তার কথা কি ওরেনবুর্গের লোকরা জানে? চল্লিশ জন জেনারেল খুন হয়, চারটি বাহিনী বন্দী হয়। ভাবছো কি তুমি: প্রুসিয়ার রাজাও আমার সঙ্গে এ'টে উঠতে পারবে না — কী বলো?'

শয়তানটাকে এভাবে দেমাক জাহির করতে দেখে আমি কৌতুক বোধ করলাম। 'নিজের সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? আচ্ছা, তুমি কি মনে করো যে ফ্রিদরিখকেও তুমি হটিয়ে দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ফিওদর ফিওদরভিচের কথা বলছ? [১৮] কেন পারব না? তোমাদের জেনারেলদের আমি হটিয়ে দিয়েছি আর ওই লোকটাকে তোমাদের জেনারেলরাই হারিয়ে দিয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে আমি হারিনি। কিছুদিন সবুর করেই দেখো না, কেমন করে মস্কোয় গিয়ে পে'ছিই।'

'তুমি কি মস্কোতে অভিযান করতে চাও?'

ভুয়ো-জার চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর চাপা স্বরে বলল সে, 'ভগবান জানেন! আমার পথ সরু, আমার স্বাধীনতা অল্প। আমার দলের লোকরা সব সময়ে চালাকি শিখছে, তারা চোরের দল। ওদের সামলে চলতে হয় সব সময়ে। আমি জানি, আমি প্রথম ঠোক্কর খেলেই আমার মাথা বিক্রি করে ওরা নিজেদের মাথা বাঁচাবে।'

আমি বললাম, 'তাহলেই দেখো! তার চেয়ে সময় থাকতে দল থেকে সরে আসা এবং সম্রাজ্ঞীর কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করাই ভালো নয় কি?'

তিক্ত হাসি হেসে পুগাচেভ বলল, 'না, অনুশোচনা করার সময় আর নেই। বড়ো দেরি হয়ে গেছে। ক্ষমা-ভিক্ষা চাওয়াটা আমার জীবনে আর ঘটে উঠবে না। তার চেয়ে যে পথে চলতে শুরু করেছি সেই পথেই চলব। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? হয়তো আমি সফল হতে পারব। জানো তো, গ্রিশ্‌কা অত্রেপিয়েভ মস্কোয় রাজত্ব করে গেছে।'

'তুমি জানো তার জীবনের পরিণতি কী হয়েছিল? তাকে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তার মাথা কেটে ফেলা হয়, তারপর তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, আর ছাইগুলোকে কামানের নলে ঢুকিয়ে কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হয় আকাশে।'

'তাহলে শোনো,' এক বন্য আবেগে পুগাচেভ বলে উঠল, 'আমি যখন শিশু তখন একজন বুড়ী কাল্‌মিক আমাকে একটি গল্প শুনিয়েছিল। সেই গল্পটি তোমাকে বলব। একবার এক ঈগলপাখি একটা কাককে জিজ্ঞেস করে, ওহে কাক, তুমি এই পৃথিবীতে তিনশো বছর বেঁচে আছ, আর আমি মাত্র তেত্রিশ বছর — এটা কি করে সম্ভব হল বলো দেখি? কাক জবাব দেয়, প্রভু, তার কারণ হচ্ছে এই — তুমি জ্যান্ত প্রাণীর রক্ত খাও আর আমি মরা প্রাণীর মাংস খাই। তাই শুনে ঈগলপাখি মনে মনে ভাবে, ঠিক আছে, কাক যা খায় এবার আমিও তাই খাব। বেশ কথা। ঈগল আর কাক তো একসঙ্গে উড়ে চলেছে। এক জায়গায় দেখে একটা মরা ঘোড়া পড়ে আছে। দুজনেই নেমে এসে ঘোড়ার মাংস ঠোকরাতে শুরু করে। কাক এক-একবার মাংস ঠোকরায় আর মাংসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। ঈগলপাখি একবার ঠোকরায়, দুবার ঠোকরায়, তারপর ডানা ঝাপটিয়ে কাককে বলে, ভাই কাক, মরা প্রাণীর মাংস খেয়ে তিনশো বছর বাঁচার চেয়ে জ্যান্ত প্রাণীর রক্ত একবারমাত্র খেয়ে ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়াটা ঢের ভালো। কাল্‌মিক স্ত্রীলোকটির গল্প কেমন লাগল তোমার?'

আমি বললাম, 'খুবই চতুর গল্প! কিন্তু আমার তো মনে হয়, খুন আর লুটপাট করে বেঁচে থাকাটা মরা প্রাণীর মাংস ঠোকরানোর মতোই।'

পুগাচেভ অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, কিন্তু কোনো কথা বলল না। নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে দুজনেই চুপ করে গেলাম। তাতার লোকটি বিষণ্ণ সুরের গান গাইছে। কোচোয়ানের আসনে বসে বসে ঢুলছে সাভেলিচ। শীতকালের মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে স্লেজগাড়ি... হঠাৎ এক সময়ে সামনের দিকে দেখা গেল ইয়াইক নদীর খাড়া পাড়ের ওপরে সেই গ্রাম, গ্রামের ঘণ্টাঘর আর খুঁটির বেড়া। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাদের গাড়ি বেলোগর্স্ক কেল্লায় ঢুকল।

•

দ্বাদশ অধ্যায়

অনাথা

আমাদের আপেল গাছের
নেই কো কচি ডাল, নেই কো মাথার চূড়ো;
আমাদের রাজকুমারীর
নেই কো বাবা, নেই কো মা।
যে সাজাবে কনের সাজে,
যে করবে আশীর্বাদ।

বিয়ের গান

স্লেজগাড়ি এসে থামল অধিনায়কের বাড়ির অলিন্দে। ঘণ্টার শব্দ শুনেই সবাই বুঝতে পেরেছে যে স্লেজগাড়িটা পুগাচেভের। কাজেই সবাই ভিড় করে এসেছে আমাদের পিছনে পিছনে। ভুয়ো-জারকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বাইরে এল শ্ভাব্রিন। পরনে কসাক ধরণের পোশাক, মুখে দাড়ি গজিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকটা পুগাচেভের হাত ধরে স্লেজগাড়ি থেকে নামাল। এমন ভাব করছে যেন সে পুগাচেভের দাসানুদাস, পুগাচেভ এসেছে বলে সে যেন ভারি খুশি, পুগাচেভের প্রতি সে যেন একান্ত অনুগত। আমার ওপর চোখ পড়তেই একটু যেন বেসামাল হয়ে গেল, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তাহলে তুমিও আমাদের দলে এসে গেছ! আগেই পারতে!' আমি একটিও কথা না বলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

ঘরে এসে ঢুকলাম। সেই পরিচিত ঘর, অতীত দিনের বিষণ্ণ স্মৃতিচিহ্নের মতো অধিনায়কের ডিপ্লোমাটা তখনো দেওয়ালে ঝুলছে। দেখে আমার বুকের ভিতরটায় যন্ত্রণা হতে লাগল। যে সোফাটিতে বসে ইভান কুজমিচ স্ত্রীর প্যানপ্যানানি শুনতেন আর ঢুলতেন, সেই একই সোফায় বসেছে পুগাচেভ।

শ্‌ভাব্রিন ভদ্‌কা নিয়ে এসেছে পুগাচেভের জন্যে। একগ্লাস ভদ্‌কা খেয়ে পুগাচেভ আমাকে দেখিয়ে শ্‌ভাব্রিনকে বলল, 'ওঁকেও অতিথিসেবা করো।' শ্‌ভাব্রিন ট্রে হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি এই দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। শ্‌ভাব্রিনকে দেখে বোঝা গেল, সে অস্বস্তি বোধ করছে। সন্দেহ নেই যে তার সহজাত বোধশক্তি থেকে সে বুঝে নিতে পেরেছে, পুগাচেভ তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। পুগাচেভের সামনে কেঁদোর মতো হয়ে গিয়েছিল শ্‌ভাব্রিন আর মাঝে মাঝে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে। পুগাচেভ নানা বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে — কেল্লার অবস্থা, শত্রুসৈন্য সম্পর্কে গুজব ইত্যাদি। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'বাপু হে, যে তরুণীটিকে তুমি আটক করেছ, সে কে বলতো শুনি? তাকে আমি একবার দেখতে চাই।'

মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল শ্‌ভাব্রিন। আমতা আমতা করে বলল, 'তাকে আমি আটক করিনি, হুজুর। তার খুব অসুখ। নিজের ঘরে আছে সে।'

উঠে দাঁড়িয়ে পুগাচেভ বলল, 'তাহলে চলো তার ঘরেই যাওয়া যাক।' পুগাচেভের কথা অমান্য করার সাহস শ্‌ভাব্রিনের নেই, পুগাচেভকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মারিয়া ইভানভনার শোবার ঘরের দিকে। পিছনে পিছনে আমিও হাজির হলাম।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্‌ভাব্রিন বলল, 'হুজুর, আপনি আমাকে যা খুশি হুকুম করতে পারেন। আমি নিশ্চয়ই মেনে চলব। কিন্তু একজন বাইরের লোককে আমার স্ত্রীর ঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

দারুণ আতঙ্কে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কী, বিয়ে হয়ে গেছে তোমার!' সেই মুহূর্তে লোকটাকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতাম।

'চুপ! এটা আমার ব্যাপার।' বলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে শ্‌ভাব্রিনের দিকে ফিরে পুগাচেভ বলতে লাগল, 'ওসব চালাকি রেখে দাও। তোমার ওজর আপত্তি আমি শুনতে রাজি নই। মেয়েটি তোমার স্ত্রী হোক বা না হোক, যাকে খুশি তাকে আমি মেয়েটির কাছে নিয়ে যাব। তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

ঘরের দরজার সামনে এসে শ্‌ভাব্রিন আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাঙা ভাঙা

আর্তস্বরে বলে উঠল, 'হুজুর, আপনাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, তিনদিন ধরে মেয়েটি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে আর প্রলাপ বকছে।'

'দরজা খোলো,' পুগাচেভ বলল।

শ্ভাব্রিন পকেট হাতড়ায়, আর বলে যে চাবি সে সঙ্গে আনেনি। পুগাচেভ লাথি মারল দরজায়। তালা ভেঙে দরজা খুলে গেল। আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকলাম।

ঘরের মধ্যে একবার তাকিয়ে দেখেই আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। দীনহীন কৃষক-নারীর বেশে মারিয়া ইভানভনা মেঝের ওপরে বসে আছে, রোগা ফ্যাকাশে চেহারা, উষ্‌কো-খুষ্‌কো চুল। পাশে একঘটি জল আর ঘটির ওপরে এক চাব্‌ড়া রুটি। আমাকে দেখে সে শিউরে চিৎকার করল। আমার তখন কী অবস্থা হয়েছিল, কিছুই মনে নেই।

শ্ভাব্রিনের দিকে তাকিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গের হাসি হেসে পুগাচেভ বলল, 'বাঃ বাঃ, চমৎকার এক হাসপাতাল বানিয়ে রেখেছে দেখছি!' তারপর মারিয়া ইভানভনার কাছে গিয়ে বলল, 'লক্ষ্মীটি, বলো তো শুনি তোমার স্বামী কেন তোমাকে শাস্তি দিয়েছে? কী দোষ করেছিলে তুমি?'

মারিয়া ইভানভনা পুনরুক্তি করল, 'স্বামী? ওই লোকটা আমার স্বামী নয়। আমি কিছুতেও ওর স্ত্রী হতে পারব না। আমি পণ করেছি যে আমি মরব। মরবই আমি, কেউ যদি আমাকে উদ্ধার না করতে পারে।'

শ্ভাব্রিনের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুগাচেভ বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয় — আমাকে ধাপ্পা দিতে চাও! জানো তুমি, অকর্মার ধাড়ী, কী তোমার যোগ্য শাস্তি?'

শ্ভাব্রিন নতজানু হয়ে বসে পড়ল... দেখে আমার সমস্ত ঘৃণা ও ক্রোধ পরিণত হল অবজ্ঞায়। এক আইনভঙ্গকারী পলাতক কসাকের পায়ের তলায় লুটোপাটি খাচ্ছে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক — দেখে বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। পুগাচেভ একটু নরম হয়েছে, শ্ভাব্রিনকে সে বলল, 'তোমাকে এবার ক্ষমা করছি। কিন্তু জেনে রাখ এই শাস্তি তোলা থাকবে। আবার যদি তোমার নামে কোনো দিন কিছু শুনি তাহলে আর কিছুতেই রেহাই পাবে না।' তারপর মারিয়া ইভানভনার

দিকে তাকিয়ে স্নেহের স্বরে বলল, 'আর ভয় নেই বেটী। রাঙা কন্যে, আমি মুক্তি দিলাম তোমার, আমি রাজা।'

চকিতে মুখ তুলে তাকাল মারিয়া ইভানভনা। বুঝতে পেরেছে তার সামনে যে-লোকটি দাঁড়িয়ে, সে-ই খুন করেছে তার বাপ-মাকে। দু-হাতে মুখ ঢেকে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি ছুটে গেলাম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পুরনো বন্ধু পালাশা কোনো দিকে দৃকপাত না করে সাহসে ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। প্রভুকন্যার শুশ্রূষার কাজে লেগে গেল সে। পুগাচেভ বেরিয়ে এল। শ্ভাব্রিন আর আমি নেমে এলাম তার পিছনে পিছনে বসবার ঘরে।

হাসতে হাসতে পুগাচেভ বলল, 'এবার বলো কী করা যায় মাননীয় অতিথি? সুন্দরীকে তো আমরা উদ্ধার করেছি, এবার তাহলে পাদ্রিকে ডেকে পাঠাই, সে এসে তার ভাইঝিকে সম্প্রদান করুক। বলো, রাজি তো? আমি হব বরকর্তা, শ্ভাব্রিন হবে বরের বন্ধু! ঢালো মদ, চালাও পালা, দরজায় দাও তালা।'

এতক্ষণ আমার যা ভয় ছিল তা বাস্তবে পরিণত হল এবার। পুগাচেভের প্রস্তাব শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে শ্ভাব্রিন উন্মত্তের মতো চিৎকার করে উঠল, 'হুজুর, আপনার কাছে মিথ্যে বলা আমার অপরাধ হয়েছিল। কিন্তু গ্রিনেভ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই মেয়েটি পাদ্রির ভাইঝি নয়। এ হচ্ছে, কেল্লা দখলের সময়ে যাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, সেই ইভান মিরোনভের মেয়ে।'

আগুনভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল পুগাচেভ। বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কী?'

দৃঢ় স্বরে আমি জবাব দিলাম, 'শ্ভাব্রিন সত্যি কথাই বলেছে।'

পুগাচেভের মুখটা কালো হয়ে উঠল। সে মন্তব্য করল, 'কই আগে তো বলনি।'

'তুমি নিজেই বিবেচনা করে দেখো,' আমি উত্তর দিলাম, 'তোমার দলের লোকদের সামনে বলতে পারতাম কিনা মিরোনভের মেয়ে বেঁচে আছে। তাহলে আর তাকে কিছুতেই বাঁচানো যেত না। সবাই মিলে তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলত।'

পুগাচেভ হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক কথা, আমার মাতাল বজ্জাতগুলো

সে-অবস্থায় কিছুতেই মেয়েটিকে রেহাই দিত না। পাদ্রির বৌ মিথ্যে কথা বলে উচিত কাজই করেছিল।'

পুগাচেভ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে আমি বললাম, 'আমার কথা শোন। জানি না কী বলে তোমায় ডাকব, জানতেও চাই না...। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার বিনিময়ে হাসিমুখে আমার জীবন দিয়ে প্রতিদান দিতে পারি। শুধু যেটা আমার সম্মান, আমার খ্রীষ্টীয় বিবেকের পরিপন্থী সেটা তুমি দাবি কোরো না। তুমি আমার উপকারক, যখন শুরু করেছ তখন সেই ভাবেই শেষ হতে দাও: এই অনাথাকে ও আমাকে মুক্তি দাও। ভগবান যেদিকে নিয়ে যেতে চান সেদিকেই আমরা চলে যাই। আর তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আর তোমার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, যতোদিন আমরা বেঁচে থাকব প্রতিটি দিন তোমার পাপী আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করব...।'

আমার কথা শুনে কঠোর-হৃদয় পুগাচেভ বিচলিত হয়ে পড়েছে যেন। সে বলল, 'তোমার যেমন অভিরুচি করো। আমি যাকে শাস্তি দিই, শাস্তি তাকে পেতেই হয়। আমি যখন ক্ষমা করি, তারও অন্যথা হয় না। এই হচ্ছে আমার স্বভাব। মেয়েটিকে তুমি নিয়ে যাও। যেখানে খুশি তুমি যেতে পার। ভগবান তোমাদের ভালোবাসা ও সুবুদ্ধি দিন!'

এই বলে সে শ্ভাব্রিনের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ জারি করল যেন আমাকে একটা হুকুমনামা দেওয়া হয় যা নিয়ে আমি পুগাচেভের এলাকায় সমস্ত শহরে ও সমস্ত কেল্লায় অবাধে যাতায়াত করতে পারি। শ্ভাব্রিন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে পাথর হয়ে গেছে মনে হয়। তারপর পুগাচেভ কেল্লা পরিদর্শনে বার হল। শ্ভাব্রিন গেল সঙ্গে। আমাদের যাত্রার তোড়জোড় করতে হবে — এই অজুহাতে আমি রয়ে গেলাম।

দুজনে বেরিয়ে যেতেই ছুটে গেলাম মারিয়া ইভানভনার ঘরের দিকে। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজায় ঘা দিলাম। পালাশার কথা শোনা গেল, 'কে?' নিজের পরিচয় দিলাম আমি। দরজার ওপাশ থেকে মারিয়া ইভানভনার প্রিয় গলার স্বর শোনা গেল, 'পিওতর আন্দ্রেইচ, একটু দাঁড়াও। আমি পোশাক বদলাচ্ছি। আকুলিনা পাম্ফিলভনার বাড়িতে গিয়ে বসো, এক্ষুণি যাচ্ছি আমি।'

মারিয়া ইভানভনার কথামতো আমি গিয়ে হাজির হলাম ফাদার গেরাসিমের বাড়িতে। আমাকে দেখতে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সাভেলিচ আগেই এসে আমার আগমন সংবাদ তাঁদের জানিয়েছে। পাদ্রির বৌ বললেন, 'পিওতর আন্দ্রেইচ, আসুন, আসুন! ভগবানের ইচ্ছেয় আবার আমাদের দেখা হল। তারপর, দিন কাটছেন কেমন? আমরা তো রোজই আপনার কথা আলোচনা করি। আপনি যখন ছিলেন না, সে-সময়ে মারিয়া ইভানভনার কী দুর্ভোগটাই না গেছে। বেচারী! কিন্তু আমাদের বলুন শুনি, পুগাচেভের সঙ্গে আপনার এত খাতির হয়ে গেল কী করে? ও যে কেন আপনাকে এত দিনেও ফাঁসি দেয়নি সেটাই আশ্চর্য। যাই হোক, অন্তত এ জন্যেও শয়তানটাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।' স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়ে ফাদার গেরাসিম বললেন, 'হয়েছে গো হয়েছে। পেটের সমস্ত কথা বার না করলেও চলবে। আল্‌গা জিভ হলেই তো বিপদ — ওতে কখনো মঙ্গল হয় না। পিওতর আন্দ্রেইচ, আসুন, প্রার্থনা করি। বহুকাল পরে আমাদের দেখা হল।'

পাদ্রির বৌ ভাঁড়ার উজাড় করে খেতে দিলেন আমাকে। তাঁর মুখের কথায় কিন্তু একটুও কামাই নেই। তাঁর মুখে শুনলাম, মারিয়া ইভানভনাকে কাছছাড়া করতে কী-ভাবে শ্ভাব্রিন তাঁদের বাধ্য করেছে, তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময়ে কী-ভাবে মারিয়া ইভানভনা কেঁদেছে, কী-ভাবে বন্দিনী অবস্থাতে পালাশার মারফৎ যোগাযোগ হয়েছে তাঁদের সঙ্গে (যাই বলুন, পালাশা মেয়েটা, কিন্তু খুবই চালাক-চতুর, এমন কি সার্জেণ্টটাকে পর্যন্ত ও কী-রকম খুশিমতো নাচায় তা যদি দেখতেন!) কী-ভাবে তিনি আমাকে চিঠি লেখবার জন্যে মারিয়া ইভানভনাকে পরামর্শ দিয়েছেন, এমনি সব কথা। তাঁর কথা শেষ হলে আমিও আমার কাহিনী সংক্ষেপে বললাম। পাদ্রি এবং পাদ্রির বৌ যখন শুনলেন, কী-ভাবে তাঁরা পুগাচেভকে বোকা বানিয়েছিলেন তা পুগাচেভ জেনে ফেলেছে — তখন দুজনেই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। আকুলিনা পাম্‌ফিলভনা বললেন, 'ঈশ্বর আমাদের কৃপা করুন। প্রভুর দয়ায় এই ঝড়ো মেঘ উড়ে যাক। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আলেক্সেই ইভানভিচ কেমন লোক!' এমন সময়ে দরজাটা খুলে গেল। ফ্যাকাশে মুখে হাসি ফুটিয়ে ঘরে ঢুকল

মারিয়া ইভানভনা। দীনহীন কৃষক-নারীর বেশ সে বদলেছে, এখন তার সাজপোশাক আগেকার মতোই সাদাসিধে ও মনোমুগ্ধকর।

আমি ওর হাতটা ধরে নিলাম, বহুক্ষণ একটি কথাও আমি বলতে পারলাম না। আমাদের দুজনেরই হৃদয় এত কান্নায় কান্নায় ভরে আছে যে কথার স্থান নেই সেখানে। গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, তখন দুজনেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা একা। ভুলে গেলাম সবকিছু। প্রাণ ভরে কথা বললাম দুজনে। মারিয়া ইভানভনা আমাকে বলতে লাগল, কেল্লা দখলের পর থেকে ওর জীবনে কী কী ঘটনা ঘটেছে, আর কী ভয়াবহ সেই সব ঘটনা, এবং শ্ভাব্রিনের কার্যকলাপের ফলে কত বিপর্যয় গেছে ওর ওপর দিয়ে। অতীতের সুখী জীবনের কথাও আমাদের মনে পড়ল ...। আমরা দুজনেই কাঁদলাম ...। শেষকালে আমার পরিকল্পনা খুলে বললাম। পুগাচেভের ক্ষমতাধীন এবং শ্ভাব্রিনের শাসন-এলাকা এই কেল্লায় ওকে ফেলে রেখে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবরুদ্ধ শহর ওরেনবুর্গে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাও আপাতত ত্যাগ করতে হবে। সারা পৃথিবীতে আত্মীয় বলতে ওর আর কেউ নেই। আমি প্রস্তাব করলাম যে আমার দেশের বাড়িতে আমার বাপ-মার কাছে ও চলে যাক। প্রথমে ও ইতস্তত করল কারণ ওর প্রতি আমার বাবার বিরূপ মনোভাবের কথা ও জানত এবং তা নিয়ে ওর মনে বেশ ভয়ও ছিল। কিন্তু আমার কথাবার্তায় ওর মনের এই উদ্বেগ শেষ পর্যন্ত কেটে গেল। আমি ওকে বারবার এই বলে আশ্বস্ত করলাম যে দেশের জন্যে যে-যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন তাঁর কন্যাকে আশ্রয় দেওয়া আমার বাবা কর্তব্য বলে মনে করবেন এবং এতে তিনি গৌরব বোধ করবেন। শেষকালে আমি বললাম, 'মারিয়া ইভানভনা, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী বলে মনে করি। অস্বাভাবিক কতকগুলি ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দুজনে চিরকালের জন্য একসঙ্গে বাঁধা পড়েছি। এখন আর কোনো কিছুই আমাদের আলাদা করতে পারবে না।' গভীর সারল্যের সঙ্গে মারিয়া ইভানভনা আমার কথা শুনল, এতটুকু লজ্জা বোধ করল না বা কৃত্রিম প্রতিবাদের ভান করল না। ওর ভাগ্য যে আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে সেই অনুভূতি এল ওর মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও

আরেকবার আমাকে জানিয়ে রাখল যে আমার বাপ-মার অনুমতি হলে তবেই সে আমার স্ত্রী হবে। আমি কোনো আপত্তি করলাম না। গভীর আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা দুজনে দুজনকে চুমু খেলাম। এইভাবে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল আমাদের মধ্যে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সার্জেণ্ট আমাকে দিয়ে গেল হুকুমনামা, স্বাক্ষর করতে গিয়ে পুগাচেভ সেই হুকুমনামায় কয়েকটা আঁচড় কেটে দিয়েছে। সার্জেণ্ট আমাকে বলল যে পুগাচেভ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি গিয়ে দেখলাম, পুগাচেভ রওনা হবার জন্যে তৈরি। এই ভয়ংকর মানুষটি, এই পিশাচ, এক আমি ছাড়া আর সবার সঙ্গে যে এমন দানবের মতো নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তার সঙ্গে বিচ্ছেদের দিনে আমার মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকাশ করে বলাটা আমার পক্ষে একটু শক্ত। কিন্তু সত্যকে গোপন করেই বা লাভ কি? সেই মুহূর্তে লোকটির প্রতি সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গিয়েছিল। প্রবল একটা ইচ্ছে জেগেছিল, ওর ওই দুষ্কৃতিকারী সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্য থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি এবং সময় থাকতে ফাঁসিকাঠ থেকে উদ্ধার করি ওকে। কিন্তু সেখানে শ্‌ভাব্রিন এবং আরও অনেক সব লোক ভিড় করেছিল — সুতরাং এই সমস্ত কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

বন্ধুর মতো আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ভিড়ের মধ্যে আকুলিনা পাম্‌ফিলভনাকে দেখতে পেয়ে পুগাচেভ তাঁর দিকে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে আঙুল তুলে শাসাল। তারপর গাড়িতে উঠে কোচোয়ানকে বের্দার দিকে যাবার নির্দেশ দিল। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে, তখন মাথাটা গাড়ির ভিতর থেকে আরেকবার বার করে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'বিদায়! আবার হয়ত আমাদের দেখা হবে!' দেখা আমাদের হয়েছিল — কিন্তু কী অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে!

পুগাচেভ চলে গেল, বরফঢাকা স্তেপের ওপর দিয়ে দ্রুত ধাবমান ত্রয়কা'র দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমি। ভিড় সরে গেছে। শ্‌ভাব্রিন অন্তর্হিত। পাদ্‌রির বাড়িতে আমি ফিরে গেলাম। আমাদের যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। আর দেরি করাটা ঠিক মনে করলাম না। অধিনায়কের একটা পুরনো স্লেজগাড়িতে

আমাদের জিনিসপত্র বোঝাই করা হল। সঙ্গে সঙ্গে কোচোয়ান ঘোড়া জুতল গাড়ির সঙ্গে। মারিয়া ইভানভনা গেল গির্জার পিছনদিকে যেখানে ওর বাপ-মাকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানে, শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে আসতে। আমিও ওর সঙ্গে যেতে চাইলাম কিন্তু আমাকে অনুরোধ জানাল আমি যেন ওকে একাই যেতে দিই। কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল ও। গাড়ি তৈরি। ফাদার গেরাসিম ও তাঁর স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন বাইরের বারান্দায়। গাড়িতে আমরা তিনজন — মারিয়া ইভানভনা, পালাশা ও আমি। কোচোয়ানের আসনে উঠে বসেছে সাভেলিচ। পাদ্রির স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'বিদায় মারিয়া ইভানভনা, আমার আদরের ধন! বিদায় পিওতর আন্দ্রেইচ, আমার চোখের মণি! আপনাদের যাত্রা সুখের হোক, ভগবান আপনাদের সুখী করুন!' আমরা রওনা হলাম। অধিনায়কের বাড়ির জানলায় শ্ভাব্রিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার চোখেমুখে ক্রূর হিংসা ফুটে বেরোচ্ছে। লাঞ্ছিত শত্রুর সামনে বিজয় উল্লাস দেখাবার ইচ্ছে ছিল না আমার। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তারপর একসময়ে বেরিয়ে এলাম কেল্লার ফটক দিয়ে, বেলোগর্স্ক কেল্লা চিরকালের জন্যে আমাদের পিছনে পড়ে রইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গ্রেপ্তার

'কর্তব্য আমার এই, রাগ করিয়ো না,
কারাগারে লয়ে যেতে হবে জাহাঁপনা।'
'বেশ ত প্রস্তুত আমি, কিন্তু আগে তার আশা
করি শোনা হবে বক্তব্য আমার।' [১৯]

ক্‌নিয়াজনিন

ভালোবাসার পাত্রীর সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে আবার মিলিত হতে পেরেছি — আমার এই সৌভাগ্য প্রায় অবিশ্বাস্য। আজ সকালেও ওর কথা ভেবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছিলাম। নিজেকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, মনে হল সকাল থেকে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে সমস্তটাই যেন একটা ফাঁকা স্বপ্ন। মারিয়া ইভানভনা এক-একবার চিন্তিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে, এক-একবার তাকাচ্ছে রাস্তার দিকে। ও যেন নিজের চিন্তারাজ্যে কিছুতেই একটা শৃংখলা আনতে পারছে না। দুজনেই চুপ করে আছি। দুজনেরই মন ভারাক্রান্ত। অলক্ষ্যে সময় চলে যাচ্ছে। ঘণ্টাদুয়েক বাদে আমরা দেখলাম, সবচেয়ে কাছের কেল্লাতে আমরা এসে পেঁাচেছি। এই কেল্লাটাও পুগাচেভের কর্তৃত্বাধীন। এখানে আমাদের গাড়ির ঘোড়া বদলে নেওয়া হল। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাজা ঘোড়া এনে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল; যে দাড়িওলা কসাকটিকে পুগাচেভ অধিনায়কের পদে প্রমোশন দিয়ে গেছে, সে আমাদের সঙ্গে যে-রকম বিনীত ব্যবহার করল — তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে রাজানুগৃহীত ব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আমাদের কোচোয়ানের বক্‌বকানিটা মাঠে মারা যায়নি।

আবার আমাদের যাত্রা শুরু। এবার গন্তব্য স্থান ছোট একটা শহর।

দাড়িওলা কসাকটি আমাদের জানিয়েছে যে এই শহরে শক্তিশালী একটি বাহিনী মোতায়েন আছে এবং এই বাহিনীটি গিয়ে মিলবে ভুয়ো-জারের বাহিনীর সঙ্গে। শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। শহরে ঢুকবার মুখে শান্ত্রীরা আমাদের থামিয়ে প্রশ্ন করল, 'কে যায়?' বুক ফুলিয়ে কোচোয়ান জবাব দিল, 'জারের বন্ধু এবং তাঁর পত্নী!' তারপরেই কোথা দিয়ে কি হল, হুসার সৈন্যরা ঘিরে ফেলল আমাদের, তাদের হম্বিতম্বি শুনে প্রাণ শুকিয়ে যাবার মতো অবস্থা। গালপাট্টাওলা একজন সার্জেণ্ট-মেজর হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেরিয়ে আয় শয়তানের চেলা! দ্যাখ্-না তোকে আর তোর বৌকে কেমন মজাটা টের পাইয়ে দিই!'

আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। লোকগুলোকে বললাম, তারা আমাকে তাদের অধিনায়কের কাছে নিয়ে চলুক। অফিসার দেখে সৈন্যরা গালিগালাজ বন্ধ করল। সার্জেণ্ট-মেজর আমাকে নিয়ে গেল মেজরের কাছে। সাভেলিচ আমার সঙ্গ ছাড়েনি, আপন মনেই বিড়বিড় করে সে বলছে, 'হুঃ! জারের বন্ধু! এবার বোঝ ঠ্যালা! জলে কুমির ডাঙায় বাঘ! হে ঠাকুর! এসব ঝামেলার কি শেষ হবে?' গাড়িটা পায়ে পায়ে এল আমাদের পিছনে।

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছলাম উজ্জ্বল আলোকিত একটা ঘরে। আমার কাছে পাহারা বসিয়ে সার্জেণ্ট-মেজর গেল রিপোর্ট করতে। মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে জানাল যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় হুজুরের নেই। হুকুম হয়েছে আমাকে নিয়ে জেলে পুরতে আর আমার স্ত্রীকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।

'কী বলছ এসব? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তাঁর?' রাগে অন্ধ হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

সার্জেণ্ট-মেজর জবাব দিল, 'তা আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি হুজুর, যে হুজুরের হুকুম হয়েছে, হুজুরকে ধরে নিয়ে জেলে পুরতে হবে আর হুজুরের বৌকে হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

আমি ছুটে গিয়ে বারান্দায় উঠলাম। শান্ত্রীরা আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল না। সোজা গিয়ে ঢুকলাম একটা ঘরের মধ্যে। সেখানে হুসার বাহিনীর

পাঁচ-ছ-জন অফিসার তাসের জুয়া খেলছে। মেজর বসে আছে টাকা পয়সা আগলিয়ে। মেজরের দিকে তাকিয়ে চিনতে পেরে কী অবাকই না হয়েছিলাম — এ সেই ইভান ইভানভিচ জুরিন — সিম্‌বিস্কের সরাইখানায় একদিন আমার কাছে যে বাজি জিতেছিল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ কী কান্ড! ইভান ইভানভিচ, তোমাকে এখানে দেখব ভাবতেই পারিনি!'

'আরে, পিওতর আন্দ্রেইচ—তুমি!' তুমি এখানে এলে কী করে? কোত্থেকে আসছ? এসো, এসো এক হাত খেলা হবে নাকি?'

'ধন্যবাদ। বরং আমার থাকবার জায়গাটা দেখিয়ে দিলে ভালো হয়।'

'থাকবার জায়গা? কেন, আমার সঙ্গেই থেকে যাও-না?'

'তা হয় না। আমি একা নই।'

'তাতে কি হয়েছে, তোমার বন্ধুও আমার সঙ্গে থাকতে পারে।'

'আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছেন, বন্ধু নয়।'

'মহিলা? মহিলা আবার জোটালে কোত্থেকে হে?' (এই বলে জুরিন এমন অর্থপূর্ণভাবে শিস্‌ দিল যে প্রত্যেকেই হেসে উঠল; আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম।)

জুরিনকে বলে চলে, 'ঠিক আছে। তাই হোক, তোমাকে একটা ঘর দেওয়া হবে। কিন্তু বড়ো আফসোসের কথা...। দুজনে একসঙ্গে থাকলে একটু ফূর্তি করা যেত, যেমন আগের বার করেছিলাম। আচ্ছা এক কাজ করো না হে, পুগাচেভের বান্ধবীটিকে এখানেই আন না কেন? জাঁহাবাজ মেয়েলোক বুঝি? ওকে বলো যে কিচ্ছু ভয় নেই। ভদ্রলোকটি অতি চমৎকার মানুষ, সে তাকে খেয়ে ফেলবে না। আর যদি তেমন সোরগোল করে তবে খানিকটা কড়া দাওয়াই দিয়ে দিলেই চলবে।'

জুরিনেক আমি বললাম, 'এসব কী কথা? কাকে তুমি পুগাচেভের বান্ধবী বলছ? তিনি হচ্ছেন মৃত ক্যাপ্টেন মিরোনভের কন্যা। তাঁকে আমি বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করেছি এবং তাঁকে নিয়ে চলেছি আমার বাবার কাছে। সেখানে আমি তাঁকে রেখে আসব।'

'ও, তাহলে তোমার কথাই একটু আগে আমার কাছে বলে গেছে? ব্যাপারটা কী বলতো শুনি?'

'পরে তোমার কাছে আমি সব কথা খুলে বলব। কিন্তু এখন দোহাই তোমার, যা হোক একটা কিছু বন্দোবস্ত করো যাতে মেয়েটির ভয় কাটে। তোমার হুসারদের কাণ্ড-কারখানা দেখে তিনি ভয়ে আধমরা হয়ে গেছেন।'

জুরিন সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল। যেটুকু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে সেজন্যে ক্ষমা চাইবার জন্যে নিজে বেরিয়ে এল সে। সার্জেণ্ট-মেজরকে সে হুকুম দিল, শহরের সেরা ঘরটিতে যেন মারিয়া ইভানভনার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। আমাকে সে নিজের ঘরেই জায়গা দিল।

রাত্রের খাওয়াদাওয়ার পরে যখন ঘরে আর কেউ রইল না তখন আমি তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনল সে; তারপর আমার কাহিনী বলা শেষ হলে মাথা নেড়ে বলল, 'সবই তো শুনলাম। কিন্তু ভাই, একটা কথা আমার ঠিক মগজে ঢুকছে না — বিয়ে করার হুজ্জতের মধ্যে যেতে চাইছ কেন? সৈন্যদলের অফিসার হিসেবে তোমাকে ভাই একটা খাঁটি কথা বলছি, মনে কোরো না তোমাকে ধাপ্পা দিতে চাই — সত্যি কথাটা কী জান, বিয়ে করাটা অতি জঘন্য ব্যাপার। বৌ আর একপাল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে তোমার কী স্বর্গলাভ হবে শুনি? ওসব ভুলে যাও! আমি বলি কি, ক্যাপ্টেনের মেয়ের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রেখো না। সিম্বির্স্কে যাবার রাস্তা থেকে আমি আপদগুলোকে দূর করেছি, ও রাস্তা এখন নিরাপদ, কালই মেয়েটিকে একাই পাঠিয়ে দাও তোমার বাপ-মার কাছে। আর তুমি নিজে এখানে আমার সৈন্যদলেই থেকে যাও। ওরেনবুর্গে ফিরে যাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। তা করতে গেলে তুমি বিদ্রোহীদের হাতে পড়বে। বারবার দুবার আর সহজে ওদের হাত থেকে ছাড়া পাবে না দু-দিন গেলেই প্রেমের পাগলামি কেটে যাবে, তখন আর খারাপ লাগবে না।'

যদিও জুরিনের মতামতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই, তা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কর্তব্যবোধ ও সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সম্রাজ্ঞীর সেনাদলে আমার উপস্থিতিটা প্রয়োজন। জুরিনের উপদেশ শিরোধার্য

করে আমি স্থির করলাম যে মারিয়া ইভানভনাকে দেশে পাঠিয়ে দেব, আর আমি নিজে থেকে যাব এই বাহিনীতেই।

আমার রাত্রিবেলার শোবার বন্দোবস্ত করবার জন্যে সাভেলিচ এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে আমি বললাম, পরদিন মারিয়া ইভানভনাকে নিয়ে রওনা হবার জন্যে যেন সে প্রস্তুত থাকে। শুনেই সে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে উঠল 'কী বললে দাদাবাবু? তোমাকে ছেড়ে আমি যাব? তাহলে কে তোমার দেখাশোনা করবে? তোমার বাবা-মাই বা কি বলবেন আমাকে?'

আমার এই খুড়োটির একগুঁয়েমি আমার জানা ছিল। সুতরাং আমি ঠিক করলাম যে অকপটে মিষ্টি কথা বলে তাকে স্বমতে নিয়ে আসব। বললাম, 'আর্খিপ সাভেলিচ, বন্ধু আমার! আমার মুখ চেয়ে এই কাজটি করো, এতে আমার খুবই উপকার হবে। এখানে আমার দেখাশোনা করবার জন্যে কোনো লোকের দরকার নেই। কিন্তু মারিয়া ইভানভনাকে যদি তুমি না নিয়ে যাও তাহলে আমি শান্তি পাব না। ওর দেখাশোনা করলেই আমারও দেখাশোনা করা হবে। কারণ আমি একেবারে ঠিক করে ফেলেছি, বিয়ে করার মতো সময় হলেই আমি ওকে বিয়ে করব।'

একথা শুনে সাভেলিচ দুহাত তুলে এমন একটা ভাব করল যেন সে আকাশ থেকে পড়েছে। বলল, 'বিয়ে করবে? দাদাবাবুর আমার এর মধ্যেই বিয়ের চিন্তা শুরু হয়েছে! দাদাবাবু, একথা শুনলে তোমার বাবা কী বলবেন, মা কী বলবেন, ভেবে দেখেছ?'

আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম, 'বাবা-মার মত হবে, নিশ্চয়ই মত হবে। মারিয়া ইভানভনাকে দেখার পর কিছুতেই তাঁরা অমত করতে পারবেন না। এ-ব্যাপারে তোমার ওপরেও আমি খানিকটা নির্ভর করছি। তোমার ওপরে আমার বাপ-মার বিশ্বাস আছে! আমাদের হয়ে তুমিও বলবে — বলবে না?'

বৃদ্ধ বিচলিত হল, 'দাদাবাবু! তোমাকে আমি আর কী বলব? বিয়ের বয়েস অবিশ্যি তোমার হয়নি। কিন্তু মারিয়া ইভানভনা এমন ভালো মেয়ে যে, এই সুযোগ ফসকে যেতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। বেশ, তাই হোক! এই সোনার প্রতিমাকে আমিই আগলে নিয়ে যাব। আর তোমার বাবা-মাকে বিনীতভাবে জানাব যে এমন কন্যের জন্যে যৌতুক না হলেও চলে।'

সাভেলিচকে ধন্যবাদ জানালাম। রাত্রিবেলা শুলাম এসে জুরিনের ঘরে। উৎসাহে ও উত্তেজনায় অবিশ্রান্ত বক্‌বক্ করতে লাগলাম। প্রথম দিকে জুরিন আগ্রহের সঙ্গে আমার মনের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সায় দিয়েছিল কিন্তু ক্রমেই তার মুখের কথা অসংলগ্ন ও স্বল্পতর হয়ে এল। শেষকালে একসময়ে দেখা গেল, আমি যতো কথাই বলি না কেন শুধু তার নাক ডাকে আর তার নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মুখের কথাও বন্ধ হয়ে গেল, এবং আমিও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলাম।

পরদিন সকালে আমি গেলাম মারিয়া ইভানভনার কাছে, ওকে আমার প্রস্তাব জানালাম। প্রস্তাবটি যে অযৌক্তিক নয় তা ও স্বীকার করল এবং আমার মতে সায় দিল। জুরিনের সৈন্যদল সেই দিনই শহর ছেড়ে চলে যাবে সুতরাং দেরি করবার মতো সময় আর নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম। ওর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেড়ে দিলাম সাভেলিচের হাতে এবং ওর হাতে আমার বাবা-মার নামে একটা চিঠি দিলাম। মারিয়া ইভানভনা কাঁদতে লাগল, চাপা স্বরে বলল, 'বিদায়, পিওতর আন্দ্রেইচ। ঈশ্বর জানেন, আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা! কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমার কথা মনে রাখব এবং তোমার মূর্তিই ধ্যান করব।' আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না। আমাদের চারদিকে লোক গিজগিজ করছে; বাইরের লোকের সামনে আমি অনুভূতি প্রকাশ করতে রাজি নই। অবশেষে ও চলে গেল। ভারি মন নিয়ে আমি জুরিনের কাছে ফিরে এলাম, কারও সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছিল না। জুরিন যথাসাধ্য চেষ্টা করল আমাকে চাঙ্গা করে তুলতে, যা হোক একটা কিছু নিয়ে মেতে উঠতে আমার নিজেরও উদ্বেগটা কম নয়। এই অবস্থায় সারাটা দিন কাটল হুল্লোড় আর হুটোপাটির মধ্যে। সন্ধ্যাবেলা শহর ছেড়ে আমরা রওনা হলাম।

তখন ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিক। শীতকাল শেষ হয়ে আসছে। এই শীতকালের জন্যেই সামরিক কার্যকলাপে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, এবার আমাদের জেনারেলরা একসঙ্গে যুক্ত অভিযান করবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। পুগাচেভ এখনো ওরেনবুর্গ অবরোধ করে রেখেছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট

সৈন্যদল এসে অনবরত মিলছে এবং চতুর্দিক থেকে অভিযান শুরু করেছে বিদ্রোহী ঘাঁটির দিকে। যে-সব গ্রাম বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, আমাদের সৈন্যদলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো পদানত হয়েছে। বিদ্রোহীরা চারদিকে পালাতে শুরু করেছে। ঘটনার গতিদ্রুত ও সাফল্যজনক যুদ্ধনিষ্পত্তির ইঙ্গিত বহন করছে।

অল্প দিনের মধ্যেই প্রিন্স গলিৎসিন পুগাচেভকে তাতিশ্চেভ কেল্লা থেকে বিতাড়িত করেন, পুগাচেভের অনুগামীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, ওরেনবুর্গ অবরোধমুক্ত হয়। দেখে মনে হতে থাকে বিদ্রোহকে চূড়ান্তভাবে এবং শেষবারের মতো আঘাত করা গেছে। একই সময়ে জুরিনকে পাঠানো হয় একদল বিদ্রোহী বাশ্‌কিরের বিরুদ্ধে। খবর পেয়েই এই বিদ্রোহীদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, আমরা গিয়ে তাদের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। বসন্তকালে আমরা এসে আটকে গেলাম একটা তাতার গাঁয়ে। নদীগুলো ফুলেফেঁপে উঠেছে, রাস্তা দুর্গম। নিষ্ক্রিয়ভাবে দিন কাটাতে হয় আমাদের আর আমরা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিই যে দুর্বৃত্ত ও বর্বরদের বিরুদ্ধে এই বিরক্তিকর ও অকিঞ্চিৎকর দিন শেষ হবে শীঘ্রই।

কিন্তু পুগাচেভকে ধরা যায় না। সাইবেরিয়া লোহা-কারখানা অঞ্চলে আবির্ভাব হয় তার, নতুন করে দল সংগ্রহ করে, এবং দুষ্কৃতি চালিয়ে যেতে থাকে। আবার গুজব শোনা যায় যে পুগাচেভ বিজয়গর্বে অগ্রসর হচ্ছে। সাইবেরিয়ার কেল্লাগুলির ধ্বংসকার্যের কাহিনী আমাদের কানে আসে। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই খবর আসে যে কাজান বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে এবং ভুয়ো-জার মস্কোর দিকে অভিযান শুরু করেছে। আমাদের সামরিক কর্তারা এতদিন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন, তাঁদের স্থির ধারণা ছিল যে ওই নরকের কীট বিদ্রোহীটার কোনো ক্ষমতাই নেই। এবার তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। জুরিনের ওপর হুকুম হল, সৈন্যদলকে ভল্‌গা নদী পার করিয়ে নিতে হবে।*

---

* এইখানে একটি অধ্যায় ছিল যা পুশকিন পরে বাদ দিয়েছেন। শুধু পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়াতেই এই অধ্যায়টিকে পাওয়া যায়। বর্জিত অধ্যায়টা এই বইয়ের ১৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমাদের অভিযান কি-ভাবে চলে বা যুদ্ধ কি-ভাবে শেষ হয়, সেই বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে আমি যাব না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে জনসাধারণকে চূড়ান্ত দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহীরা যে-সব গ্রাম লুটপাট করে গেছে, সেই-সব গ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হয়। তাদের হাত থেকে হতভাগ্য গ্রামবাসীরা যেটুকু বাঁচিয়েছিল তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরাই গ্রাস করি। কোথাও শাসনব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নেই। জমির মালিকরা জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। চারদিকে দুর্বৃত্তদের রাজত্ব, অবাধে অত্যাচার চলে। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলগুলোর নেতারা শাস্তি দেয় ও ক্ষমা করে নেহাতই খেয়ালখুশি মতো। সমগ্র বিরাট অঞ্চল জুড়ে প্রচণ্ডভাবে আগুন জ্বলতে থাকে এবং অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে ওঠে...। হে ভগবান, রুশদেশের বিদ্রোহ, নির্মম ও নিরর্থক বিদ্রোহ, আমাদের যেন আর কোনো দিন দেখতে না হয়! [২০]

পুগাচেভ পালাল। পুগাচেভের পশ্চাদ্ধাবন করলেন ইভান ইভানভিচ মিখেল্‌সন। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শুনতে পেলাম, পুগাচেভ পরাজিত হয়েছে। শেষকালে জুরিনের কাছে খবর এল ভুয়ো-জারের গ্রেপ্তারের আর সেই সঙ্গে যুদ্ধ থামাবার আদেশ। যুদ্ধ শেষ। এবার আমি আমার বাবা-মার কাছে যেতে পারি। মারিয়া ইভানভনার কাছ থেকে এতদিন আমি এক লাইন সংবাদও পায়নি, আবার মারিয়া ইভানভনাকে দেখতে পাব, আবার বাবা-মার স্নেহালিঙ্গন পাব — এই চিন্তায় আমি একেবারে ডগমগ। ছেলেমানুষের মতো নাচতে শুরু করি। জুরিন হাসে, কাঁধ বাঁকায়, আর বলে, 'বুঝতে পারছি, তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে! যাও বিয়ে করো গিয়ে, ঠ্যালা বুঝবে এখন!'

কিন্তু আমার এই সুখের সঙ্গেও অদ্ভুত একটা অনুভূতি একাকার হয়ে মিশে আছে যেন। যে দুর্বৃত্ত এত নিরীহ লোকের রক্তপাত করেছে তার চিন্তা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না, কিছুতেই ভুলতে পারি না তার আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের কথা। নিজের মনের অশান্তি নিয়ে নিজেই দীর্ঘশ্বাস ফেলি আর বলি, 'ইয়েমেলিয়া! ইয়েমেলিয়া! কেন তুমি বেওনেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে না? কেন বুক পেতে বুলেট নিলে না? তা যদি করতে পারতে তবে সেটাই হত তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো।' নিজের মনের এই অনুভূতি থেকে কিছুতেই

রেহাই পাই না। আমার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে পুগাচেভ যে-ভাবে আমার প্রতি দাক্ষিণ্য বর্ষণ করেছে এবং শয়তান শ্ভাব্রিনের কবল থেকে যে-ভাবে আমার বাগ্দত্তাকে মুক্ত করে দিয়েছে তা আমি ভুলতে পারি না। পুগাচেভের চিন্তার সঙ্গে এইসব চিন্তাও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে।

জুরিন আমাকে ছুটি দিয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি আমার বাড়ির লোকজনের মধ্যে উপস্থিত হতে পারব, আবার দেখতে পাব প্রাণাধিকা মারিয়া ইভানভনাকে...। এমন সময়ে আমার মাথায় হঠাৎ সশব্দে বজ্রপাত হল।

যেদিন আমার রওনা হবার কথা, আমি রওনা হতে চলেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে জুরিন আমার জন্যে নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে এসে হাজির। তার হাতে একটুকরো কাগজ, আর তাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে। আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করে উঠল। অকারণেই কেমন জানি ভয় হতে লাগল আমার। আমার আর্দালিকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে জুরিন আমাকে বলল যে সে আমাকে কিছু বলতে চায়। আতঙ্কিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ব্যাপারটা কি?’ কাগজের টুকরোটা আমার হাতে দিয়ে সে জবাব দিল, ‘ছোটখাটো একটা অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেছে। এই কাগজটা এক্ষুণি আমার হাতে এল — পড়েই দেখ।’ আমি পড়তে শুরু করলাম। একটা গোপন সামরিক আদেশ পাঠানো হয়েছে সমস্ত সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে। তাতে নির্দেশ আছে যে আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয় আর অবিলম্বে পাহারাধীনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাজানে। সেখানে একটি কমিশন পুগাচেভ সম্পর্কিত ব্যাপারে তদন্ত করছে, সেই কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে আমাকে।

কাগজটা আমার হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে যাচ্ছিল। জুরিন বলল, ‘কোনো উপায় নেই। এই আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। মনে হয় পুগাচেভের সঙ্গে তোমার যে খানিকটা দহরম-মহরম ছিল, যে কোনো সূত্রেই হোক সে খবর সরকারী মহলের কানে উঠেছে। আশা করি, এই বিপদ তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং তুমি যে কোনো অন্যায় করোনি তা প্রমাণ করতে পারবে কমিশনের সামনে। হতাশ হয়ো না — এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো।’ বিবেকের দিক থেকে আমি

গ্লানিমুক্ত। আসন্ন বিচারকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু প্রিয়মিলনের মধুর মুহূর্তটিকে হয়ত কয়েকমাসের জন্যেই স্থগিত রাখতে হবে — এই চিন্তাতে, আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। আমার জন্যে গাড়ি তৈরি। জুরিন বন্ধুর মতো আমাকে বিদায় জানাল। গাড়িতে গিয়ে বসলাম আমি। দু-জন হুসার সৈন্য খোলা তলোয়ার নিয়ে বসল আমার দু-পাশে। গাড়ি চলল রাজপথ ধরে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিচার

গুজব ছড়ায় ঝোড়ো আগুনের মতো।

প্রবাদ

এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে ওরেনবুর্গ থেকে কাউকে না বলে-কয়ে চলে আসাটাই আমার একমাত্র অপরাধ। তবে আমার আচরণের সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে — সেদিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। শত্রুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে বারণ করা তো দূরের কথা, বরাবর খুব বেশি রকম উৎসাহই দেওয়া হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হতে পারে অতিরিক্ত আগ্রহ, শৃংখলাভঙ্গ নয়। অপরপক্ষে, পুগাচেভের সঙ্গে যে আমার দহরম-মহরম ছিল তা প্রমাণের জন্যে প্রচুর সাক্ষীসাবুদ পাওয়া যাবে; এবং খুব কম করেও যদি বলা হয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হতে বাধ্য। কী ধরণের প্রশ্ন হতে পারে আর কী ধরণের জবাব দেওয়া উচিত — ভাবতে ভাবতেই সারাটা রাস্তা কাটিয়ে দিলাম। স্থির করলাম যে বিচারকের সামনে সত্য গোপন করব না — এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি।

কাজানে এসে পেঁছলাম। চারদিকে ধ্বংসলীলা, সারা শহর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলা চলে। রাস্তার ধারে ধারে অঙ্গারের স্তূপ, মধ্যে মধ্যে খাড়া আছে

ছাদ ও জানলা-দরজা-বিহীন ঝলসানো দেওয়াল। শহর ছেড়ে যাবার সময়ে পুগাচেভ যে সব চিহ্ন রেখে গেছে তা হচ্ছে এই! আমাকে কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হল। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে একমাত্র এই কেল্লাটি অক্ষত ছিল। হুসার সৈন্যরা আমার ভার ছেড়ে দিল পাহারারত শান্ত্রীদের হাতে। শান্ত্রীরা কামার ডাকল। বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হল আমার পায়ে, বেড়ীর জোড় খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দেওয়া হল। তারপর নিয়ে গেল বন্দীশালায়। অন্ধকার ঘুপ্‌সি একটা কামরা, কেবল ন্যাড়া দেওয়াল আর লোহার পাত বসানো গবাক্ষ একটা।

এমনি আরম্ভ কোনো কিছু ভালোর পূর্বাভাষ নয়। কিন্তু আমি নিরুৎসাহ হলাম না বা দমে গেলাম না। দুঃখকষ্টে পড়ে সব মানুষই যে-ভাবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে আমিও তাই করলাম। পবিত্র কিন্তু ক্ষতবিক্ষত অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে-আসা প্রার্থনার মাধুর্য এই প্রথম অনুভব করতে পারলাম। তারপর আমার ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন না হয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে জেলরক্ষক এসে আমাকে ডেকে তুলল। বলল যে আমাকে কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে। দুজন সৈন্য আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল অধিনায়কের বাড়িতে; সেখানে তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল, আমি একা গিয়ে ঢুকলাম ঘরের মধ্যে।

বেশ প্রশস্ত একটা হলঘর। কাগজপত্র-ছড়ানো একটা টেবিলের সামনে দুজন লোক বসে আছে। একজন প্রবীণ জেনারেল, নিষ্প্রাণ ও কঠোর; অপরজন রক্ষিবাহিনীর একজন তরুণ ক্যাপ্টেন, সুদর্শন চেহারা, চটপটে চালচলন, কমনীয় ব্যবহার। সেক্রেটারী বসে আছে তার নিজস্ব টেবিলে, কানে গোঁজা পালকের কলম, আমার সাক্ষ্য নেবার জন্যে তৈরি হয়ে কাগজের ওপরে ঝুঁকে আছে। শুরু হল জেরা। আমার নাম ও পদবী জিজ্ঞেস করা হল। জেনারেল জানতে চাইলেন, আমি আন্দ্রেই পেত্রোভিচ গ্রিনেভের পুত্র কিনা? আমি স্বীকার করতেই তিনি কঠোর মন্তব্য করলেন, 'এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে এমন একজন মাননীয় ব্যক্তির এমন অযোগ্য পুত্র!' শান্তভাবে আমি জবাব দিলাম যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যাই হোক না কেন, আশা করি খোলাখুলি সত্য কথা বলে আমি তা

নিরসন করব। নিজের ওপরে আমার এতটা আস্থা তাঁর ভালো লাগল না। ভ্রূকুটি করে বললেন, 'বেশ তুখোর ছোকরা তো, তবে অমন অনেক দেখেছি ভায়া।'

তরুণ অফিসারটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, কোন্ বিশেষ অবস্থায় এবং কখন আমি পুগাচেভের অধীনে সৈন্যদলে কাজ করেছি এবং কোন্ কোন্ বিশেষ কাজে পুগাচেভ আমাকে নিয়োগ করেছে।

আমি ঘৃণার সঙ্গে জবাব দিলাম যে আমি সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার বনেদী জমিদার বংশে আমার জন্ম — সুতরাং কোনো অবস্থাতেই আমার পক্ষে পুগাচেভের অধীনে সৈন্যদলে কাজ করা সম্ভব নয় এবং কোনো বিশেষ নির্দেশও আমি তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি না।

তরুণ অফিসারটি জেরা চালিয়ে গেল, 'তাহলে এটা কী করে সম্ভব হল যে অফিসার ও বনেদী জমিদারদের মধ্যে মাত্র একজনকে ভুয়ো-জার ছেড়ে দেয় আর তার সঙ্গীসাথী সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে? এটাই বা কী করে সম্ভব হল যে সেই একই অভিজাত অফিসার বিদ্রোহীদের সঙ্গে এমন দোস্তের মতো খানাপিনা করে এবং প্রধান দুর্বৃত্তের হাত থেকে উপহার হিসেবে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট, একটা ঘোড়া ও পঞ্চাশটা কোপেক নেয়? এই অস্বাভাবিক বন্ধুত্বের মূলে যদি বিশ্বাসঘাতকতা না থাকে বা অন্তত নীচ ও জঘন্য কাপুরুষতা না থাকে — তাহলে আর কী থাকতে পারে?'

রক্ষিবাহিনীর অফিসারটির কথায় আমি ভয়ানক ঘা পেলাম। উত্তেজিত হয়ে আমি আগ্রহের সঙ্গে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম যে আমি কোনো অন্যায় করিনি। ঘটনাগুলো বলতে শুরু করি; কী করে তুষার-ঝড়ের মধ্যে স্তেপ অঞ্চলে পুগাচেভের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং কী করে বেলোগর্স্ক কেল্লা দখল করার পরে সে আমাকে চিনতে পারে ও ক্ষমা করে। ভুয়ো-জারের কাছ থেকে আমি যে বিনা দ্বিধায় ভেড়ার চামড়ার কোট ও ঘোড়া নিয়েছি সেকথা অস্বীকার করি না। তবে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বেলোগর্স্ক কেল্লা রক্ষা করবার জন্যে আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছি। শেষকালে জেনারেলের নাম উল্লেখ করে আমি বলি যে জেনারেল সাক্ষ্য দিতে পারবেন, ওরেনবুর্গ অবরোধের

সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে শত্রুর বিরুদ্ধে আমার কর্মতৎপরতা ছিল কিনা।

কঠোর চেহারার লোকটি টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন:

'এন্‌সাইন্‌ গ্রিনেভের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে সে নাকি বর্তমান অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত এবং সামরিক আইন-কানুন ও আনুগত্যের শপথের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে দুর্বৃত্তের সহিত যোগসাজশ স্থাপন করিয়াছে। উক্ত গ্রিনেভ সম্পর্কে আপনি যাহা কিছু জানিতে চাহিয়াছেন তাহার জবাবে আমার বিনীত বক্তব্য এইঃ উক্ত গ্রিনেভ ১৭৭৩ সালের অক্টোবর মাসের শুরু হইতে বর্তমান বৎসরের ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওরেনবুর্গে কার্যনিরত ছিল। শেষোক্ত তারিখে সে শহর হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং অতঃপর আমার অধীনস্থ সৈন্যদলে তাহাকে আর দেখা যায় নাই। পুগাচেভের দলত্যাগীদের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে পুগাচেভের সহিত সে গ্রামে ছিল এবং পুগাচেভের সহিত সে তাহার পূর্বতন কর্মস্থল বেলোগর্স্ক কেল্লায় যায়। তাহার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে আমার বক্তব্য...।' হঠাৎ পড়া থামিয়ে তিনি কঠোর স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর জবাবে তোমার কী বলবার আছে?'

যেভাবে আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম সেইভাবেই বলে যাব, মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অন্য সমস্ত ঘটনার মতোই আমি গোপন করব না — এই স্থির করে আমি বলতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এমন প্রচণ্ড একটা বিতৃষ্ণা বোধ করলাম যা কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমার মনে হল, যদি আমি মারিয়া ইভানভনার নাম উল্লেখ করি তাহলে ওকে জেরা করবার জন্যে কমিশনের সামনে হাজির করা হবে। একদল দুর্বৃত্তের নীচ কুৎসারটনার সঙ্গে ওর নামও যুক্ত হবে এবং ওকে এসে সশরীরে তাদের সামনে হাজির হতে হবে — ভাবতেই ব্যাপারটা আমার কাছে এমন ভয়ংকর মনে হল যে আমি থতমত খেয়ে সব গুলিয়ে ফেললাম।

বিচারকেরা আমার সম্পর্কে কিছুটা প্রশ্রয়ের মনোভাব দেখাতে শুরু করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ আমাকে এভাবে আম্‌তা আম্‌তা করতে দেখে তাঁদের

মন আবার বিরূপ হয়ে উঠল। রক্ষিবাহিনীর অফিসার দাবি জানায় যে প্রধান সংবাদদাতাকে আসামীর সামনে হাজির করা হোক। জেনারেল গতকালের দুর্বৃত্তটিকে হাজির করবার হুকুম দিলেন। আমাকে যে অভিযুক্ত করেছে তার উপস্থিতির অপেক্ষায় আমি আগ্রহের সঙ্গে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল শিকলের ঝন্‌ঝনানি; দরজা খুলে গেল, ভিতরে ঢুকল... শ্‌ভাব্রিন। ওর পরিবর্তনটা অবাক হবার মতো। ভয়ানক রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মাথার চুল কিছুকাল আগেও ছিল কুচকুচে কালো, এখন তা হয়ে গেছে একেবারে সাদা। লম্বা দাড়িতে বহুদিন চিরুণী পড়েনি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সে আবার বলে গেল। তার গলার স্বর দুর্বল কিন্তু বেপরোয়া। তার মতে আমি নাকি পুগাচেভের হুকুমে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে ওরেনবুর্গে গেছি; শত্রুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হবার অজুহাতে আমি রোজই বেরিয়ে আসতাম এবং শহরের ঘটনাবলীর লিখিত সংবাদ পাঠিয়ে দিতাম; শেষকালে খোলাখুলি ভুয়ো-জারের দলে যোগ দিই, ভুয়ো-জারের সঙ্গে গাড়িতে চেপে কেল্লা থেকে কেল্লায় ঘুরে বেড়াই, বিশ্বাসঘাতকতা করে সঙ্গীসাথীদের সর্বপ্রকারে সর্বনাশ করতে চেষ্টা করি — যাতে তাদের জায়গায় নিজেই বহাল হয়ে বসে ভুয়ো-জারের অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হতে পারি। আমি নিঃশব্দে ওর কথা শুনলাম। শুধু একটি জিনিস দেখে আনন্দ হল আমার: বদমায়েশটা মারিয়া ইভানভনার নাম মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেনি। হয়তো, যে মেয়েটি নাকি এমন ঘৃণার সঙ্গে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার কথা ভাবতে ওর অহঙ্কারে লাগছিল। হয়তো ওর মধ্যে এখনো এমন অনুভূতির ফুল্‌কি থেকে গেছে যা আমারও মধ্যে আছে বলে মারিয়া ইভানভনা সম্পর্কে আমি নির্বাক থাকতে পেরেছি। যে জন্যেই হোক, বেলোগর্স্ক কেল্লার অধিনায়ক-কন্যার নাম কমিশনের কাছে অনুল্লিখিত থেকে গেল। এতে আমার অভিপ্রায়টা আরো জোরালো হয়ে উঠল। বিচারকেরা যখন জিজ্ঞেস করলেন যে শ্‌ভাব্রিনের সাক্ষ্যের আমি প্রতিবাদ করতে পারি কিনা, আমি বললাম যে আত্মপক্ষ সমর্থন করে আমি ইতিপূর্বে যা বলেছি তা ছাড়া আমার আর কোনো বক্তব্য নেই। তখন

জেনারেলের হুকুমে আমাদের ঘর থেকে বার করে নিয়ে আনা হল। একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম দুজনে। একটি কথাও না বলে শ্ভাব্রিনের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। ক্রূর হাসি হেসে শ্ভাব্রিন শিকলটা তুলে ধরে আমার আগে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমি আবার বন্দীশালায় আটক হলাম। আর কোনো দিন জেরা করবার জন্যে আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

অতঃপর আমি পাঠকদের কাছে যে ঘটনাবলীর বিবরণ দেব তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নই। কিন্তু এই বিবরণ আমি এতবার শুনেছি যে তুচ্ছতম ঘটনাও আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে। মনে হয় যেন এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি অদৃশ্যভাবে উপস্থিত ছিলাম।

গত শতাব্দীর মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের অন্তরঙ্গ আতিথেয়তা। মারিয়া ইভানভনাকে আমার বাবা-মাও এমনি অন্তরঙ্গ আতিথেয়তায় গ্রহণ করেছিলেন। এই সহায়সম্বলহীনা অনাথা মেয়েটিকে তাঁরা যে আশ্রয় ও ভরসা দিতে পেরেছিলেন, এই ঘটনার মধ্যে ভগবানের মঙ্গলময় অস্তিত্বকেই অনুভব করেছিলেন তাঁরা। কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটির প্রতি তাঁদের অন্তরের টান এসে গেল। কারণ মারিয়া ইভানভনার সংস্পর্শে যে-ই আসে সে-ই তাকে ভালোবেসে ফেলে। মারিয়া ইভানভনাকে যে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম সেটা আর তখন আমার বাবার কাছে খামখেয়ালি বলে মনে হয় না। আর আমার মা'র তো একমাত্র কামনা হয়ে উঠল কি করে তাঁর পেত্রুশার সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে দেওয়া যায়।

ঠিক এমনি সময়ে আমার গ্রেপ্তারের গুজব এসে পেঁছল। আমার বাড়ির লোকজনরা একেবারে থ'। ইতিপূর্বে পুগাচেভের সঙ্গে আমার অদ্ভুত যোগাযোগের এমন একটা সহজ বিবরণ মারিয়া ইভানভনার কাছ থেকে আমার বাবা-মা শুনেছিলেন যা তাঁদের কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত করেনি। বরং সে সব কাহিনীর কোনো কোনো অংশ শুনে তাঁরা প্রাণভরে হেসেছিলেন। যে ঘৃণ্য বিদ্রোহের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিংহাসনের উচ্ছেদ এবং বনেদী জমিদারদের বিলোপ তার মধ্যে আমি থাকতে

পারি একথা বিশ্বাস করা আমার বাবার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাভেলিচকে তিনি খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। আমার এই ভূতপূর্ব দাদু খোলাখুলি বলে যে ইয়েমেল্‌কা পুগাচেভ দাদাবাবুকে ভোজ খাইয়েছে, দাদাবাবুর অনেক উপকারও করেছে — কিন্তু দাদাবাবু যে কোথাও বেইমানি করেনি একথা সে হলফ করে বলতে পারে। এ সব কথা শুনে বুড়ো-বুড়ীর আতঙ্ক কাটে এবং দুজনেই সুসংবাদের আশায় আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। মারিয়া ইভানভনাও ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল কিন্তু মুখে কিছু বলে না, কারণ তার স্বভাবের মধ্যে একটা বড়ো গুণ হচ্ছে এই যে তার বিবেচনা শক্তিটা খুব বেশি এবং সে খুব নম্র।

কয়েক সপ্তাহ কাটে...। একদিন আমার বাবা একটা চিঠি পেলেন। চিঠিটা এসেছে পিটার্সবুর্গে আমাদের আত্মীয় প্রিন্স ব...এর কাছ থেকে। আমার সম্পর্কে চিঠি। চিঠির শুরুর কয়েকটা লাইন যথারীতি যেমনভাবে লিখতে হয় তা লিখে প্রিন্স ব জানিয়েছেন যে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল এমন সন্দেহ পোষণ করবার পক্ষে অকাট্য যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা; এক্ষেত্রে চরম দণ্ডাজ্ঞাই আমার উপযুক্ত শাস্তি; কিন্তু আমার বাবার বৃদ্ধ বয়েস এবং অতীতের রাজসেবার কথা মনে রেখে সম্রাজ্ঞী তাঁর কুলাঙ্গার পুত্রটিকে ক্ষমা করবেন স্থির করেছেন এবং ফাঁসিমঞ্চের অগৌরবের মৃত্যুর পরিবর্তে সাইবেরিয়ার দূরপ্রান্তে আজীবন নির্বাসন দিয়েছেন।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাত আমার বাবাকে মৃতপ্রায় করে তোলে। চরিত্রের স্বাভাবিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেন তিনি এবং মনের দুঃখকে (যা অন্যসময়ে চাপা থাকে) তিক্ত বিলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন। উত্তেজিত হয়ে বারবার বলতে থাকেন, 'আমার — আমার ছেলে কিনা শেষকালে গিয়ে পুগাচেভের সঙ্গে ষড় করল! হা ভগবান, এও দেখতে হল আমাকে! সম্রাজ্ঞী ওর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাই মকুব করেছেন! কিন্তু তাতে তো আর দোষ কাটে না! কাউকে ফাঁসি দিলেই বা কি! ফাঁসি হওয়াটাই তো আর আতঙ্কের ব্যাপার নয়! আমার বাপ-

ঠাকুর্দাদের মধ্যে একজনের তো ফাঁসি হয়েছে — কিন্তু তিনি প্রাণ দিয়েছেন নিজের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার জন্যে! আমার বাবা তো ভলিন্‌স্কি আর খ্রুশ্চেভের [২১] সঙ্গে দুর্ভোগ ভুগে গেছেন! কিন্তু বনেদী জমিদার বংশের ছেলে যদি শপথ ভঙ্গ করে, যদি গিয়ে যোগ দেয় শয়তান, খুনী আর রাস্তার ছোটলোকের দলে — তাহলে সে যে আমাদের বংশের লজ্জা, আমাদের কুলের কলঙ্ক...' আমার বাবাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে আমার মা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন, প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলবার সাহসটুকুও তাঁর থাকে না, বাবাকে তিনি নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে বলেন যে, গুজব কখনো সত্যি হয় না, মানুষের মতামতের কোনো স্থিরতা নেই, ইত্যাদি। কিন্তু আমার বাবা কোনো কথাতেই প্রবোধ মানতে চান না।

সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে মারিয়া ইভানভনা। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি অনায়াসেই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতাম। সুতরাং সে আসল ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পারে এবং আমার এই দুর্ভোগের জন্যে মনে মনে নিজেকে দায়ী করতে থাকে। নিজের চোখের জল, নিজের কষ্ট সে লুকিয়ে রেখেছিল সবার কাছ থেকে। কী করে আমাকে উদ্ধার করা যায়, এই হয়ে ওঠে তার সর্বক্ষণের চিন্তা।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাবা সোফায় বসে রাজ্য-পঞ্জিকার পাতা উল্টোচ্ছিলেন। পঞ্জিকাটি হাতে নিয়ে তিনি আর আগেকার মতো আগ্রহ বোধ করছিলেন না, তাঁর চিন্তা উধাও হয়ে গিয়েছিল অন্য এক জগতে। আগেকার দিনের একটা পল্টনী সুর চাপা ঠোঁটে শিস্ দিয়ে বাজাচ্ছিলেন তিনি। আমার মা বসেছিলেন নির্বাক হয়ে, একটা উলের জামা বুনছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে তাঁর চোখের জল টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছিল। একটা সেলাই হাতে নিয়ে মারিয়া ইভানভনা বসে ছিল মা'র পাশে। হঠাৎ সে জানায় যে অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে তাকে একবার পিটার্সবুর্গে যেতে হবে এবং আমার বাবা-মা যেন তার জন্যে একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দেন। শুনে আমার মা'র খুবই দুঃখ হয়। তিনি বলেন, 'তোমার আবার পিটার্সবুর্গে যাবার কী দরকার পড়ল? মারিয়া ইভানভনা, তুমিও নিশ্চয়ই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ-না?'

জবাবে মারিয়া ইভানভনা বলল যে এই যাত্রার ওপরেই তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পিটার্সবুর্গে গিয়ে সে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্য প্রার্থনা করবে। তার বাবা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন সুতরাং সাহায্য চাইবার অধিকার তার আছে।

আমার বাবা মাথা নিচু করে থাকলেন। নিজের ছেলের তথাকথিত অপরাধের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এমন যে কোন কথাই তাঁর কাছে যন্ত্রণাদায়ক; তাঁর মনে হল কেউ যেন তাঁকে ভর্ৎসনা করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তোমাকে আর কী বলব মা! তুমি যাও, আমরা তোমার সুখের পথে বাধা হব না। ঈশ্বর করুন, তুমি যেন খুব ভালো স্বামী পাও। যাকে সবাই বিশ্বাসঘাতক বলে জানে এমন লোক যেন না হয়।' এই বলে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘরে যখন আমার মা ছাড়া আর কেউ থাকে না তখন মারিয়া ইভানভনা আমার মা'র কাছে তার অভিপ্রায়ের কথা খানিকটা প্রকাশ করে বলল। আমার মা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মারিয়া ইভানভনাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন মারিয়া ইভানভনার উদ্দেশ্য সফল হয়। যাত্রার আয়োজন চলতে থাকল এবং দিনকয়েক পরে বিশ্বস্ত ঝি পালাশা এবং নির্ভরযোগ্য সঙ্গী সাভেলিচকে নিয়ে মারিয়া ইভানভনা যাত্রা শুরু করল। সাভেলিচ আমাকে ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল; এবার আমার ভাবী বধূকে কিছুটা সাহায্য করতে পারছে ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করল।

মারিয়া ইভানভনা নিরাপদে সফিয়ায় পেঁছল। পোষ্ট-স্টেশনে এসে শুনল যে জারস্কয়ে সেলোতে রাজদরবার বসেছে। তক্ষুণি স্থির করল, সেখানে একটু থাকবার জায়গা খুঁজে নেবে। পোষ্টাফিস বাড়িটার এককোণে একটুখানি ঠাঁই মিলল। পোষ্ট-মাস্টারের বৌয়ের আর তর সয় না, তার সঙ্গে আসে আলাপ করতে। কথায় কথায় জানিয়ে দিল যে সে হচ্ছে রাজদরবারের চুল্লীদারের ভাইঝি এবং রাজদরবারের অনেক সব গোপন তথ্য মারিয়া ইভানভনার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল। তার কথা শুনে জানা গেল, সম্রাজ্ঞী কখন ঘুম থেকে ওঠেন,

কখন কফি খান, কখন বেড়াতে যান, বেড়াতে যাবার সময়ে পারিষদদের মধ্যে কে কে তাঁর সঙ্গে থাকেন, আগের দিন ভোজের টেবিলে তিনি কী কী মন্তব্য করেছেন, সন্ধ্যার সময় কে কে তাঁর দর্শনপ্রার্থী ছিল, ইত্যাদি। এক কথায় আন্না ভ্লাসিয়েভনা যা কিছু বলে তাকে বলা যায় ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা, এবং এই পৃষ্ঠাটি ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে। মারিয়া ইভানভনা মন দিয়ে তার কথা শুনল। দুজনে একসঙ্গে পার্কে বেড়াতে গেল। আন্না ভ্লাসিয়েভনা সঙ্গিনীকে প্রতিটি রাস্তা ও প্রতিটি পুলের ইতিবৃত্ত বলে। বেড়ানো শেষ করে দুজনে যখন আবার পোষ্টাফিস বাড়িতে ফিরে এল, তখন দুজনেই পরস্পরের খুব অনুরাগী হয়ে উঠেছে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল মারিয়া ইভানভনা, সাজপোশাক করল, তারপর নিঃশব্দে পার্কে চলে গেল। ভারি সুন্দর সকাল, লাইমগাছের চূড়াগুলো সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। শরতের তাজা হাওয়া লেগে লাইমগাছের পাতায় যেগুলোয় ইতিমধ্যেই হল্‌দে ছোপ ধরেছে। লেকের প্রশস্ত জলরাশি নিথর হয়ে পড়ে আছে, চিক্‌চিক্ করছে। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে হাঁসগুলোর। জলের কিনারে ঝোপের ঘনছায়া; সেই ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁসগুলো, তির্ তির্ করে ভেসে বেড়াচ্ছে জলের ওপর। ভারি চমৎকার একটা মাঠের ধার দিয়ে মারিয়া ইভানভনা হেঁটে গেল। মাঠের ঠিক মাঝখানে সদ্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ তোলা হয়েছে; স্মৃতিস্তম্ভটা হচ্ছে কাউণ্ট পিওতর আলেক্সান্দ্রভিচ রুমিয়ান্‌ৎসেভের [২২] সাম্প্রতিক জয়লাভের সম্মানে। হঠাৎ একটা ছোট্ট সাদা বিলিতী কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে মারিয়া ইভানভনার দিকে ছুটে এল। আতঙ্কে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আর ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল মিষ্টি মেয়েলি গলায় কে যেন বলছে, 'ভয় পেও না, ও কামড়াবে না।' মারিয়া ইভানভনা এবার দেখতে পেল, মনুমেণ্টের উল্টো দিকে একটা বেঞ্চিতে একজন মহিলা বসে আছেন। মারিয়া ইভানভনা গিয়ে বসল বেঞ্চিটার অপর প্রান্তে। মহিলা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে, আর সে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে মহিলার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে নিল। মহিলার পরনে সাদা

প্রভাতী পোশাক, রাতটুপি আর তুলোভরা জ্যাকেট। সে অনুমান করল মহিলার বয়স প্রায় চল্লিশ। সুপরিণত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারা আভিজাত্য ও স্থৈর্যের পরিচায়ক। তাঁর নীল চোখে ও মুখের মৃদু হাসিতে এমন একটা আকর্ষণ আছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই অপরিচিত মহিলাই নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বললেন।

'আপনি নিশ্চয়ই এখানে নতুন এসেছেন — না?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। মাত্র গতকাল আমি মফঃস্বল থেকে এসেছি।'

'আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে?'

'আজ্ঞে না, আমি একা-একাই এসেছি।'

'একা-একা? এইটুকু বয়সে একা-একা!'

'আমার বাবাও নেই, মাও নেই।'

'নিশ্চয়ই কোনো একটা দরকারী কাজে এখানে এসেছেন — নয় কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সম্রাজ্ঞীর কাছে একটি আর্জি দিতে এসেছি।'

'আপনার তো মা-বাবা নেই। মনে হয়, আপনি কিছু একটা অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে এসেছেন?'

'আজ্ঞে না, আমি অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে আসিনি, আমি করুণা ভিক্ষা করতে এসেছি।'

'আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?'

'আমি ক্যাপ্টেন মিরোনভের মেয়ে।'

'ক্যাপ্টেন মিরোনভ! যিনি ওরেনবুর্গের নিকটস্থ কেল্লার অধিনায়ক ছিলেন?'

'হ্যাঁ মাদাম।'

মহিলাকে দেখে মনে হল, তিনি বিচলিত হয়েছেন। আরো দয়ার্দ্র স্বরে তিনি বললেন, 'আপনার ব্যাপারটা আমি জানতে চাই, কিছু মনে করবেন না। রাজদরবারের সঙ্গে আমি যুক্ত আছি। আপনি কী অনুগ্রহ চাইতে এসেছেন আমার কাছে বলুন — আমি হয়তো আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।'

মারিয়া ইভানভনা উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সসম্ভ্রমের সঙ্গে মহিলাকে ধন্যবাদ জানাল। এই অপরিচিতা মহিলাকে যতোই সে দেখছে ততোই যেন সে আকর্ষণ বোধ করছে, ততোই যেন সে আস্থা ফিরে পাচ্ছে। পকেট থেকে সে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল এবং অপরিচিতা বরদাত্রীর হাতে দিল। তিনি নিঃশব্দে কাগজটা পড়তে শুরু করলেন।

তিনি পড়তে শুরু করেছিলেন মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে। কিন্তু পড়তে পড়তে সহসা তাঁর মুখচোখের চেহারা বদলে গেল। মারিয়া ইভানভনা তাঁর মুখের প্রতিটি পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। সে দেখল, এই কিছুক্ষণ আগে যে মুখটি ছিল এত মৃদু ও এত মাধুর্য-ভরা তা হয়ে উঠল অত্যন্ত কঠোর। দেখে সে আতঙ্কিত হল।

ভাবলেশহীন গলায় মহিলা বললেন, 'আপনি গ্রিনেভের পক্ষ নিয়ে বলতে এসেছেন? কিন্তু সম্রাজ্ঞী তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। সে কিছু জানত না বুঝত না তা নয় — তবুও সে ভুয়ো-জারের দলে যোগ দিয়েছে। এই দলত্যাগ থেকে বোঝা যায় যে তার নীতির বালাই নেই, সে অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক এবং যে কোনো দুষ্কার্য করতে পারে।'

মারিয়া ইভানভনা বলে উঠল, 'না, একথা ঠিক নয়।'

'ঠিক নয়?' মহিলা প্রতিধ্বনি করলেন, তাঁর চোখেমুখে রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে।

'না, ঠিক নয়। আমি শপথ করে বলছি যে ঠিক নয়। আমি আপনাকে সব কথা বলব। সে যে মুখ বুজে সমস্ত কিছু সহ্য করছে তা একমাত্র আমারই জন্যে। বিচারের সময় সে যদি আত্মপক্ষ সমর্থন না করে থাকে তবে তার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে সে এই বিচারে আমার নাম জড়াতে চায়নি।' তারপর মারিয়া ইভানভনা আগ্রহের সঙ্গে যে কাহিনী বলল তা পাঠক জেনেছেন।

মহিলা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। মারিয়া ইভানভনার বলা শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কোথায় উঠেছেন আপনি?' আন্না ভ্লাসিয়েভনার নাম শুনে একটু হেসে বললেন, 'তাই নাকি! আমি ওকে

চিনি। আচ্ছা, এখন চলি। আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কারও কাছে বলবেন না। আশা করি, আপনার চিঠির জবাব পেতে খুব বেশি দেরি হবে না।'

এই বলে তিনি উঠে একটা গাছে ঢাকা বীথি ধরে চলে গেলেন। আশায় আনন্দে ভরে মারিয়া ইভানভনা ফিরে এল আন্না ভ্লাসিয়েভনার কাছে।

শরৎকালে এত ভোরে বেড়াতে বেরুবার জন্যে গৃহকর্ত্রীর কাছে তাকে তিরস্কৃত হতে হল; গৃহকর্ত্রীর মতে এই অভ্যেসটা নাকি যুবতী স্ত্রীলোকদের পক্ষে খারাপ। তারপর গৃহকর্ত্রী সামোভার আনিয়ে চা তৈরি করল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সবেমাত্র রাজদরবারের অফুরন্ত সব গল্প বলতে শুরু করেছে এমন সময় রাজদরবারের একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির দরজার সামনে। তারপর রাজদরবারের একজন বার্তাবহ এসে জানাল যে সম্রাজ্ঞী মারিয়া মিরোনভার প্রতি অশেষ দয়া প্রদর্শন করেছেন — মারিয়া মিরোনভার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান।

আন্না ভ্লাসিয়েভনা তো একেবারে অবাক। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। বলল, 'কী ভয়ানক কাণ্ড, এ্যাঁ! সম্রাজ্ঞী আপনাকে রাজদরবারে ডেকেছেন! আপনার সংবাদ উনি পেলেন কী করে? কিন্তু সম্রাজ্ঞীর সামনে আপনি যে কী করে দাঁড়াবেন বুঝতে পারছিনে! রাজদরবারে কী-ভাবে কথাবার্তা বলতে হয় তা আপনি কিছু জানেন বলে মনে হয় না...। বরং আমিও আপনার সঙ্গে যাই — কী বলেন? অন্তত আপনাকে খানিকটা দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারব। আর আপনার এই বেড়াবার পোশাক পরে রাজদরবারে যাবেনই বা কী করে! বরং ধাইয়ের কাছে লোক পাঠাই, তার হল্‌দে পোশাকটা নিয়ে আসুক।' রাজদরবারের বার্তাবহ জানাল যে সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা, মারিয়া ইভানভনা যেন একাই আসে এবং যে পোশাকে আছেন সেই পোশাকেই চলে আসেন। এর ওপরে আর কথা চলে না। মারিয়া ইভানভনা গাড়িতে উঠে বসল। আন্না ভ্লাসিয়েভনা নানা উপদেশ দিল ও শুভেচ্ছা জানাল — শুনতে শুনতে মারিয়া ইভানভনা রওনা হল রাজপ্রাসাদের দিকে।

মারিয়া ইভানভনা অনুমান করে নিতে পেরেছিল যে আমাদের দুজনের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হতে চলেছে। তার বুকের ভিতরটায় কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল, বুকের স্পন্দন থেমে যাবার মতো অবস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এসে থামল রাজপ্রাসাদের সামনে। কম্পিতবক্ষে মারিয়া ইভানভনা সিঁড়ি দিয়ে উঠল। তার সামনে দরজার পর দরজা খুলে যেতে থাকল। বার্তাবহ আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল — আর একের পর এক সে পার হয়ে চলল জমকালো শূন্য সব কক্ষ। শেষ পর্যন্ত একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে বার্তাবহ বলল যে সম্রাজ্ঞীর কাছে সে মারিয়া ইভানভনার আগমন-বার্তা ঘোষণা করে আসবে। এই বলে তাকে একা দাঁড় করিয়ে রেখে বার্তাবহ ভিতরে ঢুকল।

সম্রাজ্ঞীর সামনে সশরীরে গিয়ে দাঁড়ানো! ব্যাপারটায় মারিয়া ইভানভনার এত আতঙ্ক হল যে দুপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতাটুকু যেন তার আর থাকে না। কিছুক্ষণ পরেই ঘরের দরজা খুলে গেল। এই ঘরটি হচ্ছে সম্রাজ্ঞীর বিশ্রামাগার। মারিয়া ইভানভনা ভিতরে ঢুকল।

প্রসাধন টেবিলের সামনে সম্রাজ্ঞী বসে আছেন। জনকয়েক সভাসদ ও সহচরী তাঁকে ঘিরে। তারা সসম্ভ্রমে মারিয়া ইভানভনার জন্যে পথ ছেড়ে দেয়। দয়ার্দ্র স্বরে সম্রাজ্ঞী মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে কথা বললেন আর মারিয়া ইভানভনা চিনতে পারল যে এই মহিলাটির সঙ্গেই অল্প কিছুক্ষণ আগে সে এমন খোলাখুলি কথা বলেছে। সম্রাজ্ঞী তাকে কাছে ডেকে স্মিত হাস্যে বললেন, 'আমি যে আমার কথা রাখতে পেরেছি এবং আপনার অনুরোধ পূর্ণ করতে পেরেছি, এটা আমার কাছে আনন্দের ব্যাপার। আর কোনো গণ্ডগোল নেই। আপনার ভাবী স্বামী যে নির্দোষ সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আর এই নিন, এই চিঠিটা আপনি আপনার ভাবী শ্বশুরের হাতে দেবেন।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে মারিয়া ইভানভনার হাত কাঁপছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে সম্রাজ্ঞীর পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ল। সম্রাজ্ঞী তাকে তুলে ধরে চুম্বন করলেন এবং তার সঙ্গে নানা কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'আমি জানি আপনি ধনী নন। কিন্তু ক্যাপ্টেন মিরোনভের মেয়ের প্রতি আমার কিছুটা

কর্তব্য আছে বলে মনে করি। ভবিষ্যতের জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার অবস্থার ভার আমি তুলে নিলাম।'

বাপ-মা হারা মেয়েটির প্রতি তিনি যতদূর সম্ভব করুণা প্রদর্শন করলেন এবং তারপর তাকে বিদায় দিলেন। রাজদরবারের সেই একই গাড়িতে চেপে মারিয়া ইভানভনা ফিরে এল। আন্না ভ্লাসিয়েভনা তার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল, ফিরে আসতেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করল। মারিয়া ইভানভনা কোনোক্রমে জবাব দিল তার। আন্না ভ্লাসিয়েভনা তার স্মৃতিশক্তির স্বল্পতায় খুশি না হলেও উদার হৃদয়ে তাকে ক্ষমা করে দিল এই ধরে নিয়ে যে গাঁয়ের মেয়েরা বড়ো লাজুক এবং সদয়ভাবে তাকে ক্ষমা করল। মারিয়া ইভানভনা পিটার্সবুর্গ শহর দেখবার জন্যেও আর অপেক্ষা করল না, সেই দিনই গ্রামে ফিরে গেল। [২৩]

পিওতর আন্দ্রেইয়েভিচ গ্রিনেভের কাহিনী এখানেই শেষ। পারিবারিক পরম্পরা থেকে জানা যায় যে ১৭৭৪ সালের শেষদিকে সম্রাজ্ঞীর আদেশে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। পুগাচেভের প্রাণদণ্ডের সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ভিড়ের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেয়ে পুগাচেভ পরিচয়সূচক মাথা নাড়ে। যে মাথা পুগাচেভ নোয়ায়, সেই মাথাই কিছুক্ষণ পরে রক্তাক্ত ও নিষ্প্রাণ অবস্থায় সবার চোখের সামনে উঁচিয়ে রাখা হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই মারিয়া ইভানভনাকে বিয়ে করেন পিওতর আন্দ্রেইয়েভিচ। তাঁদের বংশধররা এখন সিম্‌বির্স্ক তালুকে সমৃদ্ধিশালী লোক। ক... শহর থেকে ত্রিশ ভার্স্ট দূরে একটি গ্রাম আছে; গ্রামের দশজন জমিদার। তার একটি জমিদার বাড়িতে ফ্রেম ও কাচ দিয়ে বাঁধানো একটি চিঠি আছে; চিঠিটি দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের হাতে লেখা। চিঠিটি লেখা পিওতর আন্দ্রেইয়েভিচের বাবার কাছে। চিঠিতে বাপের কাছে ছেলের নির্দোষিতার সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং ক্যাপ্টেন মিরোনভের কন্যার হৃদয় ও মনের প্রশংসা করা হয়েছে। পিওতর আন্দ্রেইয়েভিচের কাহিনী সম্বলিত এই পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আসে তাঁর পৌত্র-পৌত্রীদের একজনের

মারফত। তিনি জানতেন যে তাঁর পিতামহ যে সময়কালের বর্ণনা দিয়েছেন সে-সম্পর্কে আমাদেরও আগ্রহ আছে। আমরা স্থির করি যে আত্মীয়বর্গের অনুমতি নিয়ে এই পাণ্ডুলিপিটিকে পৃথকভাবে প্রকাশ করব। এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গে যথোপযুক্ত শীর্ষলিখন উদ্ধৃত করেছি এবং নিজেদের বিবেচনা মতো কিছু কিছু আসল নাম বদলে দিয়েছি।

সম্পাদক

১৯শে অক্টোবর, ১৮৩৬
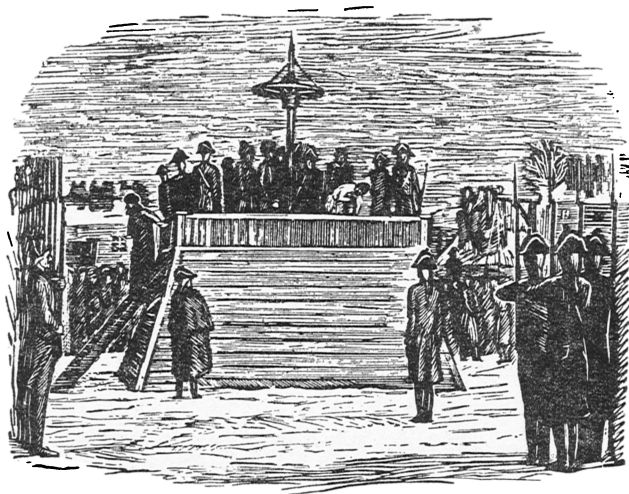
পরিশিষ্ট

বর্জিত অধ্যায়*

আমরা এবার ভল্‌গা তীরের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি। ক... গ্রামে আমাদের বাহিনী ঢুকল এবং রাত্রের মতো আমরা আশ্রয় নিলাম। গ্রামের প্রবীণের কাছে শুনলাম যে নদীর অপর তীরে সমস্ত গ্রাম বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে; সর্বত্র পুগাচেভের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। খবরটা শুনে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। এই নদী আমাদের পার হবার কথা পরের দিন সকালে।

আমি বড়ো অধৈর্য হয়ে পড়েছি। নদীর অপর তীর থেকে প্রায় ত্রিশ ভার্স্ট দূরে আমার বাবার জমিদারি। রাত্রিবেলা কেউ আমাকে নদী পার করিয়ে দিতে পারে কিনা খোঁজ করলাম। গ্রামের চাষীরা সবাই মৎস্যজীবী, সুতরাং নৌকার অপ্রাচুর্য নেই। গ্রিনেভের কাছে গিয়ে আমার ইচ্ছাটা জানালাম।

সে আমাকে সতর্ক করে দিল, 'খুব সাবধান, একা কিছুতেই যেও না, বিপদ হতে পারে। বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। প্রথম যে দলটি নদী পার হবে সেই দলের সঙ্গেই আমরা যাব আর তারপর পঞ্চাশ জন হুসার সৈন্য তোমার বাবা-মা'র অতিথি হিসাবে হাজির করব, দরকার হলে কাজে লাগবে।'

---

* 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে'র এই অধ্যায়টি মূল পুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, সেন্সর কড়াকড়ি। শুধু পাণ্ডুলিপিতেই এই অধ্যায়টিকে পাওয়া যায়। এই কারণে পুশ্‌কিন নিজেই একে নাম দিয়েছেন 'বর্জিত অধ্যায়'। মূল পুস্তকে কয়েকটি চরিত্রের নামে পরে যে অদল-বদল করা হয়েছে, তা পাণ্ডুলিপিতে অপরিবর্তিত — তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই অধ্যায়ে গ্রিনেভের নাম 'বুলানিন' এবং জুরিনের নাম 'গ্রিনেভ'।

আমি কারও কথা শুনতে রাজি নই। নৌকা তৈরি। দুজন মাঝিকে নিয়ে আমি নৌকায় চাপলাম। নৌকাটাকে ঠেলে দিয়ে তারা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল।

আকাশ পরিষ্কার। উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে। শান্ত সন্ধ্যা। ভল্‌গা নদীর জল স্থির ও মসৃণ। কালো জলের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে আমাদের নৌকা ভেসে চলেছে। অস্পষ্ট ও মনোরম কল্পনাবিলাসে আমি ডুব দিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা সময় পার হয়েছে। আমরা নদীর মাঝামাঝি জায়গায় পেঁৗচেছি...। এমন সময় মাঝিরা নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস শুরু করে দিল।

স্বপ্নভাব থেকে সজাগ হয়ে উঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কী?'

'ভগবান জানেন ব্যাপার কী, আমরা বুঝতে পারছি না।' একই দিকে তাকিয়ে দুজনে জবাব দিল।

তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম। মনে হল, অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা কিছু স্রোতে ভাসতে ভাসতে আসছে। জিনিসটা কী হতে পারে বোঝা গেল না, ক্রমেই আমাদের দিকে ভেসে আসতে লাগল। মাঝিদের আমি নৌকা থামাতে বললাম। জিনিসটা কাছে এগিয়ে আসুক, ততোক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।

এক টুকরো মেঘের পিছনে চাঁদ আড়াল হয়ে গেল। ভাসমান অনৈসর্গিক বস্তুটি হয়ে উঠল আরো কালো। এবার সেটা খুবই কাছে এসে পড়েছে কিন্তু তবুও কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

মাঝিরা বলাবলি করল, 'কী হতে পারে ওটা! নৌকার পাল নয়, মাস্তুল নয়...।'

হঠাৎ মেঘের পিছন থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল। আর শিউরে উঠতে হল এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে। আমাদের দিকে ভেসে আসছে একটা ভেলা, ভেলার ওপরে ফাঁসিকাঠ লাগানো হয়েছে আর সেই ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলছে তিনটি লাস। একটা অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। মনে হল, ফাঁসিতে লট্‌কানো মানুষগুলোর মুখ আমাকে একবার দেখতেই হবে।

আমার হুকুমে মাঝিরা লগি দিয়ে ভেলাটা টেনে ধরল। ভাসমান ফাঁসিমঞ্চের

গায়ে আমার নৌকাটা ধাক্কা খাচ্ছে। লাফিয়ে আমি ভেলার ওপর উঠে এলাম এবং দাঁড়ালাম এসে ফাঁসিকাঠের সেই দুই ভয়ঙ্কর খুঁটির মাঝখানে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো এসে পড়েছে, হতভাগ্যদের বিকৃত মুখাবয়বের ওপরে। একজন হচ্ছে এক বুড়ো চুভাশ। আরেকজন এক রুশ চাষী—শক্তসমর্থ জোরালো চেহারা, বছর কুড়ি বয়েস। কিন্তু তৃতীয় জনের দিকে চোখ পড়তেই আমাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেতে হল। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠে আর্তনাদ করে উঠলাম। এই তৃতীয় জন হচ্ছে ভানিয়া, বেচারী ভানিয়া — মুহূর্তের ভুলে সে যোগ দিয়েছিল পুগাচেভের দলে। কালো রঙ করা একটুকরো কাঠ পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল লোক তিনজনের মাথার ওপরে; তাতে গোটা গোটা সাদা অক্ষরে লেখা: 'চোর ও বিদ্রোহী'। মাঝিরা লগি দিয়ে ভেলাটাকে টেনে ধরে হাঁদারামের মতো আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি নৌকাতে ফিরে গেলাম। স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভেলাটা এগিয়ে চলল। রাত্রের অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে ফাঁসিমঞ্চটা ফুটে রইল কালো হয়ে। অবশেষে একসময়ে আর দেখা গেল না। ইতিমধ্যে আমার নৌকা খাড়া পাড়ে এসে লেগেছে...।

দরাজ হাতে মাঝিদের আমি পুরস্কার দিলাম। ওদের মধ্যে একজন আমাকে নিয়ে চলল ফেরিঘাটের পাশে গ্রামের একজন সর্দারের কাছে। লোকটির পিছনে পিছনে এসে আমি একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকলাম। সর্দার যখন শুনল যে আমি ঘোড়া চাইতে এসেছি তখন সে আমাকে বিশেষ আমল দিতে চাইল না। কিন্তু নৌকার মাঝি ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলল তাকে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার কর্কশ ব্যবহার বদলে গেল, দেখা দিল অতি বিনীত আনুগত্য। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রয়কা তৈরি। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার হুকুমে আমাদের দেশের বাড়ির দিকে গাড়ি চলল।

চওড়া রাজপথের ওপর দিয়ে ঘোড়া কদমে ছুটছে। রাস্তার দু-প্রান্তে ঘুমন্ত গ্রাম। আমার একমাত্র ভয়, রাস্তায় না আটক হয়ে পড়ি। ভল্‌গার ওপর দিয়ে আমার এই নৈশ অভিযানের ফলে একটা জিনিস বোঝা গেল। বিদ্রোহীরা যে আছে তার যেমন নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় শক্তিশালী সরকারী প্রতিরোধের চিহ্ন। আমার পকেটে পুগাচেভের হুকুমনামা আছে, আবার

কর্ণেল গ্রিনেভের আদেশপত্রও আছে; প্রয়োজনের সময় যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারি।

কিন্তু রাস্তায় কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। সকালের দিকে দূর থেকে চোখে পড়ল আমাদের গ্রামের নদী ও ফার গাছের জঙ্গল। কোচোয়ান শপ্ শপ্ করে চাবুক চালাচ্ছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা এসে ক... গ্রামে পৌঁছলাম।

গ্রামের অপরপ্রান্তে জমিদারের বাড়ি। পুরো দমে ঘোড়া ছুটছে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে রাস্তার ঠিক মাঝখানে কোচোয়ান লাগাম টেনে ধরল।

অধৈর্য হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

মাঝরাস্তায় কোনোরকমে গাড়ি থামিয়ে সে জবাব দিল, 'হুজুর, সামনের পথ আটক।'

আর বাস্তবিকই দেখা গেল, রাস্তার মাঝখানে ঠেকা তুলে রাখা হয়েছে। আর একজন চাষাভূষো ধরণের লোক পাহারায় মোতায়েন। তার কাঁধে একটা লাঠি। আমার কাছে এসে মাথার টুপি খুলে সে অনুমতিপত্র দেখতে চাইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এর মানে কী? এভাবে রাস্তা আটক করেছে কেন? এখানে আবার পাহারা কিসের?'

মাথা চুলকে সে জবাব দিল, 'কেন হুজুর, আমরা বিদ্রোহ করেছি।'

দমে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তোমাদের মনিবরা কোথায়?'

'মনিবরা?' সে বলল, 'মনিবরা গোলাঘরে।'

'গোলাঘরে?'

'ব্যাপারটা কি জানেন, আন্দ্রিয়ুশ্কা ওদের হাত-পায়ে বেড়ি দিয়েছে। ও বলে, ওদের নিয়ে জারের সামনে হাজির করবে।'

'সর্বনাশ! ঠেকা তুলে ধর, ওরে হাঁদারাম! হাঁ করে দেখ্ছিস কী?'

লোকটা কী করবে ঠিক করতে পারছে না। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এসে আমি (বলতে লজ্জা করে) লোকটার কানের ওপর একটা চড় মারলাম এবং নিজেই ঠেকাটা তুলে দিলাম। লোকটা আমার দিকে ফ্যাল্ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। গাড়িতে উঠে আমি কোচোয়ানকে হুকুম দিলাম জমিদারের বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে। গোলাঘরটা উঠোনের মাঝখানে। সেখানেও একই

দৃশ্য। দরজায় তালা ঝুলছে আর চাষাভূষো ধরণের দুজন লোক লাঠি হাতে পাহারায় দাঁড়িয়ে। গাড়ি এসে থামল একেবারে লোকদুটোর সামনে। লাফিয়ে নেমে এসে আমি একেবারে ওদের মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

'দরজা খোল!'

যে ভঙ্গিতে আমি হুকুম দিয়েছি তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা ওদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করল। ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, হাতের লাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা দুজনেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। তালাটাকে মুচড়ে ভেঙে ফেলে দরজা খুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দরজাটা ছিল ওক্ কাঠের আর তালাটাকে কিছুতেই আয়ত্তে আনা গেল না। ঠিক এই সময়ে একজন লম্বামতো ছোকরা চাষী একটা কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে উদ্ধতভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কেন এমন হট্টগোল শুরু করেছি।

'তোমাদের গাঁয়ের মোড়ল আন্দ্রিয়ুশ্‌কা কোথায়? তাকে ডেকে নিয়ে এস আমার কাছে।' আমি হুঙ্কার ছাড়ি।

'আমি হচ্ছি আন্দ্রেই আফানাসিয়েভিচ, আন্দ্রিয়ুশ্‌কা নই। কী চান আপনি?' দুহাত কোমরে রেখে মুখের ওপরে একটা বেপরোয়া ভাব ফুটিয়ে তুলে সে জবাব দেয়।

তার প্রশ্নের জবাব দিলাম মুখের কথায় নয়, তার টুঁটিটা চেপে ধরে। হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এলাম গোলাঘরের দরজার সামনে। তালা খুলে দিতে হুকুম করলাম। একমুহূর্ত গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে, কিন্তু আমার শাসন কর্তামিতে কাজ হল শেষ পর্যন্ত। চাবিটা বার করে খুলে দিল গোলাঘরের দরজা। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ছুটলাম আমি। ছাদের একটা সরু ফাটল দিয়ে অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা এসে পড়েছিল; সেই আলোয় ঠাহর করে ঘরের এক অন্ধকার কোণে আমার মা ও বাবাকে খুঁজে পেলাম। তাঁদের হাত বাঁধা। পায়ের গোড়ালিতে কাঠের বেড়ি। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। আবেগের সঙ্গে তাঁদের জড়িয়ে ধরলাম। তাঁরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিন বছরের পল্টনী জীবন আমার মধ্যে এত

বেশি পরিবর্তন এনেছে যে তাঁরা আমাকে চিনতে পারলেন না। আমার মা রুদ্ধ আবেগে কেঁদে ফেললেন।

হঠাৎ আমার পিছন থেকে একটা অতি প্রিয় পরিচিত মেয়েলি গলা কানে এল।

'পিওতর আন্দ্রেইচ! আপনি?'

আমার মুখ দিয়ে কথা সরল না...। মুখ ফিরিয়ে ঘরের আর এক কোণে দেখতে পেলাম মারিয়া ইভানভনাকে। ওরও হাত বাঁধা, পায়ে বেড়ি।

আমার বাবা নির্বাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আনন্দে তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত।

আমার তলোয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম।

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাবা বললেন, 'পেত্রুশা, তুই এসেছিস নাকি? তুই! আয়! আয়! ভগবানের দয়ায় তোকে আবার দেখতে পেলাম...।'

আমার মা আবেগভরা স্বরে বললেন, 'পেত্রুশা, মাণিক আমার! তুই না এলে কী উপায় হত যে? ভালো আছিস্ তো?'

আর সময় নষ্ট না করে আমি তাঁদের সকলকে আটক অবস্থা থেকে বাইরে নিয়ে আসতে চাইলাম। কিন্তু দরজার সামনে এসে দেখি, দরজা আবার বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

'আন্দ্রিয়ুশ্‌কা! দরজা খোল!' আমি চিৎকার করি।

দরজার অন্যদিক থেকে জবাব আসে, 'তা হবে না! তুমি ওখানেই থাকো। এভাবে হট্টগোল করার জন্যে আর জারের কর্মচারীর টুঁটি টিপে ধরবার জন্যে তোমাকে আমরা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

গোলাঘর থেকে বেরিয়ে যাবার অন্য কোনো রাস্তা আছে কিনা দেখতে শুরু করলাম।

বাবা বললেন, 'ও দেখে কোনো লাভ নেই। আমি এমন মালিক নই যে গোলাঘরে সিঁধেল চোরের যাতায়াতের ফাঁক রাখব।'

আমি এসেছি বলে আমার মা প্রথমে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তারপর যখন দেখলেন যে বাড়ির অন্য সবার মতো আমারও সেই একই

দূরদৃষ্ট — তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। আমার বাবা-মা ও মারিয়া ইভানভনার মধ্যে এসে পড়ে আমি নিজে কিন্তু আরো বেশি সুস্থির হয়ে উঠেছি। আমার কাছে তলোয়ার ও দুটো পিস্তল আছে। যতোই ওরা আমাদের ঘিরে রাখুক না কেন, আমি পরোয়া করি না। তাছাড়া আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে সন্ধ্যার আগেই গ্রিনেভ এখানে পৌঁছে যাবে এবং আমাদের মুক্ত করবে। আমার বাবা-মাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলে আমার মা'র মনে শান্তি ফিরিয়ে আনলাম। আবার আমরা একসঙ্গে মিলতে পেরেছি — এই আনন্দে তখন তাঁরা মেতে উঠলেন।

বাবা বললেন, 'শোন, পিওতর, তোমায় একটা কথা বলি। এতদিন তোমার অনেক ছেলেমানুষি সহ্য করেছি, সেজন্যে রাগও হয়েছে। কিন্তু সে-সব কথা আজ আর তুলতে চাই না। আশা করি তুমি নিজেকে শুধরে নিতে পেরেছ, তোমার বয়েসকালের খেয়ালিপনা দূর হয়েছে। আমি জানি তুমি সৈন্যদলে সসম্মানে কর্তব্য পালন করতে পেরেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি, পিওতর! বুড়ো বয়েসে আমার মনে তুমি শান্তি দিতে পেরেছ। আর আজ যদি তোমার জন্যে বেঁচে যেতে পারি — তাহলে আমার জীবন দ্বিগুণ মধুর হয়ে উঠবে।'

আমার চোখে জল এল, তাঁর হাতে আমি চুম্বন করলাম। তারপর মারিয়া ইভানভনার দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে, ওর মনে যেন পরিপূর্ণ আনন্দ ও প্রশান্তি।

দুপুরের দিকে একটা অস্বাভাবিক গোলমাল ও হৈচৈ কানে এল।

বাবা বললেন, 'এর মানে কী? তোমার সেই কর্ণেল এর মধ্যেই এসে পড়ল নাকি?'

আমি বললাম, 'অসম্ভব। সন্ধ্যার আগে সে কিছুতেই এখানে পৌঁছতে পারে না।'

গোলমাল বেড়ে চলেছে। বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে উঠল। আঙিনা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল একদল লোক। আর ঠিক সেই সময়ে দেওয়ালের একটা সরু ফাটলে সাভেলিচের পাকা চুলওলা মাথাটা জেগে উঠল, আর বেচারী দাদু আর্তস্বরে চিৎকার করে বলল:

'কর্তাবাবু! গিন্নী-মা! দাদাবাবু! দিদিমণি! খুবই খারাপ খবর! শয়তানরা গাঁয়ে এসে পড়েছে। আর দাদাবাবু, শয়তানগুলোর সর্দার কে হয়েছে জান? সেই নরকের কীট শ্ভাব্রিন।'

দু-চোখের বিষ এই লোকটার নাম শুনে মারিয়া ইভানভনা হাতের মুঠো পাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'শোন, সাভেলিচ! কেউ একজন ঘোড়ায় চেপে ফেরিঘাটে চলে যাক। ওখানে সরকারী সৈন্য আছে। তাদের গিয়ে বলুক যে তারা যেন কর্ণেলকে আমাদের বিপদের কথা জানায়।'

'দাদাবাবু, এখানে ছোকরা কেউ নেই, সকলেই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে। সমস্ত ঘোড়া ওদের হাতে। হা ভগবান, এই ওরা এসে পড়ল, এই ঢুকেছে উঠোনে, এই আসছে গোলাঘরের দিকে।'

এবার দরজার ঠিক ওপাশ থেকে অনেক লোকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। আমার মাকে ও মারিয়া ইভানভনাকে ঘরের এক কোণে সরে যেতে বললাম। তারপর তলোয়ার বার করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার ঠিক পাশটিতে। আমার বাবা পিস্তলদুটো তৈরি রেখে ঘাঁটি নিয়ে দাঁড়ালেন আমার পাশে। তালায় চাবি ঘুরোবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তারপরেই দরজাটা খুলে গেল আর খোলা দরজার ফাঁকে জেগে উঠল আন্দ্রিয়ুশ্কার মাথা। আমি তলোয়ারের কোপ বসালাম, দরজাটা আগ্লে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাবা একটা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লেন। আক্রমণকারীর দল আমাদের মুণ্ডপাত করতে করতে পালিয়ে গেল। আহত লোকটিকে ঘরের ভিতর টেনে এনে আমি ভিতর থেকে ছিট্‌কিনি তুলে দিলাম।

উঠোন-ভর্তি সশস্ত্র মানুষ। শ্ভাব্রিন রয়েছে ওদের মধ্যে।

আমার মা ও মারিয়া ইভানভনার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'ভয় পাবার কোনো কারণ নেই! এখনো বাঁচবার আশা আছে। আর বাবা, আপনি আর এখন গুলি চালাবেন না, শেষ গুলিটা খরচ করা চলবে না।'

আমার মা নিঃশব্দে ভগবানের নাম করছেন। তাঁর পাশে মারিয়া ইভানভনা। ওর মুখটা নির্বিকার। কপালে যা আছে হবে — এমনি একটা স্বর্গীয় প্রশান্তি

ওর চোখেমুখে। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার, গালাগালি আর শাসানি। আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার নিজের জায়গায়; যে কেউ মাথা গলাতে সাহস করবে তাকেই আমি কেটে দু-টুকরো করব। হঠাৎ বাইরের গোলমাল একেবারে থেমে গেল আর শোনা গেল শ্ভাব্রিন আমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে!

'আমি আছি এখানে। কী চাও তুমি!'

'বুলানিন, আমাদের ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। বরং আমাদের হাতে ধরা দাও। তোমার বুড়ো মা-বাপের কথা ভাবো একটু! গোঁয়ার্তুমি করে কিছু লাভ নেই! তোমাকে আমার হাতে ধরা পড়তেই হবে।'

'ধরবার চেষ্টা করেই দেখ-না, বিশ্বাসঘাতক!'

'তুমি কি ভাবছ, আমি নিজে বোকার মতো ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করব বা আমার লোকজনের জীবন বিপন্ন করব? মোটেই না। আমি বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেব এই গোলাঘরটায়। আর তখন, ওহে বেলোগর্স্কের ডন-কুইক্সট, টের পাওয়া যাবে কত বড়ো বীরপুরুষ তুমি! এখন খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আপাতত কিছুক্ষণ এই ঘরের মধ্যেই তোমাদের থাকতে হবে। আর এই সময়ের মধ্যে ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখো, কী করবে। চললাম মারিয়া ইভানভনা, তোমার কাছে আমি কোন মাপ চাইছি না। আর ঘরের অন্ধকারে তোমার বীরপুরুষের পাশে বসে ফুর্তিতেই আছ আশা করি!'

গোলাঘরের দরজার পাহারা দাঁড় করিয়ে শ্ভাব্রিন চলে গেল। আমরা সবাই নির্বাক। প্রত্যেকেই নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে আছি, মন খুলে কথা বলবার সাহস নেই। রাগে অন্ধ হয়ে শ্ভাব্রিন যে কত রকমের দুষ্কার্য করতে পারে — মনে মনে আমি তা কল্পনা করলাম। নিজের কপালে যাই ঘটুক না কেন, সেজন্যে আমি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করি না। আর যদি সত্যি কথা বলতে হয় — আমার বাবা-মা সম্পর্কে আমার যতোটা না উদ্বেগ তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বেগ মারিয়া ইভানভনা সম্পর্কে। আমি জানি গাঁয়ের চাষীরা এবং বাড়ির দাসদাসীরা আমার মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে; আমার বাবার অনেক রকম কড়াকড়ি আছে কিন্তু তিনি ন্যায়ের পথে চলেন এবং প্রজাদের সত্যিকারের অভাব-অভিযোগের কথা জানেন বলে সবাই তাঁকে ভালোবাসে। প্রজাদের এই বিদ্রোহ

একটা বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়, একটা সাময়িক উত্তেজনার ফল; এর মধ্যে তাদের ক্রোধের পরিচয় নেই। সুতরাং আমার মা-বাবার ক্ষেত্রে সম্ভবতই আশা করা চলে যে তাঁদের জীবনসংশয় ঘটবে না। কিন্তু মারিয়া ইভানভনা? এই দুশ্চরিত্র ও বিবেকবর্জিত লোকটার হাতে কোন্ ভাগ্য অপেক্ষা করছে ওর জন্যে? ভাবতেও শিউরে উঠছি আমি! এই নিষ্ঠুর শত্রুর হাতে দ্বিতীয়বার পড়ার চেয়ে (ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন!) আমি ওকে নিজের হাতে খুন করতে প্রস্তুত হলাম।

আরো একঘণ্টা কাটল। গাঁয়ের দিক থেকে মাতাল গানের শব্দ ভেসে আসছে। গোলাঘরের দরজায় যারা পাহারা দাঁড়িয়ে, তারা এই হুল্লোড়ে যোগ দিতে পারেনি বলে ক্ষুব্ধ। রাগে আমাদের উদ্দেশেই গালিগালাজ করতে শুরু করে দিয়েছে আর ভয় দেখাচ্ছে — আমাদের সকলের ওপরে ভয়ানক অত্যাচার হবে, আমাদের সকলকে মরতে হবে।

শ্ভাব্রিনের শাসানির ফল আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর এক সময়ে শোনা গেল, উঠোনে বিপুল এক চাঞ্চল্য জেগেছে। আবার শুনতে পেলাম শ্ভাব্রিনের গলা:

'কী ঠিক করলে বলো! নিজের থেকে আমার হাতে ধরা দেবে?'

আমরা নিরুত্তর।

অল্প একটু সময় অপেক্ষা করে শ্ভাব্রিন খড় আনবার জন্যে হুকুম দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্‌লকে আগুনের শিখায় আলো হয়ে গেল অন্ধকার গোলাঘর, ধোঁয়া উঠতে লাগল দরজার তলা থেকে। আর এমনি সময়ে মারিয়া ইভানভনা এসে দাঁড়াল আমার কাছে, আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে চাপা স্বরে বলল:

'পিওতর আন্দ্রেইচ, অবুঝ হয়ো না। তুমি আর তোমার বাবা-মা আমার জন্যে কেন প্রাণ দিতে যাবে? আমি বাইরে যাই। শ্ভাব্রিন আমার কথা শুনবে।'

'না, কক্ষণো না!' উত্তেজিত হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'বাইরে গেলে তোমার কী অবস্থা হবে জান?'

শান্ত স্বরে ও জবাব দিল, 'কোনো কিছু অসম্মান হলেই আমি মরব। কিন্তু যাঁর জন্যে আমি উদ্ধার হয়েছি, আর যাঁর বাবা-মা এক অনাথা এত উদারভাবে আশ্রয় দিয়েছেন — তাঁদের হয়তো প্রাণরক্ষা হবে। বিদায়, আন্দ্রেই পেত্রোভিচ! বিদায়, আভ্‌দোতিয়া ভাসিলিয়েভনা! আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন তা শুধু উপকার করা নয় — তার চেয়ে অনেক বেশি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনি আমাকে বিদায় দিন, পিওতর আন্দ্রেইচ। আর একথা স্থির জানবেন যে... যে...' এই বলে দু-হাতে মুখ ঢেকে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমার তখন প্রায় একটা উন্মত্ত অবস্থা। আমার মাও কাঁদছেন।

বাবা বললেন, 'মারিয়া ইভানভনা, ওসব কথা ভুলে যাও। ভেবো না, তোমাকে এই শয়তানটার কাছে একা যেতে দেব। চুপটি করে বসে থাক। যদি মরতেই হয় তো সবাই একসঙ্গে মরব।'

'শোন, — ওরা কী বলে!'

শ্‌ভাব্রিন চিৎকার করে বলছে, 'ধরা দেবে কিনা বলো! শুনে রাখ! আর পাঁচ মিনিট সময় আছে — তারপরেই জ্যান্ত পুড়তে শুরু করবে।'

আমার বাবা দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, 'শুনে রাখ শয়তান! আমরা কেউ ধরা দেব না!'

তাঁর মুখের কোঁচকানো চামড়া একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় টান হয়ে উঠেছে, সাদা ভুরুজোড়ার নিচে জ্বলছে চোখদুটো। আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'বাস, আর দেরি করা নয়।'

দরজা খুললেন তিনি। আগুনের শিখা লক্‌লক্‌ করে ছুটে আসছে। পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে ঘরের কড়িবরগার ওপরে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দেওয়া শুক্‌নো খড়ের মধ্যে। আমার বাবা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লেন, তারপর জ্বলন্ত চৌকাঠ পার হয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন, 'তোমরা সবাই চলে এস আমার পিছনে পিছনে!' আমার মা ও মারিয়া ইভানভনার হাত ধরে দুজনকে তাড়াতাড়ি বাইরে ফাঁকা জায়গায় বার করে নিয়ে এলাম। আমার বাবার অনির্দিষ্ট হাতের গুলি লেগে শ্‌ভাব্রিন পড়ে আছে চৌকাঠের ওপরে। আমরা এভাবে আচমকা বেরিয়ে এসে আক্রমণ করাতে শয়তানের দল প্রথমে ছুটে পালিয়েছিল

কিন্তু এখন আবার সাহস পেয়ে ঘিরে ফেলছে আমাদের। আমি সবেমাত্র রুখে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময়ে খুব ভালোভাবে তাক-করা একটা ইট ঠিক আমার বুকে এসে লাগে। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে রইলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, রক্তেভেজা ঘাসের ওপরে শ্‌ভাব্রিন উঠে বসেছে আর আমাদের সবাইকে দাঁড় করানো হয়েছে তার সামনে।

দু-হাতে দুজনের ওপরে ভর দিয়ে আমি বসে আছি। একদল চাষী, কসাক আর বাশ্‌কির ভিড় আসছে আমাদের দিকে। শ্‌ভাব্রিন মড়ার মতো ফ্যাকাশে, এক হাতে সে আহত স্থানটা চেপে ধরে আছে। যন্ত্রণা আর ক্রোধ একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে সে আমার দিকে তাকাল আর খুব অস্পষ্ট ও দুর্বল স্বরে বলল:

'ফাঁসিতে লটকাও... সব কটাকে... শুধু এই মেয়েটিকে বাদ দিও...'

শয়তানগুলো আমাদের ওপরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তারপর হৈ হৈ করে আমাদের টানতে টানতে নিয়ে চলে ফটকের দিকে। তারপরেই হঠাৎ আমাদের ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যেতে থাকে। সদর দিয়ে গ্রিনেভকে ঢুকতে দেখা গেল, তার পিছনে পিছনে খোলা তলোয়ার হাতে পুরো এক বাহিনী সৈন্য।

বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে পালাচ্ছে। হুসার সৈন্যরা ধাওয়া করছে পিছু পিছু; তলোয়ার দিয়ে কাটছে, বন্দী করছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে এল গ্রিনেভ, আমার মা-বাবাকে নমস্কার করে আবেগের সঙ্গে আমার হাত চেপে ধরে বলল:

'দেখছো তো, ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। তাহলে ইনিই হচ্ছেন তোমার বাগ্‌দত্তা!'

মারিয়া ইভানভনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। আমার বাবা বাইরে কোনো রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। কিন্তু তাঁকে দেখে বোঝা গেল, তাঁর মনের মধ্যে গভীর আলোড়ন চলেছে। গ্রিনেভকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন; আমার মা গ্রিনেভকে ঈশ্বরের দূত বলে বুকে টেনে নিলেন একেবারে।

'আসুন, আমাদের বাড়িতে আসুন।' বলে আমার বাবা পথ দেখিয়ে আগে আগে চললেন।

শ্ভাব্রিনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রিনেভ দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই লোকটি কে?' আহত লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'এই লোকটি হচ্ছে পালের গোদা। ভগবানের দয়ায় এই বুড়ো হাত দিয়েই শাস্তি দিয়েছি লোকটাকে। আমার ছেলের রক্তপাত করার শোধ নেওয়া গেল এতদিনে।' খানিকটা গর্বের সুরে বাবা জবাব দিলেন; তিনি যে এককালে সৈনিক ছিলেন, এটা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর কথার মধ্য দিয়ে।

গ্রিনেভকে আমি বললাম, 'এই হচ্ছে শ্ভাব্রিন।'

'শ্ভাব্রিন! দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হল! ওহে সৈন্যরা! লোকটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আমাদের রেজিমেণ্ট-সার্জনের কাছে নিয়ে যাও তো দেখি। সার্জনকে বলবে, ওর ক্ষতস্থান যেন ধুয়েবেঁধে দেয় আর চোখের মণির মতো ওকে যত্ন করে। শ্ভাব্রিনকে যে-করে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কাজানে এক গোপন কমিশন আছে, যে-করে হোক ওকে হাজির করতেই হবে সেখানে। ও হচ্ছে একজন প্রধান অপরাধী, সুতরাং ওর সাক্ষ্য থেকে খুবই মূল্যবান সব খবর পাওয়া যাবে।'

ক্লান্তভাবে চোখ খুলে তাকাল শ্ভাব্রিন। সারা অবয়বে ফুটে উঠেছে শুধু একটা শারীরিক যন্ত্রণার ছাপ। হুসার সৈন্যরা ওকে একটা কাপড়ের ওপরে শুইয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমরা বাড়ির ভিতরে গেলাম। ছেলেবেলার কথা আমার মনে পড়ছে। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম; আমার মন গভীরভাবে নাড়া খেলা বাড়ির ভিতরে কোনো কিছুই বদলায়নি। আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। শ্ভাব্রিন তার লোকজনকে লুটপাট করতে দেয়নি। যথেষ্ট অধঃপতন সত্ত্বেও হীন স্বার্থগৃধ্নুতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা তার তখনো ছিল।

এ বাড়ির দাসদাসীরা বাইরের ঘরে ভিড় করে এল। তারা এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয়নি এবং আমরা যে বিপন্মুক্ত হয়েছি এতে সবাই খুব খুশি। সাভেলিচ বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাভেলিচের কৃতিত্বের কথাটা এখানে বলে রাখা চলে।

বিদ্রোহীরা আক্রমণ করার পর স্বাভাবিকভাবেই চারদিকে দারুণ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে সাভেলিচ গিয়ে হাজির হয় আস্তাবলে; সেখানে শ্ভাব্রিনের ঘোড়াটা ছিল, চুপি চুপি সেটাকে জিন পরিয়ে বার করে আনে, তারপর ঘোড়ায় চেপে ছোটে ফেরিঘাটের দিকে। চারদিকের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তার দিকে কারও নজর পড়ে না। ফেরিঘাটে এসে যখন সে পৌঁছয় তখন গ্রিনেভের সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই ভল্গা পার হয়ে বিশ্রাম করছিল। সাভেলিচের মুখে আমাদের বিপদের কথা শুনে গ্রিনেভ সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে। আর ভগবানের অশেষ দয়া, ঠিক সময়ে এসে তারা পৌঁচেছে।

গ্রিনেভ জেদ করল, সরাইখানার পাশে খোলা জায়গায় সকলের চোখের ওপরে কয়েক ঘণ্টা আন্দ্রিয়ুশ্কার মাথাটা শূলে বিঁধিয়ে রাখতে হবে।

হুসার সৈন্যরা বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া করেছিল, তারা ফিরে এল। কয়েকজনকে বন্দী করে এনেছে। যে গোলাঘরে কিছুক্ষণ আগে আমরা আটক ছিলাম এবং যেখানে থেকে বিদ্রোহীদের স্মরণীয় অবরোধ ঠেকিয়েছিলাম — সেখানেই আটক করে রাখা হল তাদের।

তারপর আমরা যে যার ঘরে গেলাম। আমার বাবা-মার বিশ্রাম দরকার। আমি গতরাত্রে ঘুমোইনি, বিছানায় শুয়েই আমার চোখে গভীর ঘুম নেমে এল। গ্রিনেভ গেল সৈন্যবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে নির্দেশ জারি করতে।

সন্ধ্যাবেলা আবার আমরা সকলে এসে বসলাম ড্রইংরুমে। সামোভার ঘিরে আমরা বসেছি যে বিপদ আমরা কাটিয়েছি তা নিয়ে চলছে সানন্দ আলোচনা। মারিয়া ইভানভনা চা ঢালছে। আমি বসে আছি মারিয়া ইভানভনার ঠিক পাশে। আমার সমস্ত মনোযোগ ওর দিকেই কেন্দ্রীভূত। আমাদের দুজনের এই ঘনিষ্ঠতায় আমার বাবা-মারও যে সায় আছে তা তাঁদের দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে। এই সন্ধ্যাটির কথা এখনো আমি ভুলিনি। সুখী হওয়া — পরিপূর্ণরূপে সুখী হওয়া যে কী, তা জেনেছিলাম সেদিন। ক্ষীণজীবী মানুষ আমরা, আমাদের জীবনে এই রকম মুহূর্ত খুব বেশি আসে না!

পরদিন সকালে বাবার কাছে খবর এল যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে চাষীরা বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বাবা গেলেন বাইরে। তাঁকে দেখে চাষীরা জানু পেতে বসে ক্ষমা চাইল।

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ রে বোকার দল, এসব দুর্বুদ্ধি তোদের মাথায় এল কী করে?'

সমবেত গলায় তারা জবাব দিল, 'হুজুর, আমাদের ভুল হয়ে গেছে, মাপ করুন।'

'ঘাট তো হয়েছেই। দোষ করবার সময় খেয়াল থাকে না, পরে আফশোষ। তবে আজ আমি তোদের সবাইকে মাপ করলাম — আজ আমার বড়ো আনন্দের দিন, আমার ছেলে ফিরে এসেছে। তা বেশ — মাপ চাইলে তো আর তলোয়ার হাঁকানো যায় না।'

'ভুল হয়ে গেছে হুজুর, মাপ করুন!'

'ভুল তো হয়েছেই। দ্যাখ্ তো ভগবান কেমন সুন্দর রোদ-ঝলমলে দিন পাঠিয়েছেন! এখন কোথায় মাঠে গিয়ে খড় কাটবি, তা নয়, তিন-তিনটে দিন বোকার মতো হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিলি! শোন মোড়ল! সবাইকে ঘাস কাটবার জন্যে পাঠিয়ে দাও। আর শুনে রাখ, লালমাথা শয়তান, সেণ্ট ইলিয়ার পরব শুরু হবার আগেই মাঠ থেকে সমস্ত খড় গাদায় তুলতে হবে। যা, আর দেরি করিস্‌নে!'

চাষীরা প্রণাম করে মনিবের মাঠে কাজ করতে চলে গেল। ভাবখানা এমন যেন কিছুই হয়নি।

শ্ভাব্রিনের ক্ষত মারাত্মক নয়। তাকে পাহারা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল কাজানে। তাকে যখন গাড়িতে তোলা হয়, তখন আমি-জানলায় দাঁড়িয়েছিলাম। চোখাচোখি হতেই সে মাথা নিচু করল। আমি তাড়াতাড়ি সরে আসি জানলা থেকে। পরাজিত শত্রুর মন্দভাগ্য ও নিগ্রহের সামনে নিজের জাঁক দেখাতে সঙ্কোচ হল আমার।

গ্রিনেভকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। আমি স্থির করলাম যে আমিও গ্রিনেভের সঙ্গে চলে যাব, যদিও পারিবারিক নিবিড় বেষ্টনীর মধ্যে আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবার ইচ্ছেটা আমার খুবই ছিল। সৈন্যদলটির যেদিন রওনা হবার কথা, তার আগের দিন বাবা-মার কাছে গিয়ে তৎকালীন প্রথামতো তাঁদের প্রণাম করলাম এবং মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে আমার বিয়েতে তাঁদের সম্মতি চেয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম। আনন্দে বাবা-মার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা সম্মতি দিলেন। মারিয়া ইভানভনাকে হাত ধরে নিয়ে এলাম; ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে, আমার বাবা-মা আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করলেন...।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনের ভাব কী হয়েছিল, তা বর্ণনা করবার চেষ্টা আমি করব না। আমার মতো অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁদের কোনো কথা বলবার প্রয়োজন নেই, তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। আর এই অভিজ্ঞতা যাঁদের নেই তাঁদের আমি শুধু করুণাই করতে পারি। এই শেষোক্তদের প্রতি আমার উপদেশ, সময় থাকতে থাকতেই প্রেমে পড়ুন, এবং বাবা-মার আশীর্বাদ পাওয়া যে কী জিনিস তা জানুন।

পরদিন সকালে সৈন্যদলের বেরিয়ে পড়বার কথা। গ্রিনেভ আমাদের বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল। সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন শীঘ্রই শেষ হবে, এ বিষয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিত। আমি আশা করছিলাম যে মাসখানেকের মধ্যেই আমি বিয়ে করতে পারব। মারিয়া ইভানভনা আমাকে বিদায় জানাল এবং সকলের সামনেই আমাকে চুম্বন করল। আমি ঘোড়ায় চেপে বসলাম, সাভেলিচ আবার আগের মতো আমার সঙ্গী হল। সৈন্যদল বেরিয়ে পড়ল।

এই দ্বিতীয়বার আমার বিদেশযাত্রা। যতোক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে ছিলাম আমাদের বাড়ির দিকে। কেমন একটা বিষণ্ণ আশঙ্কায় ভার হয়ে ছিল মন। কেন জানি মনে হচ্ছিল, আমার দুর্ভাগ্যের দিন এখনো শেষ হয়নি। কেমন যেন টের পাচ্ছিলাম নতুন একটা ঝড়ের আভাস।

আমাদের অভিযান কী ভাবে চলল বা পুগাচেভ যুদ্ধ কী ভাবে শেষ হল সেই বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে আমি যাব না। পুগাচেভ যেসব গ্রাম লুটপাট করে গেছে, সেই সব গ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হয় এবং বিদ্রোহীরা যাবার সময়ে যেটুকু রেখে গিয়েছিল, সেটুকুও হতভাগ্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আমরা গ্রাস করতে বাধ্য হলাম।

কার অধীনতা মেনে চলবে জানত না। কোথাও শাসনব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নেই। জমিদাররা জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। চারিদিকে দৌরাত্ম্য চলেছে দুর্বৃত্তদের। পুগাচেভ তখন আস্ত্রাখানের দিকে পালাচ্ছিল, পিছন পিছন ধাওয়া করছে সৈন্যদল। তাদের অধিনায়করা যথা ইচ্ছা শাস্তি দিত, দোষী-নির্দোষী বিচার করত না। যে সমগ্র বিরাট অঞ্চল জুড়ে আগুন জ্বলেছিল তার অবস্থা হয়ে উঠেছিল ভয়ংকর। হে ভগবান, রুশদেশের বিদ্রোহ, নির্মম ও নিরর্থক বিদ্রোহ, আমাদের যেন কোনো দিন দেখতে না হয়। যারা আমাদের দেশে অসম্ভব বিপ্লব আনতে চায় তারা হয় ছেলেমানুষ আর আমাদের জনসাধারণকে জানে না, নয় তারা কঠোর-হৃদয় লোক, যারা অপরের জীবনকে শস্তা বলে মনে করে এবং নিজেদের বলি দিতেও ভ্রূক্ষেপ করে না।

পুগাচেভ পালাল, পিছনে পিছনে ধাওয়া করলেন জেনারেল মিখেল্‌সন। শীঘ্রই খবর এল যে পুগাচেভ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে। গ্রিনেভ তার জেনারেলের কাছ থেকে খবর পেল যে ভুয়ো-জার বন্দী হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে থামবার হুকুম এল, এবার আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি। আনন্দে আমি দিশেহারা। কিন্তু অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা আমার সমস্ত আনন্দকে ছাপিয়ে কালো ছায়া ফেলেছে।

টীকা

ইয়েমেলিয়ান পুগাচেভের নেতৃত্বে ১৭৭৩—১৭৭৫ সালে এক কৃষক অভ্যুত্থান হয়, এই বিষয়ে পুশ্‌কিন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং 'পুগাচেভের ইতিহাস' লেখেন। রুশদেশের ঐতিহাসিক গবেষণা কার্যের ইতিবৃত্তে এই ধরণের গ্রন্থ এই প্রথম।

'ক্যাপ্টেনের মেয়ে'—এই উপন্যাসটি লেখা হয় ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে।

সে-সময়ে সেন্সর ব্যবস্থার কড়াকড়ির জন্যে পুশ্‌কিনকে উপন্যাসের কাঠামো বেছে নিতে হয়, ফলে পুগাচেভ বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ধরণের পূর্ণ চিত্র দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে'তে নায়কের 'পারিবারিক কাহিনীর' সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এবং জার শাসনের সেন্সর ব্যবস্থার অসংখ্য বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়া সত্ত্বেও পুশ্‌কিন পেরেছিলেন ভূমিদাস-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুশ চাষীদের অভ্যুত্থানের যিনি নেতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে।

সাহিত্যে পুশ্‌কিনের অবদান বিচার করতে গিয়ে মহান রুশ লেখক গোগল বলেছেন যে, এই উপন্যাসের 'চরিত্রগুলি হচ্ছে খাঁটি রুশ চরিত্র: একটি কেল্লার সাধারণ একজন অধিনায়ক, তাঁর স্ত্রী, একজন লেফ্‌টেনান্ট—সাধারণ মানুষের সাধারণ মহত্ত্ব—রুশ সাহিত্যে এই ধরণের চরিত্র-চিত্রণ এই প্রথম।'

বিখ্যাত রুশ সমালোচক বেলিন্‌স্কি 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে' উপন্যাসটিকে তুলনা করেছেন পুশ্‌কিনের বিখ্যাত কবিতা 'ইয়েভ্‌গেনি ওনেগিন'এর সঙ্গে, যেটি হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের বাস্তবতার ভিত্তি, এবং 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে'কে এক ধরণের গদ্যেলেখা 'ওনেগিন' বলে অভিহিত করেছেন।

[১] এই উদ্ধৃতিটি 'বাক-সর্বস্ব' নামক একটি কমেডি থেকে; রচয়িতা অষ্টাদশ শতাব্দীর নাট্যকার ইয়াকভ ক্‌নিয়াজনিন।

পৃঃ ৯

[২] আন্দ্রেই পেরভোজ্‌ভানী ও আলেক্সান্দার নেভ্‌স্কি — এই দুজনের নামে জারতন্ত্রী রুশদেশে দুটি সর্বোচ্চ সম্মান-পদক প্রচলিত ছিল।

পৃঃ ১২

[৩] এই উদ্ধৃতি একটি কবিতা থেকে। কবিতাটির নাম 'আমার ভৃত্য শুমিলভ, ভান্‌কা ও পেত্রুশার প্রতি'; কবিতাটির মধ্যে অভিজাত-বিরোধী ভাব পরিস্ফুট। লেখক হচ্ছেন দেনিস ফনভিজিন — অষ্টাদশ শতাব্দীর মহান নাট্যকার এবং 'বয়স্ক নাবালক' নামক কমেডির রচয়িতা। (তৃতীয় অধ্যায়ের শীর্ষ-উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।)

পৃঃ ২১

[৪] ইয়াকভ ক্‌নিয়াজনিনের 'উৎকেন্দ্রিকের দল' কমেডি থেকে।

পৃঃ ৪৫

[৫] আলেক্সান্দার পেত্রোভিচ সুমারকভ হচ্ছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ নাট্যকার ও সাংবাদিক: রুশ সাহিত্যে ক্লাসিকাল ঝোঁকটির যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রগণ্য।

পৃঃ ৪৭

[৬] 'রুশ গানের একটি নতুন ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ' থেকে। এটি একটি সংকলন গ্রন্থ, সংকলন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপরিচিত রুশ শিক্ষাবিদ নিকোলাই নভিকভ।

পৃঃ ৪৭

[৭] ভাসিলি কিরিল্লভিচ ত্রেদিয়াকভ্‌স্কি হচ্ছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ কবি ও অনুবাদক। রুশ সাহিত্যের ভাষা সৃষ্টির কাজে এবং রুশ গদ্যভাষার সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যম নিয়োজিত ছিল। নিজের কবিতাগুলির জন্যে সমসাময়িকদের কাছে তাঁকে প্রায়ই বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছে।

পৃঃ ৪৮

[৮] 'রুশ গানের সংকলন, স্বরলিপি সম্বলিত' থেকে। এই পুস্তকটি সংকলন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরকার ও লোক-সঙ্গীতজ্ঞ ইভান প্রাচ।

পৃঃ ৫২

[৯] ভয়ঙ্কর ইভান কর্তৃক কাজান অধিকারের উপরে রচিত একটি গান (নিকোলাই নভিকভ সংকলিত সংগ্রহ থেকে)।

পৃঃ ৭১

[১০] ১৭৪০ সালের বাশ্‌কির অভ্যুত্থানের কথা এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। রুশ সরকার এই অভ্যুত্থানকে নৃশংসভাবে দমন করেছিল।

পৃঃ ৮০

[১১] 'সম্রাট আলেক্সান্দারের সদয় শাসন' — এই উক্তির মধ্যে একটি শ্লেষাত্মক তাৎপর্য আছে; তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা এই উক্তিটিকে তুলনা করি পুশ্‌কিনের একটি চতুর্পদী কবিতায় প্রথম আলেক্সান্দারের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তার সঙ্গে। সেখানে পুশ্‌কিন প্রথম আলেক্সান্দারকে বলছেন:

> 'দুর্বল ও বিশ্বাসঘাতক শাসক... টেকো ফুলবাবু... শ্রমের শত্রু... ভাগ্যের ফেরে খ্যাতির উত্তাপে তেতে-ওঠা কুঁড়ের বাদশা, তখন রাজত্ব করেন আমাদের দেশে।'

পৃঃ ৮১

[১২] 'রুশ গানের একটি নতুন ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ' থেকে। উদ্ধৃত লাইনগুলি হচ্ছে 'প্রিন্স-বয়ারিনের' ফাঁসির গানের শুরু; প্রিন্স-বয়ারিন সম্ভবত স্ত্রেলেৎস অভ্যুত্থানের একজন নেতা।

পৃঃ ৮৫

[১৩] ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রুশদেশে তাতার-মঙ্গোল আধিপত্য ছিল; সেই সময়কার একটি প্রবাদবাক্য।

পৃঃ ৯৯

[১৪] ভুয়ো-জার নিজের পরিচয় দেয় ভয়ঙ্কর ইভানের পুত্র প্রিন্স দ্মিত্রি বলে। ১৬০৫—১৬০৬ সালে, পোলীয় হস্তক্ষেপকারীদের সহায়তায় এই 'ভুয়ো-দ্মিত্রি' এগারো মাস মস্কোর সিংহাসন অধিকার করে থাকে।

পৃঃ ১১০

[১৫] অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ কবি ও নাট্যকার মিখাইল খেরাস্কভের 'বিদায়' গান থেকে।

পৃঃ ১১৩

[১৬] খেরাস্কভের 'রাশিয়াদা' মহাকাব্য থেকে। ১৫৫২ সালে ভয়ঙ্কর ইভান কাজান শহর অধিকার করেন (তার আগে পর্যন্ত শহরটি তাতার খানের দখলে ছিল); এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে কবিতাটি রচিত।

পৃঃ ১২০

[১৭] যদিও সুমারকভের নাম লেখ আছে কিন্তু আসলে এই উদ্ধৃতিটি পুশ্‌কিনের নিজের লেখা।

পৃঃ ১৩৩

[১৮] পুগাচেভ শ্লেষের সঙ্গে ফ্রিড্‌রিক উইল্‌হেল্‌মের পুত্র দ্বিতীয় ফ্রিড্‌রিকের নামটিকে রুশীয় নামে রূপান্তরিত করছেন। ১৭৬০ সালে রুশ বাহিনী দ্বিতীয় ফ্রিড্‌রিকের বাহিনীকে পরাজিত করে, প্রুসিয়ার রাজধানী বার্লিন অধিকার করেছিল।

পৃঃ ১৪৫

[১৯] যদিও কুনিয়াজনিনের নাম লেখা আছে কিন্তু এই উদ্ধৃতিটিও আসলে পুশ্‌কিনের নিজেরই লেখা।

পৃঃ ১৫৭

[২০] গ্রিনেভের এই চিন্তাধারা পুশ্‌কিনের নিজস্ব রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। এ কথা ঠিক যে এলোমেলো ধরণের কৃষক অভ্যুত্থানকে পুশ্‌কিন সমর্থন করতেন না, কিন্তু পুগাচেভ আন্দোলনকে তিনি কোনো সময়েই 'অর্থহীন' বলে মনে করেননি। 'পুগাচেভের ইতিহাস' সম্পর্কিত 'সাধারণ মন্তব্যে' (যেগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়নি) পুশ্‌কিন লিখেছেন, 'সমস্ত সাধারণ লোক ছিল পুগাচেভের পক্ষে ...। পুগাচেভ ও তার সহকারীরা যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল সেগুলি সতর্কভাবে বিচার করলে অতি অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে বিদ্রোহীদের অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি ছিল তাদের লক্ষ্যসাধনের পক্ষে সর্বাধিক সুনির্বাচিত।'

পৃঃ ১৬৪

[২১] আরতেমি ভলিন্‌স্কি ছিলেন সম্রাজ্ঞী আন্না ইভানভনার (১৭৩০—১৭৪০) মন্ত্রী। সে সময়ে সম্রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্র ছিল বিরন। রুশ রাজদরবারে যারা ছিল বিদেশী সবচেয়ে অধঃপাতিত ভাড়াটে এই লোকটি তাদেরই একজন। আরতেমি ভলিন্‌স্কি এই লোকটির বিরুদ্ধে চক্রান্তে নেতৃত্ব করেছিল। ভলিন্‌স্কির এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন নৌ-বাহিনীর মন্ত্রী-দপ্তরের অফিসার পরামর্শদাতা আন্দেই খ্রুশেচভ; তাঁকেও একই সঙ্গে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়।

পৃঃ ১৭৪

[২২] রুমিয়ান্‌ৎসেভ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অতি-বিশিষ্ট এক রুশ অধিনায়ক। ১৭৭০ সালের ২১শে জুলাই কাগুলা নদীর তীরে রুমিয়ান্‌ৎসেভের বাহিনী

জয়লাভ করে তুর্কীদের উপরে। এই জয়লাভকে মর্যাদা দেবার জন্যে জারস্কয়ে সেলোতে একটি স্তম্ভ তোলা হয়।

পৃঃ ১৭৬

[২৩] 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে' উপন্যাসে দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের যে চরিত্র আঁকা হয়েছে তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অন্তর্লীন শ্লেষ আছে। সরকারী সূত্রের ওপর নির্ভর করেই এই চরিত্র আঁকা; কিন্তু রুশ সম্রাজ্ঞী সম্পর্কে পুশ্‌কিনের সত্যিকারের ধারণা কী, তা বোঝা যায় সেন্সরের বিচারাধীন প্রকাশের উদ্দেশ্য না নিয়ে লেখা তাঁর মন্তব্যাবলী থেকে। এ-দুয়ের মধ্যে একটা তুলনা করলে তবেই পাঠক এই শ্লেষের মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারবেন। মন্তব্যাবলীতে পুশ্‌কিন লিখেছেন:

মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ, যদি এরই নাম হয় রাজনীতি তাহলে ভাবীকালে ক্যাথেরিন বিস্ময়ের পাত্রী হবেন...। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন ইতিহাস বিচার করবে, তাঁর রাজত্বকালে মানুষের নীতিবোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল; সহৃদয়তা ও সহিষ্ণু তার মুখোস খুলে গিয়ে উদ্ঘাটিত হবে এক নিষ্ঠুর বাস্তব — তা হচ্ছে তাঁর যথেচ্ছাচারিতা; দেখা যাবে, তাঁর নোকররা প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চালিয়েছে, তাঁর উপপতিরা রাজকোষের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। প্রকাশ হয়ে পড়বে যে তাঁর রাজত্বকালে অর্থনীতির ক্ষেত্রে একান্ত জরুরী সব ব্যাপারেও ভুল করা হয়েছে আর এমন সব আইন রচিত হয়েছে যা নিরর্থক; জানা যাবে যে দেশের বিদ্বজ্জনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা পর্যবসিত হয়েছিল অসহ্য এক ভাঁড়ামিতে। সে-অবস্থায় এমন কি যদি ভল্টেয়ারও এসে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর গুণগান করতে শুরু করতেন তাহলেও রুশদেশে তাঁর গৌরবের স্মৃতিকে অভিসম্পাতের হাত থেকে বাঁচানো যেত না।'

পৃঃ ১৮১

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

А. С. ПУШКИН

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

На языке бенгали

Издательский редактор *Жукова Н.*
Художественный редактор *Камкина В.*
Технический редактор *Мещерякова В.*

Подписано к печати 31 V/1963 г. Формат $60 \times 84^{1}/_{16}$
Бум. л. $6^{1}/_{2}$. Печ. л. 13. Уч.-изд. 12,53.
Заказ № 1349. Цена 1 руб. 20 коп. Тираж 5 500.

Московская типография № 3 Мосгорсовнархоза

আ. স. পুশকিন · ক্যাপ্টেনের মেয়ে